Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

38

~~3/169~~ 3/15

৭।৪৪

কৈলাসপতি

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

শ্রীমতী হেমলতা রায়

দুই টাকা আট আনা।

কাপড়ে বাঁধাই সাত সিকা।

প্রকাশক
কুমার শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
দীঘাপতিয়া হাউস, ঘোড়ামারা, রাজসাহী

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫নং ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

পরমপূজ্য পরমারাধ্য মহাত্মা শ্রীশ্রীহংসদেব
অবধূত মহারাজের শ্রীশ্রীচরণকমলে—

বাবা,

আপনার শ্রীচরণ হইতে যে কয়েকটী ফুল সরিয়া পড়িয়াছে, তাহাই গাঁথিয়া আপনার শ্রীচরণে তুলিয়া দিলাম—গ্রহণ করিয়া ধন্য করিবেন।

সেবিকা
শ্রীহেমলতা

বক্তব্য

পরমপূজ্য শ্রীশ্রীহংসদেব অবধূত মহারাজের প্রথম দর্শন লাভ করি ১৩৩২ সালে। তাঁহার উপদেশাবলী আমাকে এরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, ১৩৩৩ সাল হইতে তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও সুমধুর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করি। মাসিক পত্রিকা "উৎসবে" শ্রীশ্রীহংসদেব মহারাজের কাহিনী" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়।

১৩৩৫ সালের শীতকালে শ্রীশ্রীহংসদেব মহারাজের কৈলাস আশ্রমেই তাঁহার প্রথম বাঙ্গালী শিষ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। সেই সময় হইতেই তিনি তাঁহার এই কন্যাটীকে পিতৃস্নেহডোরে আবদ্ধ করিয়াছেন। সাক্ষাতের পূর্ব্বেই আমি সেই প্রবীণ ভক্তের রচিত 'সনাতন গোস্বামী' ও 'মহাত্মা তুলসীদাস' ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠে মুগ্ধ ছিলাম। সবিশেষ পরিচয় হইলে যখন আমি তাঁহার সম্মুখে তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুদেবের উপদেশপূর্ণ খাতাগুলি ধরিলাম, তখন তিনি সাদরে উহা পাঠ করিলেন এবং উহা পুস্তকাকারে ছাপাইবার নিমিত্ত আমাকে উৎসাহিত করিলেন। অবশেষে তাঁহারই উৎসাহে ও আগ্রহে এই 'কৈলাসপতি' আজ লোকসমক্ষে প্রকাশ করিলাম।

আমি যশঃপ্রার্থী হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি না—জনসমাজকে শিক্ষা দিবারও স্পর্দ্ধা আমার নাই। আমার উদ্দেশ্য তবে কি, তাহা একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি।

কোন এক মহাপুরুষ গুরুর নিকট হইতে মোক্ষপ্রাপ্তির মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। গুরু মন্ত্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি এই মন্ত্র জপ করিলে অচিরে মোক্ষলাভ করিবে, কিন্তু যদি কাহারও নিকট প্রকাশ কর, তবে নিরয়গামী হইবে।"

শিষ্য মন্ত্রপ্রাপ্তি মাত্র এক পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন এবং মহোল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কে তোমরা মোক্ষলাভ করিতে চাও, ছুটিয়া এস—আমি মন্ত্র পাইয়াছি—শুনিয়া যাও— মন্ত্র লও—"

আমারও সেই দশা। আমি মহাপুরুষের নিকট হইতে যে রত্নরাজি লাভ করিয়াছি, তাহা বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে পারিলাম না—জনসমাজকে দেখাইবার জন্য মহোল্লাসে ছুটিয়া আসিলাম—আর কোন দিকে চাহিলাম না।

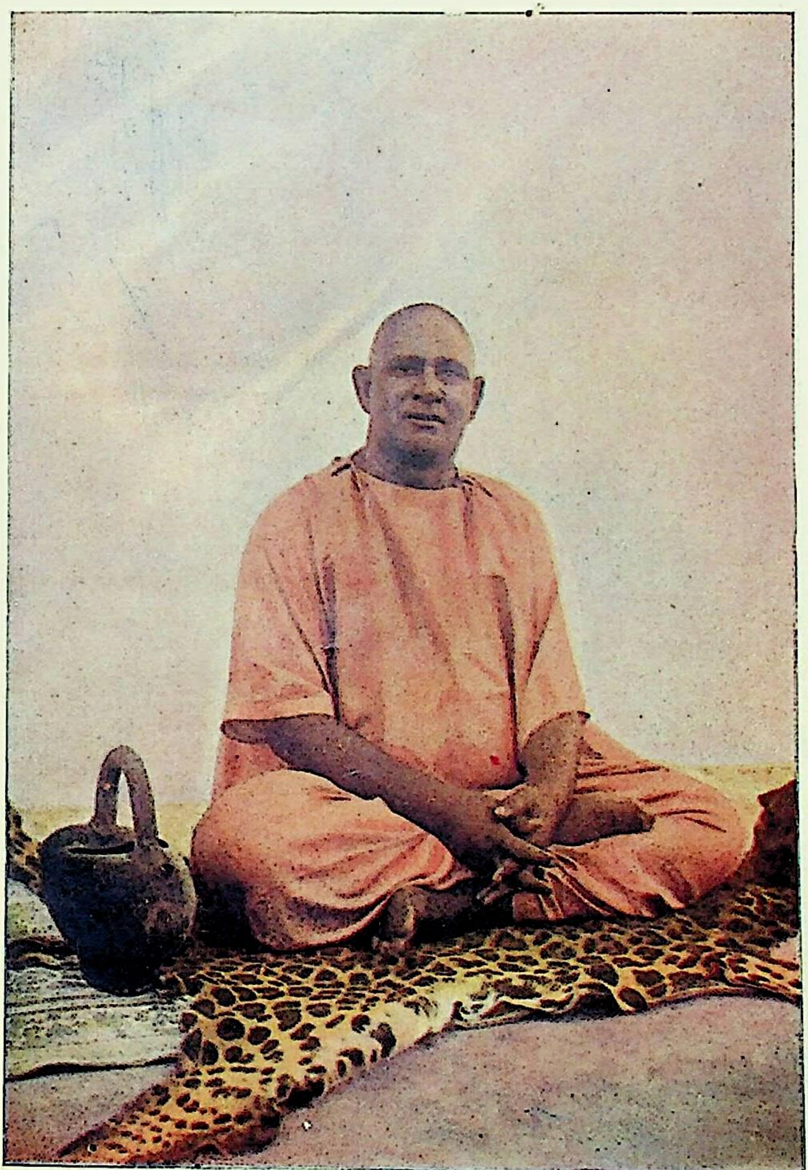
দীঘাপতিয়া হাউস,
রাজসাহী

লেখিকা

দ্বিতীয় বারের বক্তব্য

অল্প কালের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায় বুঝিলাম জগৎ চায় ধর্ম্ম, সদুপদেশ। উৎসাহিত হইয়া গ্রন্থের কলেবর প্রায় দ্বিগুণ করিলাম। কাজেই মূল্য সামান্য কিছু বাড়াইতে হইল।

লেখিকা



শ্রীশ্রীহংসদেব মহারাজ।

শ্রীগুরবে নমঃ

কৈলাসপতি

প্রথম তরঙ্গ

আজ যে মহাত্মার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার দেহ জন্ম লইয়াছিল পঞ্চনদ-বিধৌত গুরুনানক-চরণপূত পঞ্জাব প্রদেশে এক সাধুসেবী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে। কোন্ সময়ে তাহা ঠিক জানি না, তবে সিপাহী-বিদ্রোহের সমসময়ে বলিয়া মনে হয়। ইতঃপূর্ব্বে তিনি বাঙ্গলা দেশে বড় একটা আসেন নাই—বোধ হয় আসিবার অবসর পান নাই। তপস্যায় সিদ্ধ না হইলে প্রকৃত সাধুগণ সচরাচর জনসমাজে আসিয়া দাঁড়ান না—তাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া গুরুনির্দ্দিষ্ট সাধন-ভজনে অথবা তীর্থ-ভ্রমণে জীবনের ভূরিভাগ অতিবাহিত করেন। এই মহাপুরুষ অনাবৃত দেহে কৌপীনমাত্র পরিধানপূর্ব্বক নগ্নপদে উত্তরাখণ্ডের চির-তুষারময় প্রদেশে কত দীর্ঘ বর্ষ তপস্যারত ছিলেন; পরে দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে শীত গ্রীষ্ম উপেক্ষা করিয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে অথবা বৃক্ষাশ্রয়ে অর্দ্ধাশনে বা অনশনে কঠোর তপস্যায় সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তবে সব সময়ে একা নহে; কতিপয় সাধু দল-বদ্ধ হইয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা ঘুরিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত ধরিয়া পুনরায় হিমালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহারা ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ সর্ব্ব তীর্থ তিনবার পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যে মহাত্মার কথা আজ বলিতে

প্রবৃত্ত হইয়াছি, পরিণত বয়সে তিনি যশিডির সন্নিকটে এক অনুচ্চ পাহাড়ের উপর এক আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বৎসরের তিন চার মাস তথায় বাস করেন, কয়েক মাস নর্ম্মদা তীরে থাকেন। বাকী সময় ঘুরিয়া বেড়ান।

এই মহাত্মার নাম পরমহংস শ্রীশ্রীহংসদেব অবধূত। কেহ কেহ তাঁহাকে "সাধু বাবা" বলেন, আমরা তাঁহাকে 'বাবা' বলিয়াই ডাকি। কিরূপে প্রথমে বাবার দর্শন পাইলাম, সে কথা আগে বলিব। সে কয়েক বর্ষ পূর্ব্বের কথা, তখন বাবার আশ্রম হয় নাই। আমরা ১৩৩২ সালে এক দিবস বেলা ৯৷৷০টায় যশিডি হইতে দেওঘরে গিয়াছিলাম—উদ্দেশ্য গুরুদর্শন। আমাদিগের গুরু শ্রীমৎ আচার্য্য শ্রীশ্রীবালানন্দ স্বামিজী; তাঁহার আশ্রম দেওঘরের দক্ষিণপূর্ব্ব করণিবাগে। আমরা থাকিতাম যশিডিতে, আমাদের 'লালকুঠীতে'।

দেবঘর বা দেওঘরে ট্রেণ হইতে নামিয়া দেখিলাম, একখানিও ঘোড়গাড়ী নাই, সেদিন চালকেরা নাকি ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। আমরা পদব্রজেই চলিলাম। যদিও বহুবার এই পথে শ্রীশ্রীগুরুদেবের আশ্রমে গিয়াছি, কিন্তু পদব্রজে কখনও যাই নাই; সুতরাং সত্বর পথ হারাইয়া ফেলিলাম। যখন উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, তখন সহসা দেখিলাম, সম্মুখে এক দীর্ঘাকার পুরুষ। তাঁহার মুণ্ডিত মস্তক, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, প্রশান্ত বদন, তেজোদীপ্ত কলেবর দৃষ্টে আমরা ভক্তিনম্রচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করণিবাগের পথ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিলেন। আমরা গন্তব্য পথে চলিলাম; কিন্তু অপরিচিত সাধুর সৌম্যমূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল। তাঁহার মিষ্ট ভাষা, স্নিগ্ধ হাসি, পারিপাট্যহীন বেশ-ভূষা অনন্যসাধারণ—একবার দেখিলে আর ভুলা যায় না।

এই মহাত্মার প্রথম বাঙ্গালী শিষ্য ৺বঙ্কিমবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র সুলেখক শ্রীযুত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকটেও শুনিয়াছিলাম যে, যখন তিনি গুরুলাভার্থে ১৩৩০ সালে উন্মত্তের ন্যায় প্রয়াগে কুম্ভমেলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন একদিন সহস্র সহস্র সাধুর মধ্যে এই মহাপুরুষকে দর্শনমাত্র তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'এই যে আমার প্রভু!' মহাত্মাও নাকি শচীশবাবুকে দূর হইতে দেখিয়া হাসিয়াছিলেন এবং শত শত ভক্তকে অতিক্রম করত শচীশবাবুকে আহ্বান করিয়া আশ্রমে আনিয়া বসাইয়াছিলেন।

আমাদের মনও এই মহাপুরুষকে দর্শনমাত্র আকৃষ্ট হইল এবং পরিচয় জানিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু সহসা কোন সুযোগ ঘটিল না। কয়েক দিন পরে আমরা লক্ষ্য করিলাম, আমাদের 'লালকুঠির' সন্নিকটে এক উদ্যান মধ্যে এক ক্ষুদ্র গৃহে আলো জ্বলিতেছে। প্রত্যহ রাত্রিকালে একই স্থানে আলো জ্বলিতে দেখিয়া আমরা কৌতূহলী হইলাম এবং অনুসন্ধানে জানিলাম, কয়েক দিন হইতে ঐ ক্ষুদ্র কুটীরে জনৈক সাধু আসিয়া বাস করিতেছেন। স্থির করিলাম, একদিন আমরা ঐ সাধুকে দর্শন করিয়া আসিব।

সত্যই একদিন মধ্যাহ্নে আমরা সেই কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সাধু মহারাজ তখন আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমরা চমকিয়া উঠিলাম। ইনিই আমাদের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত পথ-প্রদর্শক মহাপুরুষ। আমাদিগকে দেখিয়া সাধু বাবা একটু হাসিলেন এবং আদরের সহিত আমাদিগকে বসিতে আদেশ দিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দ্বারের সন্নিকটে একখানা চৌকীর উপর বসিলাম, এবং কিছু সৎ-প্রসঙ্গ শুনিবার প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইলাম।

অনেক কথা সেদিন তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম। তাঁহার একটী

উপদেশ আমাদের অন্তরে আজও গাঁথা আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "মায়িক বস্তুর সেবা করিলে কখনও নিত্য বস্তু লাভ হয় না।" ইহা বুঝাইতে বাবা আমাদের কয়েকটী উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। মায়া মোহ ও আমাদের পঞ্চ রিপুই যে শ্রীভগবানের নিকট আমাদিগকে পৌছিতে দিতেছে না, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা এই গল্পটা বলিয়াছিলেন,—

একস্থানে একটী বড় সাধু বাস করেন। তাঁহার নিকট একটী কুক্কুরী তাহার পাঁচটী শাবকসহ বাস করে। যে কোন ব্যক্তি সাধু-সন্দর্শন জন্য সাধুর গৃহে প্রবেশ করিতে যায়, সেই ব্যক্তিই কুক্কুরী ও তাহার বাচ্চাগণের আক্রমণের নিমিত্ত সাধুর নিকট যাইতে অসমর্থ হয়। কারণ কুক্কুরী ও তাহার শাবকগুলি বিকট রবে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। উহার নিমিত্ত সাধু-দর্শনার্থী ব্যক্তিদিগকে বিফল-মনোরথ হইতে হইত। কিন্তু যদি কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দম্ভের সহিত সাধুর নিকট পৌছিবার চেষ্টা না করিয়া প্রথমেই অতি দীনভাবে সাধুর শরণ লইত এবং তাঁহাকে দর্শন জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা সাধুকে নিবেদন করিত, তাহা হইলে সাধু তাহার প্রতি প্রীত হইয়া কুক্কুরীকে পথ হইতে সরাইয়া দিতেন। তাহারা তখন সাধুর কৃপায় নিরাপদে গিয়া সাধুর দর্শন-লাভে সমর্থ হইত।

এই গল্পটী বলিয়া সাধু বাবা তাহার অর্থ আমাদের এইরূপ বুঝাইয়া দিলেন যে, এই সাধু হইলেন স্বয়ং ভগবান্; কুক্কুরী হইল মায়ামোহ, আর শাবকগণ মনুষ্যের দুর্দ্দমনীয় রিপুনিচয়। যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার ও হিংসা। অবিদ্যারূপ মোহ হইতেই এই পঞ্চরিপুর * উদ্ভব।

* জ্ঞানপন্থী সাধুরা ষড়্রিপু না বলিয়া পঞ্চরিপু বলেন:—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহঙ্কার। ক্রোধ ও দ্বেষ একই মনে করেন।

যদি কেহ ঐ রিপুগণ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া তাঁহার দিকে যাইবার জন্য আন্তরিক আগ্রহান্বিত হয় এবং তজ্জন্য শ্রীভগবানের শরণ লইয়া একান্তভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা জানায়, তবে তিনি করুণা করিয়া পথের বিঘ্ন অপসারিত করিয়া দেন। মাত্র তাঁহার কৃপাতেই তাঁহার নিকট যাওয়া সম্ভবপর হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিতেছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭।১৪।

আত্মানন্দ কিরূপে লাভ হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত সাধু বাবা আর একটী ক্ষুদ্র উপাখ্যান বলিলেন,—কোন এক ব্যক্তি স্নানার্থে নদীতীরে আসিয়া ঘাটের উপর তাহার মূল্যবান্ কণ্ঠহার খুলিয়া রাখিয়াছিল। বৃক্ষশাখায় বসিয়া কোন পক্ষী তাহা দেখিয়া ভাবিল, ইহা একটী উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য। সে তাহা চঞ্চুদ্বারা উঠাইয়া লইয়া গিয়া কোন জলাশয়ের তীরে বৃক্ষশাখায় বসিল। পরীক্ষান্তে যখন বুঝিল ইহা খাদ্যদ্রব্য নয়, তখন পক্ষী তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। দ্বিতীয় এক ব্যক্তি স্নানার্থে আসিয়া জলের মধ্যে ঐ কণ্ঠহারের প্রতিবিম্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইল এবং উহা লাভার্থে অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে জলের ভিতর তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিল। ইহাতে জল কর্দ্দমাক্ত হইল, ফলে হারও অদৃশ্য হইল। তখন সে নিরাশহৃদয়ে গৃহে ফিরিল। তৃতীয় এক ব্যক্তি কিছু কাল পরে ঐ ঘাটে স্নানার্থে আসিল। সে ব্যক্তিও জলমধ্যে হারের প্রতিবিম্ব দেখিল। সে বুদ্ধিমান্ ছিল, সে বিশেষ পরখ করিয়া বুঝিল জলের ভিতর হার নাই, তখন জলের ভিতর অন্বেষণ না করিয়া উপর দিকে চাহিল; হার দেখিতে পাইল। তখন সে জলে না নামিয়া গাছে উঠিল এবং বহু আয়াসে মূল্যবান্ রত্নহারটী লাভ করিল।

এই উপাখ্যানটি বলিয়া সাধু বাবা ইহার অর্থ আমাদের বুঝাইয়া দিলেন। এই হারই আমাদের আনন্দস্বরূপ। আনন্দ লাভ করিবার জন্য জীবজগৎ সতত ব্যস্ত ; অথচ এ আনন্দ লাভ কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। প্রথমে স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এ আনন্দের উৎস কোথায়। উৎস নির্ণীত হইলে আনন্দ লাভ করা কঠিন নয়। বাহিরের মায়িক বস্তুতে প্রকৃত পক্ষে সুখ নাই। প্রত্যেক জীবের মধ্যে আনন্দ-উৎস লুক্কায়িত ভাবে আছে। আত্মাই সেই আনন্দের উৎস। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে জীব নিজের স্বার্থ ভুলিয়া যায়—পরোপকারে ব্রতী হয়—নিত্যানন্দে মগ্ন থাকে।

সাধুবাবা বলেন, জীবের মধ্যেই আনন্দের উৎস, তাহাকে খুঁজিতে কোথাও যাইতে হয় না। কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়াছেন "Kingdom of happiness is within you" সুখের রাজ্য তোমার ভিতরই আছে। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, "Kingdom of Heaven is within you" স্বর্গ রাজ্য তোমার ভিতরেই বিদ্যমান। যাঁহারা সেই রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের মুখে একই কথা। মনকে আত্মায় একাগ্র করিতে অভ্যাস কর, তাহা হইলেই ক্রমে প্রকৃত সুখের সন্ধান পাইবে।* ইতঃপূর্ব্বে ১৩৩১ সালের কার্ত্তিক মাসে যখন আমরা কাশীতে বেড়াইতে যাই,তখন এক সাধিকার মুখে তাঁহার রচিত একটী গান শুনিয়াছিলাম। সেই গানটী প্রাণে লাগিয়াছিল, তাই তাহার উল্লেখ করিলাম।

"সুখ পেতে ধরণীতে কে বল ভাই চায় না,—
সুখের আলেয়া ধ'রে, সকলেই ছুটে মরে,

---

* বাবা বলেন :—"অন্তর্ম্মুখ বৃত্তি বিনা হোয় না অন্তঃসুখ।
বাহ্যবৃত্তিসে যাত্ নহি অন্তর্ মনকো দুখ॥"

"সুখ থাকে তবু দূরে কেউ ধরা পায় না ॥
সুখ যদি পেতে চাও, বাহিরেতে খুঁজ না,—
সে নহে মুকুটমণি, সে নহে গো জ্যোছনা।
বাসনা নিবৃত্ত ক'রে, খুঁজ না হৃদয়-পুরে,
ভিতরে তাহার খনি—বাহিরে বিকায় না ॥১
আপনার ক্ষুদ্র সীমা, প্রেমেতে ভাঙ্গিয়ে,—
বিশ্ব আপন কর ;—সরল প্রেম বিলায়ে,—
প্রেমে যার আছে মূল,—সে পায় আনন্দ ফুল,
জরা, ব্যাধি মৃত্যুদাহে, সে তরু শুকায় না ॥২"

দ্বিতীয় তরঙ্গ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা যে গৃহে বাস করিতাম, তাহার নাম 'লাল কুঠী'। তাহার পশ্চিমে অতি নিকটে E. I. রেলপথ ; তার পশ্চিমে প্রায় ৪ মাইল দূরে দেওগিরি বা দিগরিয়া পাহাড়। আমাদের বহুদিন হইতে ইচ্ছা ছিল, একবার এই পাহাড় অঞ্চলে ঘুরিয়া আসি। স্থানটী যেমন নির্জ্জন, তেমনি হিংস্রজন্তু-সমাকুল। গাড়ীর পথও নাই। সুতরাং কতকটা নিরস্ত ছিলাম বটে, কিন্তু যাইবার ইচ্ছা ছিল। পাহাড়ের দিকে কিয়দ্দূর যাইব এইরূপ অভিপ্রায় প্রায়ই করিতাম। একদা প্রভাতে যথোপযুক্ত লোকজন সঙ্গে লইয়া দেবগিরির দিকে অগ্রসর হইলাম। ঐ পথে প্রায় এক মাইল নির্জ্জন পথ অতিবাহিত করিবার পর সম্মুখে এক ক্ষুদ্র পাহাড় আছে দেখিলাম। দেওগিরির দিকে আর অগ্রসর না হইয়া আমরা সেই পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। আজ যে প্রথম এই পাহাড়ে

উঠিলাম, তা' নয়; অন্যান্য বৎসরও যখন যশিডি আসি, তখনও আমরা দেওগিরির দিকে এই পাহাড়ের উপর উঠিয়া থাকি। স্থানটী যেমন নির্জ্জন, তেমনি সৌন্দর্য্যময়, সে কথা পরে বলিব।

আজ এই পাহাড়ের উপর উঠিয়া বিস্মিতনয়নে দেখিলাম, পাহাড়ের শিখরদেশে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও সমতল ভূমির উপর একখানি কুটীর নির্ম্মিত হইতেছে। কুটীরে একখানি মাত্র ঘর, ইষ্টকের প্রাচীর, লাল খোলার আচ্ছাদন। নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছিল, সিমেণ্টের কাজই চলিতেছিল।

এই মনুষ্য-সমাগমশূন্য পাহাড়ের মাথায় কুটীর নির্ম্মিত হইতেছে দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কোন্ সাহসী ব্যক্তি এই নির্জ্জন স্থানে বাস করিবে? অনুসন্ধানে জানিলাম, কোন সাধুর নিমিত্ত কয়েকজন ভক্ত মাড়ওয়ারি এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। দিন্ ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধু একাকী এ স্থানে থাকিবেন কিরূপে? এ যে একেবারে লোকালয়শূন্য স্থান! নিশ্চয়ই সাধু খুব উচ্চ অবস্থার, এইরূপ মনে করিলাম এবং তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া আমরা ধন্য হইব এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে ফিরিলাম।

কয়েকদিন ব্যস্ত থাকায় আমরা উদ্যানমধ্যস্থ ক্ষুদ্র কুটীরে যাইতে পারি নাই এবং সাধুবাবার কোন অনুসন্ধান লইতে পারি নাই। আমরা একদিন উদ্যানের কুটীরে গিয়া দেখিলাম, সাধুবাবা তথায় নাই, কুটীর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা স্তব্ধ হইয়া তথায় দাঁড়াইলাম। সহসা মনে পড়িল, পাহাড়ের মাথায় জনৈক সাধুর নিমিত্ত একখানি কুটীর নির্ম্মিত হইতেছিল। হয়ত এই সাধুই আমাদের সাধুবাবা হইবেন। এই কথা আমাদের স্মরণ হইবামাত্র আমরা পাহাড়ের দিকে চলিলাম। উপরে উঠিয়া দেখি আমাদের অনুমান অতীব সত্য।—এই পাহাড়ের

সাধুই আমাদের সাধুবাবা বটে—তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের বড় আনন্দ হইল। প্রণাম করিয়া তাঁহাকে জানাইলাম, আমরা তাঁহাকে বাগানের কুটীরে খুঁজিয়া এখানে আসিয়াছি। তিনি আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন। তাঁহার মুখে সেই মৃদু মৃদু হাসি—মনে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও পরিপূর্ণ আনন্দ না থাকিলে সে হাসি কেহ হাসিতে পারে না, আমরা তাহা বুঝাইতে পারিব না।

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন তিনি এই জনশূন্য স্থানে বাস করিতে বাসনা করিয়াছেন। তিনি উত্তর করিলেন, লোকালয় তিনি পছন্দ করেন না—জনশূন্য স্থানই তাঁহার ঈপ্সিত। কিছুকাল বাধ্য হইয়া তাঁহাকে লোকালয়ের মধ্যে থাকিতে হইয়াছিল। আমরা হিন্দি বুঝি, কিন্তু বলিতে পারি না। সাধুবাবা বাঙ্গালা বুঝেন, কিন্তু বলিতে পারেন না। আমাদের মনে হইয়াছিল তিনি বাঙ্গালা বই পড়িতে পারেন। কেন না, তাঁহার ঘরে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক দেখিয়াছিলাম, গ্রন্থের নাম 'মহাত্মা তুলসীদাস'—শ্রীযুত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শচীশ বাবুর সহিত তখন আমাদের পরিচয় ছিল না—পরে হইয়াছিল বাবারই আশ্রমে। তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম, বাবা পুরীতে অবস্থান-কালে একদিনে বাঙ্গালা অক্ষর পরিচয় শেষ করিয়াছিলেন এবং সাত দিনের মধ্যে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক—"জীবনী-সংগ্রহ"—পড়িয়া প্রায় শেষ করিয়াছিলেন। এরূপ প্রতিভা না থাকিলে বুঝি সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করা সম্ভব নয়।

সে কথা যাক্। আমরা সেদিন গিয়া দেখি, সাধুবাবা সেই শীতল সিমেণ্টের উপর প্রফুল্ল বদনে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গে একখানি পাতলা স্থতির গৈরিক আল্‌ফি। পশ্চিম দিক্ হইতে তুষার শীতল প্রচণ্ড বাতাস বহিতেছিল। আমরা গায়ে জামার

উপর পশমী জামা চড়াইয়া শীতে কাঁপিতেছি, আর সাধুবাবা সেই দুরন্ত শীতের মধ্যে সামান্যমাত্র বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া প্রফুল্লবদনে বসিয়া রহিয়াছেন।

পরে জানিয়াছিলাম, সাধুবাবা অনেক রোগের ঔষধ জানেন ; এবং গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া রোগীদিগের মধ্যে তাহা বিতরণ করেন। কেহ উপকার পাইয়া তাঁহাকে অর্থ দিতে আসিলে তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিয়া থাকেন, যাহার অর্থের প্রয়োজন তাহাকে অর্থ দেও গে। কেহ প্রণাম করিয়া কিছু অর্থ দিলে তিনি বলিতেন, আমি ত এই নির্জ্জন পাহাড়ে থাকি, আমার অর্থের প্রয়োজন কি ? কিন্তু তাঁহার সেবার্থে কেহ যদি তাঁহাকে দুগ্ধ বা ফল আনিয়া দেয়, তাহা হইলে তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করেন এবং নিজের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র রাখিয়া ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে তৎসমুদায় বিতরণ করিয়া দিয়া থাকেন।

পরদিন আবার সাধুবাবাকে দর্শন করিতে আসিলাম। তিনি সে দিন আমাদিগকে রাণী মদালসার উপাখ্যান বলিলেন। রাণী অতি ধর্ম্মশীলা তত্ত্বদর্শিনী রমণী, ইঁহার পিতার নাম বিশ্বাবসু ; স্বামী চন্দ্রবংশীয় প্রবর্দ্দনরাজ, এই দম্পতি হইতে প্রখ্যাত অলর্কের জন্ম। অলর্ক সর্ব্বকনিষ্ঠ। তাঁহার বড় ভাই দুই চারিজন ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের গর্ভধারিণী মদালসা বাল্যকাল হইতে তাঁহাদিগকে এরূপ তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, যৌবন উদ্গত হইতে না হইতেই তাঁহাদের বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল এবং তাঁহারা একে একে সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যার্থে অরণ্যবাসী হইয়াছিলেন। যখন সর্ব্বকনিষ্ঠ অলর্ক জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন রাজা প্রবর্দ্দন, মদালসাকে কহিলেন, "রাণি, এ পুত্রটী আমাকে দেও, নইলে সিংহাসন শূন্য থাকিবে ; তুমি এই শিশুকে আর তত্ত্বজ্ঞান শিখাইও না।" মদালসা প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অলর্ক ক্রমে বাড়িতে লাগিল; রাজা তাহাকে ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অলর্ক রাজকার্য্যে, অস্ত্রচালনায় সুনিপুণ হইয়া উঠিল। মদালসা তখন অলর্কের হস্তে একটী কবচ দিয়া কহিলেন, "ইহা এখন খুলিও না; যদি কখন ঘোর দুঃখে পতিত হও, আর সেই দুঃখ নিবারণ করিতে অসমর্থ হও, তখন ইহা খুলিয়া পড়িবে। ইহার মধ্যে দুঃখ নিবারণের মহৌষধি রহিল।" অলর্ক সে কবচখানি যত্ন-পূর্ব্বক তুলিয়া রাখিলেন।

সময় আগত হইলে রাজা ও রাণী দেহত্যাগ করিলেন। অলর্ক সিংহাসনারূঢ় হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। নিরবচ্ছিন্ন সুখে তাহার দিন কাটিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি জন্মিল। তিনি তাহাদিগকে পাইয়া ভগবানকে ভুলিলেন। ধনজন সংসার যে অনিত্য সে কথা তাঁহার একেবারেই স্মরণ হইল না।

এদিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের নিকট তাঁহাদিগের জননী মদালসা দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এক বার্ত্তা পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত ছিল যে, অলকর্কে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় নাই; যখন জ্যেষ্ঠেরা দেখিবেন, অলর্কের পুত্র সিংহাসনোপযোগী হইয়াছেন, তখন তাঁহারা যেন অলর্ককে সংসার হইতে ফিরাইবার জন্য বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদান করেন। অলর্ক যদি সহজে সংসার-আসক্তি ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে কৌশলে তাঁহাকে বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত করিতে হইবে। জননীর এতাদৃশ আদেশ পাইয়া তাঁহারা উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা যখন শুনিলেন, অলর্ক পুত্র-পৌত্র-পরিবৃত হইয়া সংসারে মগ্ন আছেন, তখন তাঁহারা জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং অলর্কের সহিত অচিরাৎ সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু

তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অলর্ক বিষয়াদি ছাড়িয়া বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

তখন ভ্রাতারা অনন্যোপায় হইয়া কৌশল-প্রকাশে উদ্যত হইলেন। তাঁহারা সামন্ত রাজাদিগকে আহ্বান করিয়া এক বিপুল বাহিনী গঠিত করিলেন এবং যথাকালে অলর্কের রাজধানী আক্রমণ করিলেন। অলর্ক ভীত হইয়া মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষের পরামর্শ-জিজ্ঞাসু হইলেন। তাঁহারা বড় একটা আশা দিলেন না। তখন মহাভীত হইয়া অলর্ক, ভ্রাতাদের শরণাগত হইবেন কি না তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মাতৃদত্ত কবচের কথা মনে পড়িয়া গেল। ইহার চেয়ে আর কি দুঃখ, কি বিপদ হইতে পারে? নিজের জীবন, পুত্রপৌত্রাদির জীবন, রাজ্য ধন সম্পত্তি বিপন্ন; দেবীস্বরূপা জননী বোধ হয় বহুপূর্ব্বে এই বিপদের চিত্র মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই তিনি প্রিয় পুত্রের রক্ষার্থে কবচ দিয়াছিলেন। স্বর্গগত জননীকে মনে মনে প্রণাম করিয়া তিনি ঝটিতি কবচ উন্মোচন করিলেন। দেখিলেন, কবচ মধ্যে একটী শ্লোক লিখিত আছে। তাহা পাঠ করিলেন,—

শুদ্ধোঽসি বুদ্ধোঽসি নিরঞ্জনোঽসি
সংসার-মায়া-পরিবর্জ্জিতোঽসি।
সংসারস্বপ্নং ত্যজ মোহনিদ্রাং
মদালসা বাক্যমুবাচ পুত্রং॥

এই শ্লোক পড়িবামাত্র অলর্কের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি যে শুদ্ধ বুদ্ধ নিরঞ্জন তাহা বুঝিলেন, বিষয় সম্পত্তি সংসার যে স্বপ্নবৎ তাহাও ক্রমে উপলব্ধি করিলেন। তখন তিনি রাজ্যসংসার সমস্ত হইতে মন ফিরাইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করত অচিরে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত

হইলেন। এবং যথাকালে সিদ্ধিলাভ করিয়া মহাতপস্বী নামে জগতে প্রখ্যাত হইলেন।

আমরা সংসারী মানব যে বৃথাই দিনরাত্রি অতিবাহিত করিতেছি, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত সাধুবাবা একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। কোন এক রাজা শত্রুভয়ে ভীত হইয়া সতত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত থাকিতেন। একদা নিশীথে রাজা যখন নিজ কক্ষে পালঙ্কোপরি নিদ্রিত আছেন, তখন এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন যে, এক ব্যাঘ্রী পঞ্চ-শাবকসহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। তিনি ভীত হইয়া পলাইতে লাগিলেন, ব্যাঘ্রীও শাবকসহ পশ্চাতে ছুটিল। রাজা অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষের উপর আশ্রয় লইলেন। ব্যাঘ্রী বৃক্ষ-নিম্নে গর্জ্জন করিতে লাগিল। রাজা মাথার উপর চাহিয়া দেখিলেন, এক বিষধর সর্প তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। বৃক্ষমূলে দুইটা ভীষণকায় মূষিক—একটী, শ্বেত, অপরটী কৃষ্ণবর্ণ—বৃক্ষমূল নিরন্তর কর্ত্তন করিতেছে। বৃক্ষতলে একপার্শ্বে একটা গভীর কূপ দেখা যাইতেছে। রাজা ভীত হইয়া ঊর্দ্ধমুখ হইলেন। দেখিলেন বৃক্ষচূড়ায় এক বৃহৎ মৌচাক রহিয়াছে। এবং তাহার এক ছিদ্র দিয়া মধু ক্ষরণ হইতেছিল। রাজা মুখ ব্যাদান করিয়া এক বিন্দু মধু গ্রহণ করিলেন। আস্বাদ অতি মিষ্ট। রাজা আর এক বিন্দু মধুর লোভে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিলেন। তিনি ভুলিয়া গেলেন যে, তাঁহার মাথার উপর সর্প গর্জ্জাইতেছে, বৃক্ষমূল মূষিকদ্বয় কর্ত্তন করিতেছে, পদতলে ব্যাঘ্রী গর্জ্জন করিতেছে। রাজা সব ভুলিয়া গিয়া এক বিন্দু মধুর লোভে ঊর্দ্ধমুখে বৃক্ষশাখায় বসিয়া আছেন। সময় বহিয়া চলিল—রাজার ভ্রূক্ষেপ নাই। অবশেষে বৃক্ষ ছিন্নমূল হইয়া গভীর কূপের মধ্যে নিপতিত হইল। রাজা তখন ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই চীৎকারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

সাধুবাবা এই উপাখ্যানটি বলিয়া আমাদের বুঝাইলেন যে, বহিঃশত্রুর সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য আমরা সতত প্রস্তুত, কিন্তু অন্তর-মধ্যে মন যে পঞ্চরিপু লইয়া আমাদিগকে নিয়ত ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, তাহার কোন প্রতিবিধানে আমরা যত্ন লই না। সংসাররূপী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ক্বচিৎ কখন বিন্দুমাত্র সাংসারিক সুখলাভে আমরা বিভোর হইয়া ভুলিয়া যাই যে, মাথার উপর মৃত্যুরূপী ভীষণ সর্প নিয়ত গর্জ্জন করিতেছে, দিনরাত্রিরূপী মূষিকদ্বয় দিনের পর দিন আয়ুঃক্ষয় করিতেছে, মহাকাল কূপরূপে মুখব্যাদান করত গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়া আছে।

তৃতীয় তরঙ্গ

যে পাহাড়টির উপর সাধু বাবার আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নাম তিনি রাখিয়াছেন "কৈলাস"। কেন কৈলাস রাখিয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। জীবমাত্রেই শিব। তিনি নিজকে পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন মনে করেন না। মহাজ্ঞানীদের বিশ্বাস, আব্রহ্ম স্থাবর জঙ্গম সবই পরমাত্মার রূপ। কোনও জীব বা দৃশ্যমান কোন পদার্থ পরমাত্মা হইতে বিভিন্ন নহেন। এই তত্ত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্যে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, গঙ্গা হইতে যে জল তুলিয়া আনিয়া কমণ্ডলুতে রক্ষা করিবে, সে জল গঙ্গাজল বই কিছুই নহে। প্রবাহিণী যেমন গঙ্গা, এই আধারে রক্ষিত জলটুকুও তেমনি গঙ্গা। প্রভেদ এই, প্রবাহিণীতে বহুরত্ন মাণিক্য, নৌকা জাহাজ থাকে; ক্ষুদ্র আধারের জলে সে সব কিছুই থাকে না। আধার ভাঙ্গিয়া দেও, কমণ্ডলুর জল গঙ্গার স্রোতে মিশিয়া যাইবে। এই পাত্রটীই ব্যবধান। আমিত্বই ঘট,

ইহা ভাঙ্গিতে পারিলেই সব গোল চুকিয়া যায়। একদা আমাদের পূজ্যপাদ গুরুমহারাজজী৺শ্রীশ্রীবালানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন, "ভগবানের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ কর—তন্ মন ধন (তনু মন, ধন) তাঁহাকেই সব অর্পণ কর, তবেই আমিত্ব ঘুচিবে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বলিয়াছিলেন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

এখন কৈলাসের কথা বলি। কৈলাস পাহাড়টি অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। চারিদিক্ উন্মুক্ত, নিকটে বসতি নাই। পূর্ব্বদিকে—দূরে রেলপথ, তার অনেক পূর্ব্বে তপোবন, ত্রিকূট প্রভৃতি বড় বড় পাহাড় মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য পাহাড়, তার পিছনে অস্পষ্ট-দৃষ্ট পরেশনাথ পর্ব্বতমালা। পশ্চিমে ঘনবৃক্ষসমাচ্ছন্ন দেবগিরি বা দিগ্রিয়া পাহাড়। উত্তরে বহুদূর উন্মুক্ত—চক্রবালে পাহাড় শ্রেণী। এই রমণীয় দৃশ্যমধ্যে কৈলাস শিখরে শ্রীশ্রীকৈলাসপতি স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন।

পূর্ব্বে কৈলাসপতির রন্ধনগৃহ ছিল না, রন্ধন হইত তখন পাহাড়ের উপর উন্মুক্ত স্থানে। যেদিন বাতাস জোরে বহিত, সেদিন রন্ধন হইত না, বাবার আহারও হইত না। তিনি যে উপবাসী আছেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না—তাঁহার সদাপ্রসন্ন বদনের কোন পরিবর্ত্তন কেহ দেখিতে পাইত না। কোন কারণে তাঁহার ক্রোধ বা বিরক্তি বা ভাবান্তর আমরা লক্ষ্য করি নাই। সকল অবস্থাতে তাঁহার সন্তোষ দেখিতে পাইতাম। অনশনে বা রোগে কখনও তিনি কাতর হইতেন না; সকল অবস্থাতেই তিনি সন্তোষে রহিতেন ও প্রসন্নবদনে বলিতেন, 'পরমাত্মার ইচ্ছা।'

পরমাত্মার ইচ্ছাতেই আজ সহস্র সহস্র ভক্ত বাবার সেবার জন্য লালায়িত। কেহ তাঁহার সমুচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে, কেহ

তাঁহার সেই গৃহকে নানাবিধ আসবাব পত্রে সাজাইয়াছে, কেহ কূপ খনন করিয়া তাঁহার জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছে, কেহ বা সুবৃহৎ রন্ধন শালা উঠাইয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে। বাবা আমার নির্ব্বিকার—তাঁহার নিকট পর্ণকুটীর ও অট্টালিকা তুল্য। তাঁহার সেবার্থে এখন কেহ কিছু দিতে আসিলে তিনি আর তাহাকে বিমুখ করেন না। বিমুখ করিলে ভক্ত যে প্রাণে কষ্ট পাইবে। তিনি কাহাকেও মনঃকষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না। সর্ব্বজীবেই যিনি পরমাত্মাকে দেখেন, তিনি কি কাহারও প্রাণে ব্যথা দিতে পারেন ?

সকল ব্যক্তিরই তিনি দয়ালু পিতা। প্রথমে বাবা একাই এই পাহাড়ে থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনেক ভক্ত আসিয়া জুটিতেছে। তাঁহারা বাবার সেবা করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছেন। তখন যদি কেহ বাবার নিকট আসিতেন, তবে স্থানাভাব হেতু সন্ধ্যা-সমাগমে নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইতেন। বাবা একাই থাকিতেন। তাহাতে কিছুমাত্র অসুবিধা হইত না। রাত্রি দুইটার সময় যখন ডাকগাড়ী যশিডি অতিক্রম করিয়া মহাগর্জ্জনে কলিকাতা অভিমুখে ছুটিত, তখন বাবা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতেন এবং শীত বর্ষা, অন্ধকার, নির্জ্জনতা, সর্প ব্যাঘ্রের গর্জ্জন অগ্রাহ্য করিয়া পাহাড়ের পাদদেশ প্রবাহিতা ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর তুষার-শীতল জলে স্নানাদি সমাপন করিয়া কৈলাসের উন্মুক্ত চত্বরের উপর বসিয়া উপাসনা করিতেন। এ অভ্যাস তাঁহার বহুদিন ছিল, যখন বহু ভক্ত সাধু সন্ন্যাসী এই পাহাড়ে বাবার আশ্রয়ে বাস করিতেন, তখনও ছিল ; এখন বুঝি আর নাই। শরীর এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, সাধনের বুঝি আর প্রয়োজনও নাই। এখন মন সকল সময়ে আত্মচিন্তায় ব্যাপৃত, পরমাত্মার চিন্তায় বিভোর। তপস্যার বুঝি আর প্রয়োজন নাই।

সাধুবাবা একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, মনের উপর জোর না করিয়া 'প্রেমসে' উহাকে আয়ত্ত করিবে। উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে গরু ছাগলের পশ্চাতে লাঠি লইয়া দৌড়াইলে তাহাকে ধরা যাইবে না, আদর করিয়া ঘাস জল দিলে তাহাকে সহজে বশে আনা যায়।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন, পরমাত্মা উজ্জল দীপকের ন্যায় সতত আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। যেমন কোন আলোকোদ্ভাসিত কক্ষমধ্যে বহুব্যক্তি একত্র সমবেত হইয়া আমোদ প্রমোদ করণানন্তর স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেও দীপ নির্জ্জন কক্ষে সমভাবেই আলো প্রদান করিতে থাকে, তেমনি সুখ দুঃখ প্রভৃতি অভিনয়ের মধ্যে আত্মা নির্ব্বিকার—কিছুই তাহাকে স্পর্শ করে না। আত্মা ভাবাতীত, গগন সদৃশ। শ্রীকৃষ্ণ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই কথাই বলিয়াছেন।

অপর একদিন সাধুবাবাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সেদিন আমাদের একটী দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছিলেন, পঞ্চেন্দ্রিয় কিরূপ বিষময় ফল আমাদের মনোমধ্যে উৎপন্ন করে। পতঙ্গ, কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন এক একটী ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া পরিণামে মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়া আসে। পতঙ্গ চক্ষুর লোভে পড়িয়া প্রাণ দেয়, কুরঙ্গ কর্ণেন্দ্রিয়, হস্তী স্পর্শেন্দ্রিয়, ভৃঙ্গ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, মীন রসনার লোভে পড়িয়া প্রাণ দেয়। কেহ প্রজ্বলিত অনলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, কেহ বংশীধ্বনিতে মোহিত হইয়া পাশ-বদ্ধ হয়, কেহ স্ত্রী-অঙ্গ স্পর্শ-লোভে ফাঁদের ভিতর আসিয়া পড়ে, এবং কেহ বা রসনার লোভে পড়িয়া মৎস্যধারীর দণ্ডে প্রাণ দেয়। জীবকে মৃত্যুপথে টানিয়া আনিতে একটী ইন্দ্রিয়ই যথেষ্ট। কিন্তু যাহাকে লইয়া পাঁচটী ইন্দ্রিয় অবিরাম টানাটানি করিতেছে, তাহার পরিণাম কি হইবে? ভগবান্ মানুষকে বিচারশক্তি ও সংযম দিয়াছেন। এই শক্তির পরিচালনা না করিলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

পরদিন অপরাহ্ণে পুনরায় সাধুবাবার নিকট গিয়াছিলাম। প্রায়ই আমরা যাই আসি, কিন্তু আমাদের পরিচয় কখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই। আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার উত্তর তিনি দিয়া যান; কিন্তু তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না। সেদিন গিয়া দেখি বাবা বারান্দায় বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন; বোধ হয় সেখানি 'পঞ্চদশী'। বাবা আমাদিগকে আদর করিয়া বসাইলেন। গল্পাদি করিতে করিতে সহসা দেখিলাম, আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল। অচিরে বৃষ্টিও নামিল। পাহাড় পর্ব্বত অদৃশ্য হইল, অকালে অন্ধকার নামিয়া আসিয়া আকাশ পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করিল। আমরা ভীত হইলাম এবং গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। বৃষ্টি একটু কমিলে আমরা যাত্রা করিলাম, কিন্তু নিরবলম্বনে নয়,—বাবার তখন একটী মাত্র ছাতা ও একটী মাত্র লণ্ঠন ছিল; তিনি তাহাই আমাদিগকে দিলেন। তাঁহাকে অন্ধকারে রাখিয়া আমরা লণ্ঠন লইতে স্বীকৃত হই নাই। কিন্তু বাবা যখন পুনঃ পুনঃ বলিলেন, অন্ধকারে থাকা আমার অভ্যাস আছে, তখন আমরা আলো লইতে আর সঙ্কোচ বোধ করিলাম না। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে আমাদের লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল— বাবার দ্রব্যাদি তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া পাঠাইলাম।

বাবা বলিয়াছিলেন অন্ধকারে থাকিতে তাঁহার অভ্যাস আছে। সেই কথায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের একটী কথা মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"হৃদাকাশে চিদানন্দো মুদা ভাতি নিরন্তরম্।
উদয়াস্তং ন পশ্যামি কথং সন্ধ্যা হ্যুপাস্যতে॥"

যাঁহাদের হৃদয়াকাশে নিরন্তর আলো জ্বলিতেছে, তাঁহাদের বাহিরের আলোকের প্রয়োজন খুব কম।

পরদিন আবার কৈলাসে আসিলাম। বাবা সেদিন এক উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। কোন এক রাজা সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও নিরভিমান ছিলেন। বিশেষ এক যজ্ঞ করিতে তাঁহার বাসনা জন্মিল। তদুপলক্ষে তিনি বহু ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। অতিথিরা সভাসীন হইলে রাজা শুনিলেন, তাঁহার রাজধানীর সন্নিকটে এক সাধু বাস করেন, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। রাজা তৎক্ষণাৎ সাধুকে লইয়া আসিতে মন্ত্রীকে প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রী করযোড়ে সাধুকে নিমন্ত্রণ ও আহ্বান করিলেন। কিন্তু সাধু যজ্ঞে আসিতে সম্মত হইলেন না। মন্ত্রীর বহু অনুরোধের পর সাধু কহিলেন, "রাজা যদি তাঁহার যজ্ঞফল আমাকে দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি।" মন্ত্রী ফিরিয়া গিয়া রাজার নিকট সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। রাজা কহিলেন, "তুমি কেন সম্মত হইলে না ? আমি ত যজ্ঞফলের আকাঙ্ক্ষী নহি।" বলিয়া তিনি নিজেই সাধুকে আনিতে গমন করিলেন। সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলে সাধু কহিলেন, "তুমি আমাকে যদি যজ্ঞফল দিতে সম্মত হও, তবে আমি তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি।" রাজা কহিলেন, "আপনার কৃপা লাভার্থে আমি পদব্রজে দীনভাবে আসিয়াছি, প্রতি পদক্ষেপে আমি শত শত যজ্ঞফল লাভ করিয়াছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক সে সমস্ত গ্রহণ করুন এবং তৎসঙ্গে আমার যজ্ঞফলও গ্রহণ করুন।" সাধু প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "তোমাকে কিছুই দিতে হইবে না—আমি সানন্দে তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।" বাবা এই গল্পটী বলিয়া বলিয়াছিলেন—

"সন্ত মিলনকো যাইয়ে ত্যজ মমতা অভিমান।
যঁউ যঁউ পাগ আগে ধরে তেঁউ তেঁউ যজ্ঞ সমান॥"

অর্থাৎ সাধু সন্ত দর্শন নিমিত্ত গমনকালে মমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কার

ত্যাগপূর্ব্বক যাইতে হয়। এইরূপ ভাবে গেলে তাহার প্রতিপদক্ষেপেই যজ্ঞফল-লাভ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজও একদিন ঠিক এই কথাটীই বলিয়াছিলেন। আরও তিনি বলিয়াছিলেন—সাধু মহাত্মার নিকট যাইতে হইলে মনরূপ পাত্রটী খালি করিয়া যাওয়া আবশ্যক। পাত্রটী যদি অহঙ্কারাদি দ্বারা পূর্ণই থাকে, তবে উপদেশ গ্রহণ করিবে কিসে?

চতুর্থ তরঙ্গ

আর একদিন বাবা আমাদের বুঝাইয়াছিলেন, যার হৃদয়ে সন্তোষ আছে, সেই সুখী, দরিদ্র হইলেও সে রাজার উপর রাজা। যার বাসনা আছে, সে মহাধনী হইলেও দুঃখী।

ক্রোধ সম্বন্ধে বাবা বলিয়াছিলেন, ক্রোধ চারি প্রকার। সাধু সজ্জনের ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী,—মুখেই গর্জ্জন, অন্তর মধুময়। জনহিতার্থে অনেক সময় তাঁহারা মুখে ক্রোধ প্রকাশ করেন। সে ক্রোধ অতি ক্ষণস্থায়ী; যেমন জলের উপর দাগ পাড়িলে কোন অঙ্কপাত হয় না, সেইরূপ তাঁহাদের ক্রোধ চকিতের জন্যে প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় ক্রোধের দৃষ্টান্ত যথা, বালুকার উপর রেখা। তৃতীয় ক্রোধ, প্রস্তরের উপর রেখার ন্যায় মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। চতুর্থ ক্রোধ লৌহোপরি গভীর অঙ্কপাতের ন্যায় জন্মান্তর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই ক্রোধ অতি ভয়ঙ্কর; জন্মান্তরে প্রতিহিংসা লইতে জন্ম লয়। বাবা তাই বলিলেন, ক্রোধ পরিহার করা সর্ব্বজীবেরই কর্ত্তব্য। ক্ষমা ও ধৈর্য্য দ্বারা ক্রোধ জয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, কাম ক্রোধ লোভ, এই তিন রিপু নরকদ্বার উন্মোচন করে। (গীতা ১৬।২১) কাম ধ্বংস হয় বস্তুবিচার দ্বারা,

লোভ নষ্ট হয় সন্তোষ দ্বারা। অতএব এই তিন রিপুকে সংহার করিবার চেষ্টা সতত করা উচিত।

আর একদিন এক শোকাতুরার দুঃখ-কাহিনী শ্রবণানন্তর বাবা একটী উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। সুখ ও দুঃখ কিছুই যে স্থায়ী নয়—চক্রবৎ নিরন্তর ঘুরিতেছে—ইহাই গল্পের প্রতিপাদ্য। গল্পটী এই—

কোন এক বড় সহরে এক সময়ে এক নামজাদা ধনী জহুরী বাস করিতেন। তাঁহার এমনি শক্তি ছিল যে, যে কোন রত্নাদি তাঁহার নিকট আনিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার যশঃ যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কোষাগারে তেমনি অর্থও আসিতে লাগিল। তাঁহার বিশাল অট্টালিকা, বিস্তীর্ণ উদ্যান, প্রচুর ধনরত্ন তাঁহার বৈভবের পরিচয় দিতেছিল। গৃহে পতিপরায়ণা স্ত্রী, বাহিরে বহু বন্ধু-বান্ধব, অনুরক্ত দাসদাসী, তাঁহার সুখের মাত্রা বাড়াইয়াছিল। একদা উক্ত জহুরী তাঁহার স্ত্রীকে কহিলেন, 'আমার মত ভাগ্যবান্ পুরুষ সংসারে বিরল। আমি ধূলিমুষ্টি ধরিলে তাহা স্বর্ণমুষ্টি হইতেছে, আমি যে স্থানে পদক্ষেপ করি, সেই স্থানে যেন ফুল ফুটিয়া উঠে—আমার প্রত্যেক কার্য্যেই সিদ্ধি,প্রত্যেক উদ্যমে অর্থলাভ।'

সাধ্বী স্ত্রী ইহা শ্রবণানন্তর কহিল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমরা উন্নতির চরমে উপনীত হইয়াছি, এইবার আমাদের পতন আরম্ভ হইবে। সনাতন নিয়ম কখন লঙ্ঘিত হইতে পারে না—সুখের পর দুঃখ আসিবেই। সাধ্বীর বাক্য মিথ্যা হইল না,—চারিদিক্ হইতে বিপদ্ আসিয়া এই দম্পতিকে ঘিরিতে লাগিল। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সকলে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। রাজরোষে পতিত হইয়া ধনভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইল ; অবশেষে জহুরী গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলেন—তাঁহার যাহা কিছু ছিল সকলই পরহস্তগত হইল। তখন দম্পতি পরামর্শ করিয়া

সাব্যস্ত করিলেন, পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে নগরের ভিতর বাস করা তাঁহাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। তখন তাঁহারা এক অন্ধকার রাত্রিতে নগর ত্যাগ করিলেন এবং সুদূর এক পল্লী-প্রান্তে বৃক্ষাশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইহাতেও তাঁহাদের দুঃখের অবসান হইল না। কিছু কাল পরে জহুরী কষ্টে ও দুঃখে পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। তখন ঐ পতিব্রতা স্ত্রী ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া যাহা পাইতেন, তাহা আনিয়া স্বামীকে খাওয়াইতেন এবং ভুক্তাবশেষ নিজে গ্রহণ করিতেন। এইরূপে দুঃখে কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু তখনও তাঁহাদের দুঃখের চরম হয় নাই।

একদা জহুরীর হালুয়া খাইবার ইচ্ছা হইল। তিনি স্ত্রীর নিকট সে কথা প্রকাশ করিলেন। সাধ্বী স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ভিক্ষার্থে প্রস্থান করিলেন। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মাত্র তিনটী পয়সা ভিক্ষায় মিলিল। এক এক পয়সার ময়দা গুড় তৈল খরিদ করিয়া গৃহে যখন ফিরিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। হালুয়া প্রস্তুত করিয়া দেখেন স্বামী জ্বরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছেন। তখন তিনি হালুয়াটুকু মৃৎপাত্রে রাখিয়া পত্রাচ্ছাদন করিলেন এবং সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অনশনে ক্লান্ত হইয়া সত্বর ঘুমাইয়া পড়িলেন। রাত্রিশেষে জহুরীর জ্বরত্যাগ হইলে জহুরী ক্ষুধার্ত্ত হইয়া হালুয়া চাহিলেন। স্ত্রী কহিলেন, 'তোমার পাশেই হালুয়া ঢাকা আছে।'

জহুরী ব্যস্ত হইয়া খাইতে গিয়া দেখেন, পাত্রে হালুয়া নাই—কুকুরে হালুয়াটুকু নিঃশেষ করিয়া খাইয়া পাত্রমধ্যে বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাতুর জহুরী তদ্দৃষ্টে কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্ত্রীর অন্তরে খুবই বেদনা লাগিল। তথাপি তিনি আবেগভরে কহিলেন, এইবার আমাদের দুঃখ চরমে উঠিয়াছে, এখন সুখের দিন নিশ্চয়ই আসিবে।

পর দিবস জহুরী কিছু সুস্থ বোধ করিলেন। তখন তিনি ভাগ্য-পরীক্ষার্থে অদূরবর্ত্তী নগরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, কয়েক ব্যক্তি একত্র হইয়া এক মহার্ঘ রত্নের মূল্য-নিরূপণ লইয়া বিবাদ করিতেছেন। জহুরী রত্নদৃষ্টে অচিরে তাহার মূল্য স্থির করিয়া দিলেন; বিবদমান্ ব্যক্তিগণ জহুরীর শক্তির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহার দোকানে জহর-পরীক্ষার্থে পূর্ব্বোক্ত জহুরীকে নিযুক্ত করিলেন। জহুরী স্বল্পকাল মধ্যে মালিকের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া দোকানের উন্নতি করায় উহার অংশীদাররূপে পরিগণিত হইলেন এবং অপুত্রক মালিক দেহরক্ষা করিলে দোকানের পূর্ণ অধিকারিরূপে বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করত পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

সচরাচর দেখা যায়, সংসারত্যাগী সাধুদের বয়স বেশী হইলেও তাঁহাদের দেহে জরাব্যাধি সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। বোধ হয় সংযম ও পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যই ইহার কারণ। সাধু বাবার বয়স অনেক হইলেও তিনি অনেক যুবক অপেক্ষা অধিক কর্ম্মঠ। তাঁহার সুঠাম বলিষ্ঠ ও তেজঃপুঞ্জ দেহ, লঘু ও দ্রুত পদবিক্ষেপ, দেখিলে মনে হয় এ দেহে বুঝি কখনই ব্যাধি প্রবেশ করে নাই। কৌতূহলী হইয়া আমরা একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; বাবা তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "ব্যাধি হয় বই কি মায়ি! তবে তাহাতে আমরা বিচলিত হই না।"

"কে তখন আপনার সেবা করে? আপনি ত একাই থাকেন।"

"ঔষধ বা শুশ্রূষার কোন প্রয়োজন হয় না। ব্যাধির নির্দ্দিষ্ট ভোগ-কাল কাটিয়া গেলে, ব্যাধিমুক্ত হই।"

এ বিশ্বাস ত আমাদের নাই। আমরা স্থূল জগৎ ছাড়া আর কিছু বড় দেখিতে পাই না, তাই আমাদের বিশ্বাস বৈদ্য ও ঔষধের উপরেই সমধিক।

আমরা মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর বাবাকে দেখিতেছি, কিন্তু কখনও কোন কারণে কোন অবস্থাতেই তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই।

পঞ্চম তরঙ্গ

অপর একদিন সাধু বাবার নিকটে কৈলাসে উপস্থিত হইলে, কপটাচারী সন্ন্যাসীর কথা উঠিল। বাবা বলিলেন, ভাণ করিয়া কেহ যদি ভগবানের নাম করে তাহাতে বিশেষ কোন অপরাধ নাই। কিন্তু কেহ যদি ভিতরে বাহিরে তাঁর নাম গ্রহণ না করে সেই মহা অপরাধী। নাম করিতে করিতে নামের প্রভাবে ভণ্ডও সাধু হয়। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটী উপাখ্যান বলিলেন।

এক রাজার ইচ্ছা হইল, তিনি সাধু দর্শন করেন। কিন্তু তাঁহার দেহ বৃদ্ধ, পাহাড় জঙ্গলে সাধু খুঁজিয়া বেড়ান তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন, এক প্রকৃত সাধুর অন্বেষণ কর, আমি তাঁহাকে দর্শন করিব। ছয় মাস তোমাকে সময় দিলাম। এই সময়ের মধ্যে সাধু-দর্শন ঘটাইতে পারিলে আমি তোমাকে পুরস্কৃত করিব ; না পারিলে, শাস্তি দিব।

মন্ত্রী মহা বিপাকে পড়িলেন ; কোথায় তিনি এখন সাধু পাইবেন। নিকটে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও সাধু মিলিল না, হাটে বাজারে ত সাধু ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না ! তখন তিনি এক সঙ্কল্প আঁটিলেন। রাজার অশ্বসেবকদের মধ্যে এক ব্যক্তি অতি সুদর্শন ছিল। তাহার বুদ্ধিও প্রখর। মন্ত্রী তাহাকে সাধু সাজাইবার অভিপ্রায়ে নগর বাহিরে আনিলেন এবং ক্ষুদ্র এক জঙ্গল মধ্যে তাহার নিমিত্ত একখানি কুটীর

তুলিয়া দিলেন। মন্ত্রী তখন তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন যে, "তোমাকে কপট সাধুর বেশ ধারণ করিয়া রাজার চিত্ত আকর্ষণ করিতে হইবে। তোমাকে মন্ত্র দিতেছি, আসন করিতে শিক্ষা দিতেছি, হাবভাব বলিয়া দিতেছি, কিন্তু তোমাকে মৌনী থাকিতে হইবে, নতুবা তোমার বিদ্যাবুদ্ধি ধরা পড়িবে।"

সহিস প্রথমে এ কার্য্যে স্বীকৃত হইল না, পরে অর্থলোভে সম্মত হইল। মন্ত্রী আশ্বাস দিলেন, বিপুল অর্থ প্রণামী-স্বরূপ পাওয়া যাইবে; তাহার অর্দ্ধাংশ তোমার। সহিস তখন মহা উৎসাহে কার্য্যে ব্রতী হইল। মন্ত্রী তাহাকে অবকাশমত প্রত্যহ শিক্ষা দিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

ছয় মাস অতীত হইলে রাজা নির্দ্দিষ্ট দিনে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধুর সন্ধান পেয়েছ?"

"পেয়েছি মহারাজ। ইনি খুব জবর সাধু। হিমালয়ের বরফান্ প্রদেশে এক গুহার মধ্যে ব'সে তপস্যা করছিলেন। এখন দেশভ্রমণে বা'র হয়েছেন বটে, তবে অনেক সময় মৌনীই থাকেন। আমি লোকজন পাঠিয়ে অনেক চেষ্টা করেই তাঁকে এনে নগরের বাইরে একটী জঙ্গলের মধ্যে রেখেছি। মহারাজের ইচ্ছা হলে—"

"আমি আজই তাঁকে দর্শন করতে যাব। কোষাধ্যক্ষকে সংবাদ দেও—শ্রেষ্ঠ রত্নাদি সঙ্গে লও।"

"মহারাজ, রত্নাদির প্রয়োজন কি?"

"তুমি জান না মন্ত্রি, রাজা, বৈদ্য, জ্যোতিষী ও সাধুর নিকট কখন রিক্তহস্তে যেতে নেই।"

মন্ত্রী পুলকিত অন্তরে উদ্যোগ আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন এবং যথাকালে রাজাকে লইয়া সাধুর কুটীরে দর্শন দিলেন। ভণ্ড সাধু

মুদ্রিত নয়নে নীরবে বসিয়া রহিল। রাজা সাষ্টাঙ্গে সাধুকে প্রণাম করিয়া বহুমূল্য রত্নাদি সাধুর চরণে রক্ষা করিলেন। সাধু তৎপ্রতি একবারও ফিরিয়া দেখিল না। সাধুর যোগ-বিঘ্ন না করিয়া রাজা নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অত্যন্ত প্রীত হইয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, "এ মহাত্মা খুব জবর; দেখো এঁর সেবার যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

মন্ত্রী কহিলেন, "ইনি কোন আহার্য্যই গ্রহণ করেন না—অহোরাত্র ধ্যানে মগ্ন থাকেন।" ইহাতে রাজার ভক্তি খুব বাড়িয়া গেল। সাধারণ ব্যক্তিরা চায়, যে বড় সাধু হ'বে, সে গাছতলায় পড়ে থাক্‌বে, বায়ু বা বৃক্ষের গলিত পত্র ভক্ষণ করবে; প্রার্থীদের কাউকে ধূনি হ'তে একটু ভস্ম তুলে দিয়ে বলবে, যাও, তোমার লেড়্‌কা হ'বে, তোমার রোগ আরাম হ'বে, অথবা মোকদ্দমা জয় হ'বে।

রাজাও সাধারণ লোকের মত এই নিরাহারী সাধুর প্রতি খুব ভক্তিযুক্ত হইয়া কহিলেন, "এইবার সাধুর কাছে একটী ছেলে চেয়ে নেব।"

উভয়ে প্রাসাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। মন্ত্রী সাধুর নিকট ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন; তিনি ভাবিলেন, রাজা বহুরত্ন তাহাকে দিয়াছেন, সে হয় ত এতক্ষণ মন্ত্রীকে ভাগ না দিয়াই চম্পট দিয়াছে। মন্ত্রী রাজাকে প্রাসাদে পৌছাইয়া দিয়া সাধুর নিকট অশ্বারোহণে ফিরিয়া গেলেন।

এ দিকে সহিসের মন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নামের মহিমাতেই হউক, অথবা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফলেই হউক, বা তার প্রতি রাজার ভক্তি দেখিয়াই হউক, তাহার মনে বিবেক বৈরাগ্য জাগরিত হইয়াছে। সে ভাবিয়া দেখিল, যে ব্যক্তি রাজার সহস্র সহস্র ভৃত্যের মধ্যে অতি নগণ্য, যে ব্যক্তি রাজার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে কখন

প্রণাম করিতে সাহস পায় নাই, আজ তাহারই চরণে রাজার গর্ব্বোন্নত-শির লুণ্ঠিত। রাজা কাহাকে প্রণাম করিলেন? তাহার এই বেশকে; রাজা কাহাকে এই মহামূল্য উপহার দিলেন? তাহার এই বেশকে। এই সাধুর বেশ তবে আমি আর ত্যাগ করি কেন? যদি নকল সাধুরই এত সম্মান, তবে আমি কেন প্রকৃত সাধু হইতে চেষ্টা না করি?

মন্ত্রী অত্যন্ত চিন্তিত অন্তরে ফিরিয়া আসিয়া দূর হইতে দেখিলেন, সহিসটা পলায় নাই; নিকটে আসিয়া দেখিলেন, ধনরত্ন স্পৃষ্ট হয় নাই—পূর্ব্ববৎ রক্ষিত রহিয়াছে। মন্ত্রী সবিস্ময়ে দেখিলেন, সহিসটা নিমীলিত নেত্রে তখনও পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছে, রত্নাদির পানে একবারও যে ফিরিয়া দেখিয়াছে, এরূপ মনে হইল না। মন্ত্রী তাহাকে ডাকিলেন, নকল সাধু চাহিয়া দেখিল। মন্ত্রী কহিলেন, "আমি তোমার প্রতি খুব খুসী হয়েছি, তুমি এখন এই ধনরত্নাদির অর্দ্ধেক ভাগ গ্রহণ করতে পার।"

সে কহিল, "আমি ধনরত্নাদি চাই না, আপনি সমস্ত গ্রহণ করতে পারেন। আমি এখন বিদায় লই।"

সে প্রকৃত সাধনার উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

গল্পটী শুনিতে শুনিতে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের একটী উপদেশ মনে পড়িল। তিনি বলিয়াছিলেন, নিবৃত্তি সব চেয়ে ভাল বটে, কিন্তু পূর্ণ নিবৃত্তি-মার্গে গেলে অপরের উপকার করা চলে না। আর উহা একেবারে আসেও না। মনে প্রবৃত্তি, বাহিরে নিবৃত্তি দেখান মন্দের ভাল; কেন না, নিবৃত্তি দেখাইতে দেখাইতে মনে প্রকৃত নিবৃত্তি জাগিতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তির ভিতরে বাহিরে প্রবৃত্তির প্রবাহ অপ্রতিহত চলিয়াছে, তাহার নিবৃত্তির পথে আসা সহজ নয়।

সংসার যে কিরূপ মায়াজাল বিস্তার করিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া

রাখিয়াছে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা আমাদের একটী গল্প বলিলেন ;—

এক রাজা একটী বিস্তীর্ণ উদ্যান গঠন করিবার হুকুম দিলেন। উদ্যানের নানাস্থানে বহুবিধ আমোদ প্রমোদ নাচ তামাসার ব্যবস্থা হইল। মধ্যস্থলে বহু বিপণি মূল্যবান্ দ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে উদ্যানের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হইল। দূতমুখে রাজা প্রচার করিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য এই উদ্যানের দ্বার মুক্ত থাকিবে ; যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে এই উদ্যানে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং ইচ্ছামত একটী দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিবে। একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দূত ইহাও জানাইল যে, এই সময়ের মধ্যে কেহ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলে রাজা তাহাকে দর্শন দিবেন, প্রার্থনামত তাহাকে পারিতোষিক দিবেন, এমন কি, তাহাকে এই উদ্যানও দিতে পারেন।

প্রবেশ-দ্বারে বিপুল জনতা। তাহাদের সকলের ইচ্ছা রাজাকে গিয়া আগে দর্শন করে এবং এই উদ্যান চাহিয়া লয়। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাজদর্শনের বাসনা তাহাদের চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হইল। কোথাও তামাসা হইতেছে, তামাসা দেখিতে কেহ দাঁড়াইয়া গেল, স্থানে স্থানে নৃত্যগীত হইতেছে তাহা দেখিতে কেহ দাঁড়াইয়া গেল। সে সব অতিক্রম করিয়া যাহারা মধ্যস্থলে উপনীত হইল, তাহারা বিপণি হইতে এক একটী মূল্যবান্ রত্ন সংগ্রহ করিল। যাহারা আসিল সকলেই আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইল। রাজার নিকট যাইবার কাহারও সময় হইল না, কাহারও বা স্মরণ হইল না যে, কল্পতরু রাজা অদূরেই রহিয়াছেন, কিন্তু দর্শন ঘটিল না। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল,—তামাসা দেখিতে রত্ন কুড়াইতে তাহাদের সময় ফুরাইয়া গেল। কিন্তু দুই এক জন চতুর ব্যক্তি কোন দিকে না চাহিয়া, কোন তামাসায়

আকৃষ্ট না হইয়া বরাবর রাজার নিকট চলিয়া গেল ও রাজকৃপায় বাঞ্ছিত ফললাভ করিল।

এই রাজাই শ্রীভগবান্, আর এই উদ্যান আমাদের সংসার। সংসারের বিচিত্র মায়া কাটাইয়া তাঁহার নিকট পৌছিবার পূর্ব্বেই জীবন শেষ হইয়া আসে। যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহারা সকল মায়া কাটাইয়া, কোনো রত্নের লোভে প্রলুব্ধ না হইয়া একেবারে বরাবর ভগবানের নিকট চলিয়া যায়। যাহারা এইরূপ পারে, তাহারাই শক্তিশালী ও প্রকৃত বুদ্ধিমান্।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

সাধু বাবার সারগর্ভ উপদেশ শুনিতে আমরা কৈলাসে প্রায়ই যাইতাম। সময় যে অমূল্য, ইহা কদাচ বৃথা নষ্ট করা উচিত নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য বাবা একদিন একটী গল্প বলিলেন :—কোন দেশে এক বড় রাজা ছিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট রাজ্যপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবে, তিনি তাঁহাকে সাতদিনের জন্য সমস্ত রাজ্যভার ছাড়িয়া দিবেন ; কিন্তু সাতদিন পরে তাহাকে নদীপারে হিংস্রজন্তু সমাকুল অরণ্যমধ্যে নির্ব্বাসিত করিবেন। নির্ব্বাসনের কথায় লোকে প্রথমটা আতঙ্কিত হইল বটে, কিন্তু রাজা হইবার লোভ তাহারা সংবরণ করিতে পারিল না। প্রবৃত্তি-তাড়িত ব্যক্তিরা একে একে রাজ্যপ্রার্থী হইল। প্রথমে যে রাজা হইল, সে তাহার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সাতদিন পরে নদীর পারে জঙ্গলের মধ্যে নির্ব্বাসিত হইল। সে আর ফিরিল না। তথাপি অপর এক ব্যক্তি প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইল। রাজা সরিয়া দাঁড়াইলেন, মন্ত্রী প্রভৃতি করযোড়ে তাহার হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়াইল। কিন্তু সে অন্যকর্ম্মে মনযোগ না দিয়া ভোগসুখেই মগ্ন হইল। সে তাহারই প্রবৃত্তি চরিতার্থ

করিয়া সপ্তাহ অন্তে নির্ব্বাসিত হইল। তাহাকে কেউ আর জীবিত দেখিল না। এইরূপে বহু ব্যক্তির ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল; তখন দেশময় আতঙ্কের করাল ছায়া ব্যাপ্ত হইয়াছে,—ভয়ে আর কেহ অগ্রসর হইল না। কিন্তু এক সুচতুর ব্যক্তি সহসা একদিন রাজদ্বারে প্রার্থী হইলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন। সে ব্যক্তি কালবিলম্ব না করিয়া মন্ত্রী প্রভৃতি কর্ম্মচারীদের আহ্বান করিলেন এবং আদেশ করিলেন, লক্ষ লোক লাগাইয়া নদীর উপর দুই দিনের ভিতর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেও।

সেতু নির্ম্মিত হইলে রাজা আদেশ করিলেন, দুইলক্ষ লোক নিযুক্ত করিয়া নদীর অপর পারে যে জঙ্গল আছে তাহা কাটিয়া পরিষ্কৃত কর। এবং ঐ পরিষ্কৃত ভূমির উপর বিশাল অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর। এই কার্য্যের জন্য তিনি চারিদিন সময় দিলেন। সপ্তম দিবস প্রভাতে তিনি আদেশ করিলেন, রাজ-কোষাগার হইতে সমস্ত ধন রত্ন উঠাইয়া নদীর পরপারে আমার নূতন প্রসাদে রক্ষা কর।

রাজার আদেশ প্রতিপালিত হইল। সপ্তম দিবসের রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বে তিনি স্বেচ্ছায় রাজধানী ত্যাগ করিয়া নদীপারে নূতন প্রাসাদে আশ্রয় লইলেন। তাঁহাকে আর নির্ব্বাসনের দণ্ড গ্রহণ করিতে হইল না। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিয়া ঈপ্সিত স্থান লাভ করিলেন।

বাবা গল্পটী বলিয়া আমাদের বুঝাইলেন যে, এই রাজাই হইতেছেন শ্রীভগবান্। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সকলকেই এ সংসারে পাঠাইয়াছেন। আমাদের বিবেকবুদ্ধি, বিচারশক্তি দিতেও তিনি কার্পণ্য করেন নাই। আমরা যদি তাঁহার দান উপেক্ষা করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়টুকু আলস্যে ও প্রবৃত্তি চরিতার্থতায় নষ্ট করি,তাহা হইলে অসময়ে আমাদের

সংসার হইতে সরিয়া যাইতে হয়। সেই জন্য বিচারশক্তি দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিরোধ করত সময়ের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তবেই ভবিষ্যতে বাঞ্ছিত ফললাভ হইতে পারে।

আর একদিন বাবা আমাদের বুঝাইতেছিলেন, অন্তরের ব্যাকুলতাই ভগবানের লক্ষ্য ; বাহ্যাড়ম্বর, রাজসিক ভাব প্রভৃতির দিকে তিনি বড় একটা চাহিয়াও দেখেন না। যার হৃদয়ে আন্তরিক প্রেম ও ব্যাকুলতা আছে, তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যগ্রতা বা উৎকট ইচ্ছা জন্মিয়াছে, সেই তাঁহাকে পায়,—মণিমুক্তা দিয়া তাঁহাকে কিনিতে পাওয়া যায় না। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একদিন এক গল্প বলিলেন।

এক ভীল রাজা ছিল ; ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন ভাব তাহার হৃদয়ে ছিল বলিয়া মনে হয় না। সে ভাবিল, আমিও রাজা, ঈশ্বরও রাজা ; তবে তিনি একটা খুব বড় দেশের রাজা, আমি একটা ছোট দেশের রাজা। অতএব তাঁহার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত। কিন্তু কোথায় তাঁহার দর্শন পাব ?

ভীল ঈশ্বরের বাড়ীর ঠিকানা অবগত নয়, অথচ তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিতে বদ্ধপরিকর। তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা যদি কাহারও নিকট পাওয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে সে অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। একদা গঙ্গাকূলে ভ্রমণকালে দেখিল, উপকূলবর্ত্তী এক শিবালয়ে জন-সমাগম হইয়াছে। কৌতূহলী হইয়া দূর হইতে তাহাদের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে লাগিল। দেখিল, কেহ শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালিতেছে, কেহ ফুল বেলপাতা দিতেছে, কেহ বা ভক্তিপূর্ব্বক যুক্তকরে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে। ভীল নীচ জাতি মন্দির মধ্যে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। জিজ্ঞাসাবাদে অবগত হইল, এই শিবলিঙ্গই জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর। রাজার অনুসন্ধান না পাইয়া ভীল গৃহপ্রত্যাগত

হইল ; এবং সন্ধ্যাকালে এক খরগোশ শিকার করিয়া মহাদেবের মন্দির অভিমুখে ধাবিত হইল ; তখন গভীর রাত্রি। মন্দিরে জনমানব নাই। ভীলের সঙ্গে জলপাত্র ছিল না, জাহ্নবী হইতে মুখে করিয়া জল আনিল। মন্দির-দ্বার রুদ্ধ ছিল, পদাঘাতে ভাঙ্গিল। জনশূন্য অন্ধকারাবৃত মন্দিরমধ্যে পাদুকাসহ রক্তাপ্লুত শশকহস্তে প্রবেশ করিল।

তারপর ভীলরাজ মুখের জল লিঙ্গশিরে ঢালিল ; রক্তাক্ত শশকের মাংস মহাদেবের শিরোপরি প্রেমের সহিত রক্ষা করিল। পরে যুক্তকরে কহিল, "বন্ধু, তোমার জন্যে ভেট এনেছি, গ্রহণ কর, আর আমার সঙ্গে দুটো কথা কও।" শিবলিঙ্গ বাক্যালাপ করিলেন না, তজ্জন্য ভীলরাজ বড় কাতর হইয়া পড়িল। যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিল, কিন্তু জগদীশ্বর কোন কথাই বলিলেন না। অবশেষে ভীলরাজ নিরাশ-হৃদয়ে নিশাশেষে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। পরদিন গভীর রাত্রিতে ভীলরাজ পুনরায় মুখে জল, হস্তে শশকমাংস লইয়া যাত্রা করিল। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া জল ও মাংস মহাদেবের শিরোপরি রক্ষা করিল এবং যুক্তকরে অত্যন্ত মিনতিসহ কহিল, "দুটো কথা কও বন্ধু, তোমার কাছে আর কিছু চাই না—একবার কথা কও—একবার বন্ধু বলে ডাক।" ভীলরাজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সাধ্য সাধনা করিলেন, কিন্তু বন্ধুর নিকট হইতে কোন উত্তর পাইলেন না! অবশেষে নিরাশ-হৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন। নিরাশ হইলেও সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। পরদিন আবার আসিলেন। উপহারাদি পূর্ব্ববৎ অর্পণ করিয়া মহাদেবকে অতি কাতরস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পাষাণ শিব নীরব। অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। যখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়,তখন ভীলরাজ অধীর-হৃদয়ে কহিলেন,"এখনও কথা কইলে না বন্ধু? তবে আমার উপঢৌকনে তুমি কি সন্তুষ্ট হও নি? 'আর কি

দেব? যা' চাও, তাই দিতে প্রস্তুত। আমার শ্রেষ্ঠ ধন নেবে? তা' পেলে কি তুমি প্রসন্ন হবে? তবে এই লও—আমার চক্ষু লও।" বলিয়া তিনি পৃষ্ঠোপরি লম্বিত তূণ হইতে একটী শর লইয়া দক্ষিণ আঁখি উৎপাটন করিলেন, এবং রক্তময় চক্ষু শিবলিঙ্গের উপর রক্ষা করিলেন। কহিলেন, "ঈশ্বর, জগতের রাজা, এইবার কথা কও, আমি ত তোমাকে আমার শ্রেষ্ঠ ধন দিয়েছি, তবু কেন নীরব? ওঃ বুঝেছি, তুমি এ চক্ষুও চাও; বেশ দিতেছি—যা' চাইবে তাই দেব।"

ভীলরাজ দ্বিতীয় চক্ষু উৎপাটনে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন পাষাণ ফাটিয়া গেল এবং মহাদেব, মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভীলরাজের হস্ত ধারণ করিলেন; কহিলেন, "এই যে আমি এসেছি বন্ধু!" ভীলরাজ মহা-পুলকিতচিত্তে কহিলেন, "এতক্ষণ আসনি কেন বন্ধু?" শঙ্কর উত্তর করিলেন, "আমি অনেক দূরে ছিলাম, তোমার ডাক শুন্‌তে পাইনি। এখন বন্ধু, আমি তোমার কি করতে পারি? তোমার কি চাই?" ভীলরাজ উত্তর করিলেন, "কিছুই চাই না; তুমি যে আমাকে বন্ধু বলে ডাক্‌লে, এই আমার যথেষ্ট। যদি তুমি আমাকে কিছু দিতে চাও, তবে এই কর বন্ধু, আমি যখনি তোমাকে বন্ধু বলে ডাক্‌ব, তখনি তুমি বন্ধু বলে আমার কাছে ছুটে আসবে।" শঙ্করজী হাসিতে হাসিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করত নষ্ট চক্ষু প্রদান করিলেন।

সপ্তম তরঙ্গ

একদিন সাধুবাবা একটী মহিলাকে বুঝাইতেছিলেন, ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাদিগকে যাহা দান করেন, তাহার অসদ্ব্যবহার করিলে তিনি উহা কাড়িয়া ল'ন। দৃষ্টান্ত দিলেন, কোন এক রাজা এক ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে একখানি চন্দনের বাগান দিয়াছিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি চন্দনের সদ্ব্যবহার না করিয়া বৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক তাহা জ্বালানি কাষ্ঠে পরিণত করিল; রাজা রুষ্ট হইয়া বাগান কাড়িয়া লইলেন। বাবার উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে, ভগবান্ আমাদের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, বিচারশক্তি এবং অন্যান্য যাহা কিছু দিয়াছেন, আমরা তাহার সদ্ব্যবহার না করিয়া অসঙ্গত ব্যবহার করিলে তিনি ঐ সমুদয় কাড়িয়া লইয়া থাকেন।

ভয়ঙ্কর শীতের দিনে দেখিয়াছি বাবা খোলা জায়গায় সূতির পাৎলা আলফি গায়ে দিয়া বসিয়া আছেন। আবার খুব গরমের দিনেও দেখিয়াছি প্রখর সূর্য্যতাপও মাথায় ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। একদিন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাবা, আপনার কি শীত গ্রীষ্ম সমান লাগে?" বাবা হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন, "সাধুদের সবই অভ্যাস আছে মায়ি!"

বাবাকে আমরা নানা প্রশ্ন করিতাম, কিন্তু কখনও তিনি বিরক্ত হইতেন না। একদিন বাবার বাল্য-কাহিনী জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি নিজের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন না। শুধু এইটুকু মাত্র বলিয়াছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। তৎপরে অমৃতসরের সন্নিকটে, স্বর্গগত মহাত্মা অনুভবদেব অবধূতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ

করিয়াছিলেন। তার পর দ্বাদশ বর্ষ তিনি কেবলমাত্র কৌপীন সম্বল করিয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষা উপেক্ষা করত দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। কোন লোকালয়ে শীতের রাত্রি বা গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করিবার নিয়ম ছিল না। আরও অনেক কঠোরতার মধ্যে তাঁহাকে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহা তিনি ইঙ্গিতে বলিলেন।

অনেক পীড়াপীড়ি করাতেও তিনি নীরব রহিলেন। অন্য সাধুর গল্প বলিয়া আমাদের ভুলাইলেন, কিন্তু নিজের কথা কিছু বলিলেন না। এইরূপ বহু বর্ষ সাধনের পরে তিনি সর্ব্বংসহ অবধূত অবস্থা লাভ করেন।

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা বাবা, আপনি যে এত পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়াছেন, কখন ব্যাঘ্র কি সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই?" বাবা উত্তর করিলেন, "দুইবার উন্মুক্ত স্থানে, আর একবার এক পাহাড়ের উপরে এক ঘরের ভিতর বসিয়া ব্যাঘ্রের দর্শন মিলিয়াছিল। আমি যে ঘরে ছিলাম, সে ঘরের জানালায় লোহার শিক ছিল। প্রত্যুষে দেখিলাম, ব্যাঘ্র জানালার অপর দিকে বসিয়া আমাকে লক্ষ্য করিতেছে। স্থানটি জন-মানব-শূন্য। তাহাকে কহিলাম, 'তোমাতে আমাতে ত কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য যা' রূপের, আকৃতির। তুমি যে, আমিও সে।' ব্যাঘ্র কি বুঝিল জানি না, ক্ষণপরে সে প্রস্থান করিল। তারপর দুই মাস সে কুটীরে বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু ব্যাঘ্রের দর্শন আর মিলে নাই।"

উন্মুক্ত স্থানে ব্যাঘ্র দর্শন কিরূপে ঘটিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করায়, বাবা বলিলেন, "আমরা কয়েকমূর্ত্তি সাধু সন্ধ্যার একটু আগে জঙ্গলের মধ্য দিয়া এক সঙ্কীর্ণ পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছিলাম। সহসা দেখিলাম সম্মুখে পথের উপর এক বৃহৎকায় ব্যাঘ্র। ফিরিবার উপায় নাই ব্যাঘ্রকে অতিক্রম করিয়া যে অগ্রসর হইব, সে পথও নাই। তখন

আমাদিগের মধ্যে এক বৃদ্ধ সাধু অগ্রসর হইয়া সেরকে কহিলেন, 'বাবা, তুমি যদি ক্ষুধার্ত্ত হয়ে থাক, তবে আমাকে গ্রহণ কর—এ বৃদ্ধ শরীর—'

"শার্দ্দূল মহারাজ আর কোনরূপ ভয় না দেখাইয়া জঙ্গলের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন এবং সত্বর অদৃশ্য হইলেন।

"আর একবার কামাখ্যা তীর্থের সন্নিকটে কোন নদীতীরে বৃক্ষনিম্নে আমরা কয়েকজন সাধু রাত্রিযাপন করিতেছিলাম। আমরা তিন মূর্ত্তি ছিলাম বলিয়া স্মরণ হইতেছে। এক মূর্ত্তি শয়ান ছিলেন। দ্বিতীয় মূর্ত্তি শয়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক বিপুলদেহ শার্দ্দূল আমাদের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। এক মূর্ত্তি কহিলেন, 'সিং আয়া।' শায়িত ব্যক্তি কহিলেন, 'আনে দেও মহারাজ, বাৎ চিৎকা আভি ফুরসদ্ নেহি।' বলিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ব্যাঘ্র প্রস্থান করিল।"

শার্দ্দূল মহারাজকে কেহ উপযুক্ত সম্মান না করায় হয়ত সে প্রস্থান করিল; অথবা যাঁহাদের হৃদয়ে হিংসা দ্বেষ নাই, তাঁহাদের হিংসা করিতে সে ইচ্ছা করিল না।

সর্প সম্বন্ধে বাবাকে অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম, কৈলাসে বহু বিষধর সর্পের বাস। বাবার আশ্রম যখন নির্ম্মিত হইতেছিল, তখন মাঝে মাঝে পাথরের আশে পাশে সাপ দেখা যাইত। যাহারা কাজ করিত, তাহারা ভয়ে সরিয়া যাইত, বাবা নিকটে আসিয়া তুড়ি দিলে সাপ অদৃশ্য হইত। একবার বাবার জনৈক শিষ্য এক সাপের কথা বাবার কোন ভক্তের নিকট বলিয়াছিলেন। ঐ শিষ্য তখন পাহাড়ের উপরে এক ক্ষুদ্র কুটীরেই বাস করিতেন। তিনি রাত্রি ৩টার সময় প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিতে পাহাড় হইতে প্রায় এক মাইল দূরে 'কুতুনিয়া' নদী অভিমুখে চলিয়াছেন। কৈলাস পাহাড়ের অর্দ্ধপথ

যখন অতিক্রম করিয়াছেন, তখন তিনি শুনিলেন, পাহাড়ের উপর হইতে বাবা বলিতেছেন, "ব্রহ্মচারি, হুঁসিয়ার।"

ব্রহ্মচারী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, পথের উপর এক বৃহৎ সর্প। মারিতে দণ্ড উঠাইলেন ; পুনরায় বাবার কঠোর আদেশ হইল, "নেহি মারো।" ব্রহ্মচারী ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেন, সর্প সত্বর অদৃশ্য হইল।

কথা এই, অন্ধকার রাত্রিতে দুর হইতে বাবা কিরূপে এই সর্পকে দেখিতে পাইলেন ? পাহাড়ের গায়ে পাথরের মধ্য দিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথ ; সেই পথের মধ্যে কোথায় সর্প,তাহা অতদূর হইতে দিবালোকেও দেখা যায় কি না সন্দেহস্থল ; কিন্তু বাবা কিরূপে জানিলেন ? এই ভক্তটি বাবাকে একদিন সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; বাবা শুনিয়া শুধু হাসিয়াছিলেন, পীড়াপীড়ি করাতে বলিয়াছিলেন, "হাম্ কেয়া জানে ?"

বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাবা, এই সব বাঘ সাপের মধ্যে বাস কর্‌তে আপনাদের ভয় হয় না ?" বাবা উত্তর করিয়াছিলেন, "বাঘ, সাপ ও সাধু ইহারা ত বনেই বাস ক'রে থাকে—ইহাতে ভয় কি মা ?"

বাবার ক্ষুদ্র গৃহে সামান্য আস্‌বাব। একখানি চৌকীর উপর মাত্র কম্বল বিস্তৃত। আর তাঁহার নিকটে ছিল একটা পাথরের লোটা, একটী বেতের ক্ষুদ্র পেটিকা (ঔষধের শিশি কয়েকটি তন্মধ্যে ছিল), আর একটী পুস্তকের দপ্তর। আর একটা জিনিষ ছিল, সেটা পাঁচ ফুট লম্বা এক লাঠি। বাবা সন্ন্যাসী ভিতরে ও বাহিরে ; আমরা গৃহী অন্তরে ও বাহিরে। আমরা চাই আমাদের প্রিয়জনকে মনোমত করিয়া সাজাইতে। ছেলে মেয়েকে সাজাই, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকেও ফুল দিয়া গহনা দিয়া সাজাই। আমরা যে জিনিষটী খাইতে ভালবাসি তাহা

তাঁহার সেবার্থে অর্পণ করি, যে বিছানায় আমরা শুইতে ভালবাসি, সেই বিছানার ব্যবস্থা তাঁহার জন্য করিতে চেষ্টা করি। যাঁহারা বড় বড় তীর্থে বিগ্রহের সেবা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ কথার সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন। অচল প্রস্তরগঠিত বা দারুময় মূর্ত্তি অপেক্ষা সাধারণতঃ আমরা ভালবাসি সচল দেবতাকে। যাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, তিনিই আমাদের দেবতা। সাধুবাবা তাঁহার ভক্তদের বিবেচনায় সচল বিগ্রহ, দেবতা। আমরা যেমন আমাদের বাস-গৃহ সাজাইতে ভালবাসি, তাঁহার গৃহও তেমনই সাজাইতে বাসনা করি। যাঁহার যেমন শ্রদ্ধা ও অভিরুচি তিনি তেমনি তাঁহার দেবতার গৃহ, দেহ সাজাইতে উদ্যত হইয়াছেন। ভক্তাধীন দেবতাকে ভক্তের এ উপদ্রব সহ্য করিতে হইয়াছে। সাধারণ লোকেরা মনে করিবে সন্ন্যাসীর আবার ইমারত কেন, বিলাস আসবাব কেন? কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান্, তিনি বুঝিবেন, যে দেবতার হৃদয়ে ত্যাগ, অন্তরে বিশ্বপ্রেম, তাঁহার নিকট সুসজ্জিত অট্টালিকাও যা', আবার আশ্রয়শূন্য শ্মশানও তাই। তিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ব বস্তুতে আসক্তিশূন্য।

একদিন বাবা বুঝাইতেছিলেন, যদি কোন ব্যক্তি সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়া উত্তাল তরঙ্গমালা-দর্শনে ভয়প্রযুক্ত চিন্তা করে সমুদ্র তরঙ্গ-শূন্য হইলে সে স্নান করিবে এবং তন্নিমিত্ত সে কূলে বসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সমুদ্র-স্নান যেমন সুদূর-পরাহত হয়, তেমনি যে ব্যক্তি মনে করে সংসারের কোলাহল নিবৃত্ত হইলে সে ভজন-সাধন করিবে, সে ব্যক্তির ভজন-সাধন কোন সময়েই করা হইয়া উঠে না। ইহা উত্তমরূপে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বাবা একটী গল্প বলিলেন।

কোন এক গৃহস্বামীর প্রতি এক মহাত্মা প্রসন্ন ছিলেন। একদা

তিনি গৃহীর গৃহে সমুপস্থিত হইলে গৃহী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আদর যত্ন করিলেন; পরে গৃহস্বামী কহিলেন, "আপনার কৃপায় আমার তিনটী পুত্রসন্তান হইয়াছে, আশীর্ব্বাদ করুন ইহারা যেন দীর্ঘজীবী হয়।" সাধু উত্তর করিলেন, "বাবা, দীর্ঘ জীবনই ত একমাত্র কাম্য নয়, যদি ভগবদ্দর্শন না ঘটিল, তবে সে জীবন লইয়া কি হইবে? আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি ভজন-সাধন কর।" গৃহী কহিলেন, "এখনও আমার সাধন-ভজনের সময় হয় নি—আগে পৌত্রমুখ দর্শন করি।" সাধু প্রস্থান করিলেন। কিছুকাল পরে পুনরায় তিনি আসিয়া কহিলেন, "এইবার বানপ্রস্থ লইয়া সাধনপথে চল।" গৃহী কহিলেন, "এখন নয়, আগে কনিষ্ঠ পুত্রের পুত্রমুখ দর্শন করি।" সাধু ফিরিয়া গিয়া কিছুকাল পরে যখন আসিলেন, তখন গৃহীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। গৃহীর পুত্রেরা সাধুর যথেষ্ট সেবা যত্ন করিল। সাধু মনে বড় ব্যথা পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, গৃহস্বামী এখন কোন্ যোনি প্রাপ্ত হইল। ধ্যানে দেখিলেন, সে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়া ধনাগার রক্ষা করিতেছে। সাধু বর্ত্তমান মালিকদের কহিলেন, তোমাদের ধনাগারে বৃহৎ সর্প। মালিকরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে হনন করিলেন। সাধু পুনরায় ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন, গৃহী এক্ষণে কুক্কুর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং উচ্ছিষ্টাদি খাইয়া বেড়াইতেছে। সাধু একদিন নির্জ্জনে তাহাকে কহিলেন, "তুমি কেন এ নীচবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কষ্ট পাইতেছ? আমার নিকট উপদেশ গ্রহণ কর—পুনরায় মনুষ্য-জন্ম লাভ কর।" কুক্কুর কহিল, "এখনও আমার ভজন-সাধনের সময় হয় নি, আমি ধন-রত্ন পাহারা না দিলে চোরে অপহরণ করিবে—আপনি এখন যান ঠাকুর—পরে আসিবেন।"

সাধু মহাবিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন—আর আসিলেন না।

আমাদের দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় আসিল। যশিডি ছাড়িয়া যাইতেছি, ইহা বাবার চরণে নিবেদন করিলাম; কহিলাম, "কত আনন্দে এখানে ছিলাম, কত সৎকথা আপনার নিকট শুনিতাম—"

বাবা কহিলেন, "আনন্দ ত মায়ি, নিজের অন্তরেই আছে। কেহ গান শুনিয়া আনন্দ পায়, কেহ সন্তান ক্রোড়ে লইয়া আনন্দ পায়, কেহবা খেলাধূলা করিয়া আনন্দ পায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়া আছে; আনন্দ অন্তরেরই জিনিষ।"

অপরাহ্নে বাবার চরণে বিদায় লইতে আসিয়া শুনিলাম, সেদিন সকালে বেলা ৮টার সময় স্বর্গগত মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের বাড়ীর নিকট একটী ব্যাঘ্র আসিয়া কিছু অত্যাচার করিয়াছিল। একটী পশুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিপুল আয়োজন হইয়াছিল,—বহুলোক অস্ত্রাদিসহ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। বাবা পাহাড়ের মাথায় মুক্তস্থানে দাঁড়াইয়া এই যুদ্ধ দেখিতেছিলেন; মানুষ পারিল না,—পশুশক্তির নিকট পরাস্ত হইল। ব্যাঘ্র কৈলাসের পাদমূল ধরিয়া দিগ্‌রিয়া পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া পলাইল; পথে একটা মেষশাবক ছিল, তাহাকে মুখে করিয়া লইয়া স্বল্পকাল মধ্যে অদৃশ্য হইল। অন্য একদিন আর একটী বাঘ দিবাভাগে জনৈক পথিককে আক্রমণ করে; অন্যান্য লোক তাহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া বাঘকে মারিয়া ফেলে এবং অর্দ্ধমৃত ব্যক্তিকে রক্ষা করে। বাবার চারিদিকে বাঘ ও সাপ, আর বাবা সেই জনশূন্য স্থানে একা—নির্ভয়—নিরুদ্বেগচিত্তে একা।

বাবার চরণে আমরা কেহ কেহ বিদায় লইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আমার স্বামী আসিতে পারেন নাই; তাঁহাকে কুকুরে দংশন করিয়াছিল এবং ক্ষত স্থান নাইট্রিক এসিড দ্বারা পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বাবা শুনিয়া বলিলেন, দষ্ট স্থানে যদি তৎক্ষণাৎ সুর্‌মা লাগাইয়া দেওয়া হইত,

তাহা হইলে বিষ নষ্ট হইত। আমার শ্রীশ্রীগুরুদেব বলিয়াছিলেন, ক্ষত স্থানে লঙ্কা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়।

সে যাই হউক, আমরা যখন বাবার চরণে নিবেদন করিলাম, আমার স্বামী আসিয়া বাবার পদধূলি লইতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি মহা-দুঃখিত, তখন তিনি বলিলেন, "আমি যাব মায়ি!"

আমরা বিস্মিত হইলাম! বাবা যে কখন গৃহীর বাড়ীতে পদার্পণ করেন না। কিন্তু তাঁহার এ নিয়ম পরে রক্ষিত হয় নাই। বাবা ভক্তাধীন, যে কাতরে ডাকিয়াছে, তাহারই গৃহে বাবাকে যাইতে হইয়াছে। একবার এক বৃদ্ধা অনাথা তাহার শেষ সময়ে বাবাকে দেখিবার বাসনা করিয়াছিল। বাবা সকল কাজ ফেলিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার দেহ লইয়া গিয়া শ্মশানে দাহ করা হইল, বাবা তখনও তাহার চিতা-পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সব শেষ হইলে তবে বাবা কৈলাসে ফিরিলেন।

পরদিবস প্রভাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাবা আমাদের 'লালকুঠীতে' পদার্পণ করিলেন। আমরা ধূপ-ধূনা,পুষ্পাদি,উপযুক্ত আসন লইয়া পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলাম। সে দিবস বাবা যে কাহিনীটী বলিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ :—

এক যোগিরাজ ছিলেন, তাঁহার চিন্তামণি রত্ন ছিল। সেই রত্নটীর অসাধারণ শক্তি। এই চিন্তামণি বা পরশমণি রত্নের সাহায্যে যাহা ইচ্ছা করা যায় তাহাই লাভ হয়। একদা যোগিরাজ মনে করিলেন, আমার ত নিজের কিছুরই প্রয়োজন নাই, তবে এই চিন্তামণি রত্নের সাহায্যে কোন একটী কার্য্য করা যাউক।

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি চিন্তামণির সাহায্যে একটী মনোরম পবিত্র দেশ রচিত করিলেন। তন্মধ্যে নির্ম্মলসলিলা নদী প্রবাহিত হইল। ঐ প্রদেশে তিনি বহু ঘর পবিত্রাত্মা প্রজা সৃষ্টি করিলেন।

তাহাদের যাহাতে কোনরূপ অভাব না থাকে, তাহারা ইচ্ছানুরূপ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারে, সেইজন্য তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একটী করিয়া চিন্তামণি রত্ন দান করিলেন। ঐসকল ব্যক্তি উক্ত চিন্তামণি রত্নের সাহায্যে তাহাদের ইচ্ছানুরূপ দ্রব্য সংগ্রহ করত সকল অভাব পূর্ণ করিতে পারিত। ফলে তাহারা পরমসুখে দিন যাপন করিতে লাগিল। তাহাদের কোন অভাবই রহিল না। তদ্দর্শনে যোগিরাজ হৃষ্টান্তঃকরণে তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইলেন।

বহুদিন ভ্রমণের পর ঐ যোগিরাজের ইচ্ছা হইল, তাঁহার স্বষ্ট স্থানটীর পূর্ব্বাবস্থা আছে কিনা এবং এখন উহা কিরূপভাবে চলিতেছে গিয়া একবার দেখিয়া আসি। যোগিরাজ তাঁহার নির্ম্মিত আনন্দ-নিকেতনে আসিয়া দেখেন যে তাঁহার সেই দেশ পঞ্চশঠের অধিকারাধীন হইয়া পড়িয়াছে। সেই নিমিত্ত তাঁর স্বষ্ট সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলি একেবারে শোভা-সৌন্দর্য্যবিহীন হইয়া গিয়াছে। সেই স্থানের অধিবাসিগণ নানারূপ অভাবে ও ক্ষুধার তাড়নায় অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সকলেই শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। উহার কারণ অনুসন্ধানে যোগিরাজ জানিলেন যে, তাঁহার স্বষ্ট এই মনোরম পুরীতে অন্যস্থান হইতে পঞ্চজন দুষ্ট ব্যক্তি শিকার খেলিতে আসিয়াছিল। ঐ স্থানের অধিবাসিগণের অটুট স্বাস্থ্য, সবল ও সুন্দর আকৃতি এবং সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ অবস্থা-দর্শনে শঠেরা অনুমান করিয়াছিল নিশ্চয়ই ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে। অনুসন্ধানে তাহারা জানিতে পারিল যে, এক চিন্তামণি রত্নই ইহাদের সকল অভাব মোচন করিতেছে ও তাহাদের যাবতীয় সম্পদ্ ও আনন্দের মূলই ঐ চিন্তামণি রত্ন।

তখন পঞ্চশঠ উহাদের সুখে ঈর্ষ্যান্বিত হইল। তাহারা কিছুদিন ঐ প্রদেশে বাস করিয়া তথাকার অধিবাসিগণের সহিত ক্রমে আলাপ

পরিচয় ও বন্ধুত্ব করিয়া লইল। অবশেষে তাহাদের নিকট প্রশ্নাদি দ্বারা জানিয়া লইল, যে রত্ন তাহাদের সকল সমৃদ্ধির মূল, সেই রত্নটীর আকার ও গঠন কিরূপ। তৎপর ঐরূপ গঠনের এক একটী নকল চিন্তামণি প্রস্তুত করিয়া রাত্রিকালে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে গৃহে রাখিয়া গেল। গৃহবাসিগণ প্রভাতে নূতন চিন্তামণি পাইয়া তাহার উজ্জ্বল চাকচিক্য-দর্শনে পুলকিত হইল। পুরাতন রত্নটী অযত্নে পড়িয়া রহিল এবং ক্রমে উহার উপর মাটি চাপা পড়িতে লাগিল। এইরূপে তাহারা পুরাতন রত্নটীর অস্তিত্ব ক্রমে বিস্মৃত হইল। কিন্তু তাহারা ক্রমে বুঝিল, এই নকল চিন্তামণির নিকট যাহা চাওয়া যায় তাহা পাওয়া যায় না। তাহারা তখন অভাবে পড়িয়া ঐ পঞ্চশঠের অধীনে ক্ষেত খামারাদি লইয়া চাষবাস দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। পূর্ব্বের ন্যায় প্রয়োজনীয় ও প্রার্থিত দ্রব্যাদি না পাওয়ায় ঐ দেশের অধিবাসিগণের দিন দিন বড় দুরবস্থা ঘটিতে লাগিল। যোগিরাজ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উহাদের দুঃখ ও দুরবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ও তাহা দূরীকৃত করিয়া পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি প্রথমে গ্রামবাসীদিগকে সজাগ করিবার নিমিত্ত চারিখানি পত্র লিখিয়া উহাদের নিকট পাঠাইলেন। তাহাতেও যখন কোন ফল হইল না, তখন পুনরায় ছয়খানি পত্রে ও পরে অষ্টাদশখানি পত্রে চিন্তামণি রত্নের অনুসন্ধানের উপায় লিখিয়া জানাইলেন। কিন্তু সেই দেশবাসিগণ পঞ্চশঠের বশীভূত হওয়াতে তাহারা এত পরিশ্রম-কাতর ও ভোগ-বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা আর উপযুক্ত পরিশ্রম করিয়া সেই মাটিচাপা পুরাতন চিন্তামণি রত্ন খুঁজিয়া বাহির করিতে তাদৃশ চেষ্টা করিল না। তখন যোগিরাজ স্বয়ং তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া উহাদের প্রত্যেককে বলিতে লাগিলেন

যে, একমাত্র চিন্তামণির অভাবেই তোমরা এইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছ। প্রকৃত চিন্তামণির উদ্ধার সাধন করিতে পারিলেই তোমাদের দুর্দ্দশা ও সকল অভাবই মোচন হইবে। যে চিন্তামণির অভাবে তোমাদের এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা তোমাদের গৃহকোণে তোমাদেরই অবহেলায় মৃত্তিকার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। পরিশ্রমপূর্ব্বক মাটি খুঁড়িয়া চেষ্টা করিলেই উহা বহির্গত হইবে। কিন্তু এ সংবাদ শুনিবার পরও তমোভাবাচ্ছন্ন ঐ দেশবাসীর চৈতন্য হইল না। উহারা আলস্য ত্যাগ করিয়া পরিশ্রম সহকারে আবরণ অপসৃত করত চিন্তামণি রত্নের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিল না।

এই কাহিনীটী বলিয়া সাধুবাবা বলিলেন—এই যোগিরাজ হইলেন, স্বয়ং ঈশ্বর। তাঁহার ইচ্ছা হওয়ায় এই শোভা-সৌন্দর্য্যময় বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টি হইল ও তাহাতে তিনি বহু পবিত্র-চরিত্র নির্ম্মল-চিত্ত মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাদের অন্তঃকরণে স্বয়ং চিন্তামণিরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ও অহঙ্কাররূপী পঞ্চশঠ আসিয়া এই পৃথিবী-রাজ্য অধিকার করিল। ঐ পঞ্চশঠ নকল চিন্তামণি-রূপ বিষয়ানন্দ দিয়া সকল মনুষ্যকে প্রতারিত করিল। তাহারা বিষয়ানন্দের মোহে এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, তাহারা অন্তরের আত্মারূপ চিন্তামণিকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল এবং তাহারা বিষয়-ভোগে রজস্তমোগুণের মোহে ক্রমে ক্রমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তাহারা যত্নপূর্ব্বক সাধন করিয়া আর অন্তরের চিন্তামণির অনুসন্ধান করিল না। তখন শ্রীভগবান্ জীবের হিতার্থে চারি বেদ লিখনস্বরূপ পাঠাইলেন—এবং তাহাতেও তাদৃশ ফল না হওয়ায় জীবকে উদ্ধারের জন্য ষড়্দর্শন ও অষ্টাদশ পুরাণ পাঠাইলেন। এই বেদ-পুরাণাদিতে কিরূপে সাধনার দ্বারা চিন্তামণিরূপ অন্তরের

ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহা নানাভাবে বিশেষরূপে প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মনুষ্যকুল পঞ্চশঠরূপ রিপুর অধীন থাকিয়া বিষয়ানন্দের মোহে মুগ্ধ এবং রজস্তমোভাবে আচ্ছন্ন থাকায় পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হইল। তাহাতেই তাহারা সকল সম্পদ্ ক্রমে ক্রমে হারাইয়া ফেলিল। নিয়মিত সাধন-পরায়ণ হইয়া চিত্তকে নিত্য সত্ত্বস্থ করত যখন কেহ চিন্তামণি-লাভের জন্য যত্নশীল হইল না, তখন তিনি স্বয়ং জীবের উদ্ধারার্থে অবতাররূপে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার সুদুর্লভ সঙ্গ লাভ করিয়া কোন কোন লোক সাধন-পরায়ণ হইয়া অন্তরের চিন্তামণিরূপ ব্রহ্ম-লাভে সমর্থ হইল। আবার অধিকাংশ মনুষ্যেরা তাদৃশ চেষ্টা করিল না। পরিশ্রম করিয়া, উপযুক্তরূপ সাধনা করিয়া এই চিন্তামণি রত্ন-লাভে সমর্থ হইলেই মনুষ্য, দেবতুল্য মহাশক্তিশালী হইতে পারে।

ভগবান্ কোন সময়ে দেহ ধারণ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হ'ন তাহাই উপাখ্যানে বুঝান হইয়াছে। মানব প্রথমে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ছিল ; কিন্তু ক্রমে যখন কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহঙ্কার প্রভৃতি পঞ্চ রিপুতে তাহাদের চিত্ত অধিকার করিতে আরম্ভ করিল, তখন ভগবান্ জীবের কল্যাণার্থে চারি বেদ, ষড়্দর্শন, অষ্টাদশ পুরাণ, ধরাধামে একে একে প্রচার করিলেন। তাহাতেও যখন ফলোদয় হইল না, তখন তিনি নিজে মনুষ্যদেহ ধারণপূর্ব্বক জীবকে পঞ্চরিপুর তাড়না হইতে রক্ষা করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন।

যখন আমরা বাবার নিকট বসিয়া তাঁহার কথামৃত শুনিতেছি, তখন এক ধীবর একটা বৃহৎ মৎস্য লইয়া বাগানের মধ্যে উপস্থিত। আমরা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম ; বাবা তাহা বুঝিলেন। বলিলেন, "সঙ্কোচের কারণ নেই।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "মৎস্য মাংস খাওয়া কি দোষের ?" বাবা উত্তর করিলেন, "খাওয়া দাওয়া নিজের প্রবৃত্তি

অনুসারে ; শ্রীভগবান্ প্রকৃতিভেদে তিন প্রকার আহারের উল্লেখ করিয়াছেন—(গীতা ১৭।৭, ৮, ৯, ১০)” মহাত্মা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, “নাম করিতে করিতে এমন অবস্থা আসে যে, তখন আমিষ আহারে আর প্রবৃত্তিই হয় না।”

কোন এক মহিলা বাবাকে বলিলেন, “বাবা, আমি দৈহিক কষ্ট একটুও সহ্য করিতে পারি না ; সামান্য রৌদ্রের উত্তাপও সহ্য হয় না—ছাতা ব্যবহার করিতে হয়। এজন্য আমাকে কেহ কেহ বলেন, ‘তোমার তিতিক্ষা বা সহনশীলতা কখন যে হইবে এরূপ মনে হয় না।’ সত্যই কি আমার তিতিক্ষা কখন হইবে না বাবা ?”

বাবা মৃদুহাস্য-সহকারে কহিলেন, “কেন তিতিক্ষা হ’বে না মায়ি ? যা’র যে জিনিষ আছে, সে তা ইচ্ছা কর্‌লে ব্যবহার কর্‌তে পারে, তবে যা’ নেই তার অভাবে কাতর হওয়া ঠিক নয়। এই অভাব-বোধ না থাক্‌লেই তিতিক্ষা সময়ে আস্‌বে। সর্ব্বাবস্থায় সন্তোষ প্রয়োজন।”

তখন বাবার মাত্র একখানি কম্বল সম্বল ছিল; কিন্তু কোন এক ভক্ত তাঁহাকে একখানি মোটা মূল্যবান্ কম্বল দেওয়ায় তিনি তাহা মাঝে মাঝে ব্যবহার করিতেন—যাহা আছে তাহা ব্যবহার করিতে তাঁহার কোন সঙ্কোচ নাই, ইহাই তিনি বলিলেন।

পূর্ব্ব বৎসর যশিডি ত্যাগ করিয়া আমরা যখন দেশে ফিরিয়া যাই, তখন আমরা পথের মাঝে অনেক বিপদে পড়ি ; এই কথা বলায়, বাবা আশীর্ব্বাদ করিলেন ; বলিলেন, “তোমরা এবার নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাও।” আমরা তাঁহার কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে দেশে ফিরিয়া গেলাম।

দেশে ফিরিলাম বটে, কিন্তু বাবার কথা ভুলিতে পারিলাম না—তাঁহার মধুময় উপদেশ নিয়ত স্মরণ হইত। ফিরিয়াই আবার দিন গণিতে লাগিলাম, পর বৎসর কবে আবার যশিডি যাইব।

কৈলাসপতি

দ্বিতীয় খণ্ড

১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

যশিডি—কৈলাস

কৈলাসপতি

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম তরঙ্গ

১৩৩৩ সালে শারদীয়া মহাপূজার পর আমরা যশিডি অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ৩রা কার্ত্তিক যশিডি পৌছিলাম; ৪ঠা তারিখে দেওঘর করণিবাগে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের আশ্রমে গিয়াছিলাম। ৫ই তারিখ প্রাতে কৈলাসে গেলাম। পাহাড়ে উঠিয়া দেখি, বাবা একাকী বারান্দায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সেই ভাব, মুখে সেই হাসি। আমাদের দেখিয়া বাবা 'হরিহর' বলিয়া উঠিলেন। আমরা তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাদিগকে বসিতে বলিলেন।

বাবাকে দেখিবার পর তাঁহার গৃহ দেখিলাম। দেখিলাম, ঘরখানির চারিধারে বারান্দার উপরে লাল খোলার নূতন আচ্ছাদন হইয়াছে। কৈলাস যেন আমাদের কত পরিচিত স্থান—প্রত্যেক পাথরখানি পর্য্যন্ত আমাদের সহিত সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের দেখিয়া তাহারা যেন আনন্দ প্রকাশ করিল। অদূরে সেই দেবগিরি, বহুদূরে পরেশনাথ পর্ব্বত; অন্য পার্শ্বে সুদূরে ত্রিকূট প্রভৃতি কয়েকটী পাহাড়। তার মধ্যে কৈলাসপতি সমভাবেই বিরাজ করিতেছেন। দিনের পর দিন যে তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার প্রশান্ত বদন দেখিয়া কিছুই বুঝা গেল না।

অন্যান্য অনেক কথার পর বাবা বলিলেন, "ভগবানের চরণে কামনা-শূন্য হইয়া প্রণাম করিবে। মানুষ সাধারণতঃ প্রারব্ধ বা পূর্ব্ব-কর্ম্মার্জ্জিত

ফল ভোগ করে। যাহা ঘটিবে, তাহা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে।” ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটী আখ্যায়িকা বলিলেন।—

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-দম্পতি কোন গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহারা ধার্ম্মিক কিন্তু অসুখী। তাঁহাদের প্রধান দুঃখ, তাঁহারা অপুত্রক। ব্রাহ্মণ স্থির করিলেন, পুত্র-কামনায় তিনি ব্রহ্মার আরাধনা করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একদিন গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন এবং কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুকাল পরে পদ্মযোনি প্রসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণকে দেখা দিলেন এবং কহিলেন, “আমি প্রসন্ন হইয়াছি—বর লও।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “আমি পুত্র চাই।”

প্রজাপতি,—“পুত্র দিতে পারিব না—অন্য বর প্রার্থনা কর।”

ব্রাহ্মণ,—“আমার অন্য প্রার্থনা নাই।”

চতুর্ম্মুখ তখন অদৃশ্য হইলেন। ব্রাহ্মণ ছাড়িলেন না,—তিনি বিষ্ণুর উদ্দেশে কঠোরতর তপস্যায় ব্রতী হইলেন। বিষ্ণু সদয় হইয়া দর্শন দিলেন এবং বর প্রার্থনা করিতে ব্রাহ্মণকে কহিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্র কামনা করিলেন। বিষ্ণু কহিলেন, “পুত্র দিতে পারিব না—অন্য বর প্রার্থনা কর।” সাধকের আর কিছু প্রার্থনা নাই বলায়, বিষ্ণু প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণ তখন মহেশের তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সদাশিব যথাকালে দর্শন দিয়া কহিলেন, ‘তোমার ভাগ্যে পুত্র নাই, তা’ আমি কি করিয়া পুত্র দিব?’ সাধক ছাড়িলেন না,—অনেক স্তব-স্তুতি করিলেন। আশুতোষ সদয় হইয়া কহিলেন, “তবে এই পর্য্যন্ত আমি করিতে পারি যে, তুমি একটী বিকলাঙ্গ পুত্র পাইবে—তাহার হস্তপদ কিছুই থাকিবে না।”

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "তাই দেও ঠাকুর!"

মহাদেব বর দান করিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। যথাকালে তাঁহার এক বিকলাঙ্গ পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। মাতাপিতা মহা আনন্দে এই হস্তপদহীন শিশুকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুত্র যত বড় হইতে লাগিল, তাঁহাদের উৎসাহ, আনন্দ ততই কমিয়া আসিতে লাগিল। বালক সম্পূর্ণ পরাধীন, মাতাপিতার সাহায্য ব্যতীত সে কিছুই করিতে পারে না। বালকের সেবা করিতেই মাতাপিতার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। পূর্ব্বে যে কার্য্যে তাঁহাদের আনন্দ ছিল, এক্ষণে সে কার্য্যে তাঁহাদের বিরক্তি আসিল। তার উপর আর এক চিন্তা,—তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অবর্ত্তমানে কে বালকের সেবা করিবে? বুদ্ধিমান্ বালক, মাতাপিতার বিরক্তির কারণ, চিন্তার কারণ বুঝিল। বুঝিয়া একদিন তাঁহাদিগকে কহিল, "কেন তোমরা আমার জন্য চিন্তা করিতেছ? আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহা ঘটিবে। আমার দিন এখন যেমন যাইতেছে, তোমাদের অবর্ত্তমানে তেমনি যাইবে—অদৃষ্টে থাকে তবে ভাল ভাবেই কাটিবে।"

বালকের এই কথা শুনিয়া মাতা অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং অকৃতজ্ঞ বলিয়া তাহাকে গালি দিলেন।

পিতা রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "দেখি, ভাগ্য তোমার কিরূপ সেবা করে।" তাহাকে পৃষ্ঠে তুলিয়া গ্রামান্তরে বনের ধারে নদী-কূলে রাখিয়া আসিলেন। ইহাতে বালক কিছুমাত্র ভীত হইল না; সে হৃষ্টান্তঃকরণে অবিরাম হরিনাম করিতে লাগিল। কয়েকটী রাখাল বালক নদী-কূলে গোচারণ করিতে আসিয়াছিল; তাহারা হরিনামে আকৃষ্ট হইয়া বিকলাঙ্গ বালকের নিকট আসিল। বালকের অবস্থা-

দর্শনে তাহাদের হৃদয় করুণায় ভরিয়া গেল। তাহারা তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া আনিয়া এক বৃক্ষতলে শোয়াইল। চারিদিক্ পরিষ্কার করিল, পত্রের শয্যা রচনা করিল, বৃক্ষশাখা-সাহায্যে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিল এবং নিজেদের আহার্য্য হইতে কিছু কিছু লইয়া বালককে খাওয়াইল। বালক কিন্তু একমনে হরিনাম করিয়া যাইতেছে। বালকেরা তাহার নাম রাখিল হরিবোলা। প্রত্যহ বালকেরা তাহাদের আহার্য্য হইতে কিছু কিছু লইয়া হরিবোলাকে দেয়; কেহ মলমূত্র পরিষ্কার করে, কেহ খাওয়ায়, কেহ আহার্য্য সংগ্রহ করে। বালকের কোন দিকে দৃক্পাত নাই, সে অবিরত হরিনাম করে। বালকেরাও তাহার দেখাদেখি হরি নাম ধরিল। হরিনামের এমনি শক্তি যে, নাম শুনিতে শুনিতে নামে একটা অনুরাগ উপজিত হয়। অতঃপর সকলে মিলিয়া হরিবোলার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া হরিনাম করিতে লাগিল।

একদা দেবর্ষি নারদ অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে শুনিলেন, এক স্থানে হরিনাম হইতেছে। তিনি আকৃষ্ট হইয়া তথায় আসিলেন। দেখিলেন, এক বিকলাঙ্গ বালককে বেষ্টন করিয়া বহু বালক নৃত্য-সহকারে হরিনাম করিতেছে। দেবর্ষি মুগ্ধ হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুকে সংবাদ দিলেন; কহিলেন, 'এরূপ অপূর্ব্ব বালক কখন তিনি দেখেন নাই,—এত দুরবস্থায় পড়িয়াও বালকের অবিচ্ছেদ সন্তোষ। প্রার্থনা নাই, কামনা নাই, সে অবিরত হরিনাম করিয়া যাইতেছে।' বিষ্ণুকে সংবাদ দিয়া নারদ ব্রহ্মলোক ও কৈলাসে ছুটিলেন। অল্পকাল মধ্যে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর নারদসহ হরিবোলার নিকট উপস্থিত। বিষ্ণু কহিলেন, "বালক, আমি জগৎকর্ত্তা বিষ্ণু, তুমি আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তোমাকে তাহাই দিব।"

হরিবোলা উত্তর করিল, "আমি কিছুই চাই না।"

ব্রহ্মা বর দিতে চাহিলে বালক কহিল, "আমার কোন প্রার্থনা নাই।"

মহেশ্বর যখন কহিলেন, "আমি তোমাকে ত্রিভুবন-রাজ্য বা ইন্দ্রত্ব দিব—বল তুমি কি চাও?"

বালক কহিল, "আমি কিছুই আপনাদের নিকট চাই না—আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহা আমি পাইব, এবং তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট।"

বালকের লোভ নাই, কামনা নাই—সদা সন্তোষ, তদ্দৃষ্টে তাঁহারা বড়ই প্রসন্ন হইলেন। বিষ্ণু তখন প্রীত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তুমি পূর্ণাঙ্গ হও।" পদ্মনাভ কহিলেন, "তুমি পরম রূপবান্ ও বহুগুণযুক্ত হও।" মহাদেব কহিলেন, "তুমি রাজ্যেশ্বর হও।"

বিকলাঙ্গ বালক তখন পূর্ণাঙ্গ ও পরম রূপবান্ হইয়া তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিল। তাঁহারা বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বালক তখন স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। কিন্তু ভাগ্য তাহাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য এত ত্বরা করিতে লাগিল যে, সেই দিবসেই ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহাকে এক মহারাজের সম্মুখে আসিতে হইল। রাজ্যেশ্বর মৃগয়ায় আসিয়া পথ ও সঙ্গী হারাইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন; এমন সময় সম্মুখে সেই বালক। তাহার নব যৌবন, তাহার দীপ্ত কান্তি, তাহার অর্দ্ধনগ্নাবস্থা দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন। এ নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে এ বালক কে? নিশ্চয় কোন দেববালক হইবে, মানুষের এত রূপ সম্ভব নয়। কৌতূহলী হইয়া রাজা তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। বালকের কথাবার্ত্তায় রাজা অত্যন্ত প্রীত হইয়া ইচ্ছা করিলেন, এই বালকের হস্তে তাঁহার একমাত্র দুহিতাকে সম্প্রদান করত

তিনি জীবন ধন্য করেন। রাজার পুত্র ছিল না, এই বালকই ভবিষ্যতে সিংহাসনের অধিকারী। রাজা কন্যা সম্প্রদান করিবার কিছুকাল পরে যুবক হরিবোলা সিংহাসনারোহণ করিল।

তার কয়েক বৎসর পরে দেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। রাজা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিলেন যে, যে কেহ তাঁহার অন্নসত্রে আসিবে সেই প্রচুর আহার্য্য পাইবে। কিন্তু একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন; সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রধান ফটক-পথে সকলকে অন্নসত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। শত শত, পরে হাজার হাজার ক্ষুধাতুর ব্যক্তি প্রধান দ্বারপথে আসিয়া দাঁড়াইত। রাজা সেই সময় নিকটে কোন এক স্থানে গুপ্ত-ভাবে বসিয়া অভ্যাগতদের লক্ষ্য করিতেন। সহসা একদিন দেখিলেন, তাঁহার দরিদ্র বৃদ্ধ মাতাপিতা একমুষ্টি অন্নের জন্য তোরণ-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রাজার উপদেশ অনুসারে এক কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ দম্পতিকে অন্যত্র লইয়া গেল; এবং মহা সমাদর-সহকারে তাঁহাদের সেবা যত্ন করিল। পরিশেষে রাজার কাছে লইয়া আসিল। রাজা, মাতাপিতার চরণে প্রণত হইলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। রাজা মৃদু হাস্যসহকারে কহিলেন, "আপনারা আমাকে আজ চিনিতে পারিতেছেন না, কিন্তু আমি বেশ চিনিতে পারিতেছি—আমি আপনাদের সেই বিকলাঙ্গ পুত্র।"

আনন্দে অভিভূত হইয়া জনকজননী অশ্রুধারায় পুত্রকে সিক্ত করিলেন।

এক মহিলা সাধুবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিনাম করিতে সকলের প্রবৃত্তি হয় না কেন?"

তদুত্তরে বাবা কহিয়াছিলেন, "পাখী যেরূপ আকাশে উড়িতে উড়িতে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, বৃক্ষ-শাখায় বিশ্রাম গ্রহণ করে,

মানবও সেইরূপ অবিরাম সংসারক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলে বিশ্রামের জন্য শান্তিময়ের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে—তাঁহার নাম করে—তাঁহাকে ডাকে, এ যুদ্ধের যাহাতে বিরাম ঘটে, সেই প্রার্থনা তাঁহার চরণে করিতে থাকে।”

মহিলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “জন্মরহিত কিরূপে হয় ?”

বাবা উত্তর দিয়াছিলেন,“জীব বাসনারহিত হইলেই জন্মরহিত হয়।”

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিতেন, “কৃপা বাতাস ত বইছে, তুই পাল তুলে দেনা।” তাঁহাকে ব্যাকুল আগ্রহে ডাকিয়া প্রার্থনা উপাসনা ধ্যানাদি অভ্যাস করিলে, তাঁহার কৃপায় চিত্ত বাসনা বর্জ্জিত হইয়া স্বচ্ছ বা নির্ম্মল হয়, ক্রমে ক্রমে আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তখন এই জীবন-মৃত্যুর প্রবাহ বন্ধ হয়।”

এবার কুটীরখানির চারিদিকে বারান্দা হইয়াছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উত্তর দিকের বারান্দায় একখানি চৌকীর উপর একখানি কম্বল ও কিছু গৈরিক বস্ত্রাদি ছিল; তদ্দৃষ্টে বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখানে এ সব কেন ?” বাবার উত্তরে জানিলাম, একজন সাধু কয়েক মাস হইতে বাবার নিকট বাস করিতেছেন, দুই জন সাধু এক ঘরে বাস করিতে পারেন না; বোধ হয় সাধন-ভজনের অসুবিধা হয়। তাই সাধুজীকে বারান্দায় থাকিতে হইয়াছে। সাধুটী নাকি অতি উচ্চ অবস্থাপন্ন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই দারুণ শীত, চারিদিকে ব্যাঘ্রভীতি, তিনি কিরূপে এই উন্মুক্ত স্থানে একাকী থাকেন ?” বাবা হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আমি সে কথা ত সাধুজীকে জিজ্ঞাসা করি নি।”

আমি—সাধুজীর নাম কি ?

বাবা—তা আমি জানি না।

আমি—কতদিন এখানে থাকৃবেন ?

বাবা—আমি ত জানি না—তিনিও বোধহয় জানেন না।

আমরা একটু আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। এতদিন সাধুটী বাবার অতিথি হইয়া আছেন, অথচ বাবা তাঁহার কোন পরিচয় জানেন না। সাধু হইলে কি কৌতূহলও থাকে না ? সব প্রবৃত্তি কি নিবিয়া যায় ?

পরে এই মহাত্মার দর্শন পাইয়াছিলাম এবং তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম শ্রীশ্রুতানন্দ স্বামী। ইনি বৃদ্ধ। বৃদ্ধ হইলেও বলহীন নহেন। কয়েকমাস কৈলাসে অবস্থান করিয়া যখন তিনি যশিডি সহরসমীপে এক বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখনও তিনি প্রত্যহ দুই একবার কৈলাসে আসিতেন; ক্লান্তি বা শ্রান্তি কখনও তাঁহার দেহে দেখি নাই, তিনি একদা কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার ও সাধু বাবার দেহ একই সময়ে জন্ম লয়। এই মহাত্মার বিষয় সবিশেষ পরে বলিব।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

কয়েকদিন পরে একদা অপরাহ্নে কৈলাসে গিয়া দেখি, বাবা একখানি বৃহৎ প্রস্তরের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার আদেশমত অদূরে বসিলাম। দিগ্রিয়া পাহাড়ের অন্তরালে সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে লুকাইতেছিলেন, ইহাই বাবা দেখিতেছিলেন। সুন্দর দৃশ্য! গর্ব্বোন্নত পর্ব্বতশীর্ষে সবুজ বৃক্ষরাজিমধ্যে রক্তবর্ণ সূর্য্যকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। রবি অস্ত গেলেন, শোভা ও সৌন্দর্য্যও অন্তর্হিত হইল। আত্মা দেহত্যাগ করিলে দেহটা বুঝি এইরূপই শোভাহীন হয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড় হইতে নয়ন ফিরাইয়া বাবার পানে চাহিলাম। বাবা কহিলেন, "প্রত্যেক কর্ম্ম যাহা আমরা করি, তাহা হইতে দুই প্রকার ফল উৎপন্ন হয় এবং এই কর্ম্ম হইতেই আমাদের অদৃষ্ট বা ভাগ্য

সৃষ্ট হয়। নীচ কর্ম্ম হইতে নীচ বাসনার সৃষ্টি ও উচ্চ কর্ম্ম হইতে তথা সাধুসঙ্গ হইতে উচ্চ বাসনার উৎপত্তি; এই বাসনা হইতেই প্রারব্ধ সূচিত হয় এবং কর্ম্মফলানুরূপ ভাগ্য পরজন্মে গঠিত হয়। প্রারব্ধ ভোগ ব্যতীত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। 'প্রারব্ধ-কর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ।' যেমন ধনুঃ হইতে শর নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাকে ফিরাইয়া আনা সম্ভব নয়, তেমনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রারব্ধ যে ভাবে ইহজন্মে সূচিত করিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন কোন মতেই সম্ভব নয়—"

প্রশ্ন—যাগ যজ্ঞ শান্তি স্বস্ত্যয়নেও কি ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হয় না?

উত্তর—প্রারব্ধ সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না। যে কুকুর হইয়া জন্মিয়াছে সে কুকুরই থাকিবে—ইহ জন্মে মানুষ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কোন কুকুর যেমন ধনীর অঙ্কে অঙ্কে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর কোন কুকুর খাইতে না পাইয়া দ্বারে দ্বারে প্রহৃত হইয়া কঙ্কালসার অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়—

প্রশ্ন—তবে লোকে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে কেন?

উত্তর—যাগ যজ্ঞের দ্বারা ক্রিয়মাণ পাপ নাশ হয়, যেমন কোন ব্যক্তি গুরু ভোজনানন্তর ব্যাধিগ্রস্ত হইলে চিকিৎসকের ঔষধ সাহায্যে ব্যাধিমুক্ত হয়, তেমনি নামের দ্বারা ক্রিয়মাণ পাপ নাশপ্রাপ্ত হয়—উত্তম বাসনার সৃষ্টি হয়। প্রারব্ধের ফল কিছু মৃদু হয়।

সাধুবাবা আরও বলিলেন, "বাসনাই বন্ধনের হেতু ও সকল দুঃখের মূল। বাসনা-নাশ হইলেই গতাগতিরও নাশ হয়—আর তাহাকে জন্ম লইতে হয় না।"

প্রশ্ন—কিরূপে অহঙ্কার-নাশ হয়?

উত্তর—জীবের অহঙ্কার দুইপ্রকার,—মলিন অহঙ্কার ও শুদ্ধ অহঙ্কার।

বিষয় বৈভব ক্ষমতা প্রভৃতি হইতে যে অহঙ্কার সঞ্জাত হয়, তাহা মলিন অহঙ্কার ; ইহাই জীবের বন্ধনের কারণ। আর আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, এই যে বিশ্বাস, ইহা শুদ্ধ অহঙ্কার। অথবা আমি তাঁহার দাস বা সন্তান বা ভক্ত, এই ভাবও শুদ্ধ অহঙ্কার। শুদ্ধ অহঙ্কার জীবের মোক্ষের কারণ।

প্রশ্ন—জীবের তৃষ্ণা যায় কিরূপে ?

উত্তর—বস্তুবিচার দ্বারা—বৈরাগ্যের দ্বারা। বাসনার নাশ অতি কঠিন ব্যাপার। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অর্জ্জুনকে গীতায় বলিয়াছেন, (৩।৩৯) বাসনাই জ্ঞানিগণের নিত্য শত্রু। এই দুর্নিবার কামনারূপ অগ্নিদ্বারা জীবগণের জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে। জীবের ভোগবাসনার অন্ত নাই। এই বাসনার নাশ না হইলে মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। এই বাসনা যে কিরূপে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে, তাহাও শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন। (২।৬২।৬৩) বিষয়ের চিন্তা ও সঙ্গ হইতে আসক্তি জন্মে। বিষয়ের সঙ্গ হইতে বিষয়াসক্তি কামনারূপে পরিণত হয়। আসক্তি হইতে কামনা ; কামনা পরিতৃপ্ত না হইলে ক্রোধ জন্মে ; ক্রোধের উৎপত্তি হইতে কার্য্যাকার্য্য-বিবেচনা রহিত হয় ; বিবেচনা-রাহিত্য হেতু স্মৃতি-বিভ্রম ; স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ ; পরিণামে তদ্দ্বারা বিনাশ ঘটে।

বিষয়াদিজনিত যে সুখাগম তাহা—শ্রীভগবান্ অমিতাভ বলিতেছেন—অতি তুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী—মরীচিকাতুল্য।—রিক্ত বদ্ধমুষ্টির ন্যায় সর্ব্বথা ফাঁকি।

ইহা বলিয়া সাধুবাবা এক গল্প বলিলেন। এক ব্যক্তির সুখের সংসার ছিল,—গৃহে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র প্রভৃতি ; অর্থেরও অভাব নাই। কিন্তু এই বিষয়ী বৃদ্ধের সংসারে অকস্মাৎ এক গোল বাধিল। পুত্র কহিল, আমি সংসারে আর থাকিব না, তপস্যায় যাইব। পিতা মাতা স্ত্রী বুঝাইল, কিন্তু যুবক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—সংসারের কোন প্রলোভন তাঁহাকে

ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তবে তিনি স্বীকৃত হইলেন, অনতিদূরে নদীকূলে এক কুটীর বাঁধিয়া তথায় তপস্যা করিবেন। যুবক যখন ঘোর তপস্যায় রত, তখন তাঁহার পুত্রের মৃত্যু ঘটিল; বৃদ্ধ ব্যস্ত হইয়া পুত্রকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। পুত্র আসিলেন না। কিছুকাল পরে যুবকের কন্যাও গতাসু হইল; সে সংবাদেও যুবক বিচলিত হইলেন না। পরে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিল। সে সংবাদ যুবকের নিকট প্রেরিত হইলেও তিনি গৃহে ফিরিলেন না—তপস্যারত রহিলেন। বৃদ্ধ তখন রুষ্ট হইয়া পুত্রকে তিরস্কার করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। এবং নদীকূলে আসিয়া দেখিলেন, পুত্র কুটীরাভ্যন্তরে মুদ্রিতনয়নে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। পুত্রকে এরূপ নির্ব্বিকারচিত্তে অবস্থান করিতে দেখিয়া তিনি মহাকুপিত হইলেন এবং তাঁহার অঙ্গে সজোরে পদাঘাত করিলেন। যুবকের ধ্যানভঙ্গ হইল; তিনি সখেদে কহিলেন, "কেন আমার এ আনন্দ নষ্ট করিলে বাবা! আমি বড় সুখে দেখিতেছিলাম, আমার স্ত্রীর ক্রোড়ে শত শত পুত্রকন্যা শোভা পাইতেছিল।"

বৃদ্ধ—উহা ভ্রম মাত্র, তোমার কল্পনা-প্রসূত। এদিকে তোমার গৃহে যে সত্য সত্যই তোমার পত্নী, পুত্র, কন্যা একে একে দেহত্যাগ করিল।

যুবক—উহা যে সত্য তাহা কিরূপে বুঝিব? যাহা সত্য তাহার ধ্বংস নাই। উহারা যদি সত্যই আমার হইত, তাহা হইলে চিরদিনই আমার থাকিত—আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইত না।

বৃদ্ধ স্থির করিলেন, পুত্রের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে।

কেহ মনে করেন,—

আছে ধন গৃহপূর্ণ যৌবন যাইবে তূর্ণ,
যদি না ভুঞ্জিনু সুখ কি কাজ জীবনে?

আবার কাহারও ধারণা,—

"আমি মরি, মরে পুত্র, না মরে মানব ;
নাহি হয় উন্নতির তিলার্দ্ধ লাঘব।
জল-বিম্ব যায় মাত্র মিশাইয়া জলে,
একে ভাঁটা অন্যদিকে জোয়ার উথলে।"

বাবার নিকট আমরা কত রকম যে উপদেশ পাইতাম তাহা লিখিতে গেলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া যায়।

যে, যে রকম উপদেশ চায়, সে সেই রকম উপদেশ পায়। একদা বাবাকে বহু ভক্ত ঘিরিয়া বসিয়া আছেন, কয়েকজন অদ্বৈতবাদী সাধুও উপবিষ্ট। এমন সময় দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের কথা উঠিল। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দ্বৈতবাদী। কোন্ পথটা শ্রেয়ঃ বাবাকে বোধ হয় কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবেন। বাবা স্পষ্ট উত্তর না দিয়া হনুমানজী এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই আমাদিগকে কহিলেন। একদা শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার বিরাট সভায় পাত্রমিত্রসহ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সভায় বহু জ্ঞানী ঋষি মুনিও ছিলেন। শ্রীরঘুনাথ মহাভক্ত হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা হনুমান, তুমি আমাকে কি ভাবে দেখ ?"

হনুমান সহসা উত্তর দিলেন না। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, আমি যদি উত্তর করি, 'হে রঘুনাথ, তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাস,' তাহা হইলে সভাস্থ সুধীগণ মনে করিবেন এতদিন শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করিয়াও ইহার জ্ঞানলাভ হইল না। আর যদি উত্তর করি, 'রামচন্দ্র তুমি আমি এক—পার্থক্য নাই,' তাহা হইলে সভাস্থ ব্যক্তিগণ কহিবেন 'ক্ষুদ্র ভক্ত হনুমানের স্পর্দ্ধা দেখ—সামান্য দাস হইয়া প্রভুর সহিত এক হইতে চায়।' এইরূপ চিন্তা করিয়া অবশেষে উত্তর করিলেন

দ্বৈতদৃষ্ট্যাঽস্মি তে দাসো জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ।
বস্তুতস্তু ত্বমেবাঽস্মি ইতি মে নিশ্চলা মতিঃ॥

অর্থাৎ যখন তোমাকে জীববুদ্ধিতে চিন্তা করি, তখন তুমি প্রভু, আমি দাস—তুমি ঈশ্বর, আমি তোমার অংশ বিশেষ। আর যখন পরমাত্মস্বরূপ দেখি, তখন মনে হয়, তোমাতে আমাতে কোন পার্থক্য নাই—তুমি যে, আমিও সে।

মহাবীরের উত্তর শুনিয়া সকলেই প্রীত হইলেন। আমরাও সকলে যে বাবার কথা শুনিয়া প্রীত হইলাম, তাহা বলা বাহুল্য।

তৃতীয় তরঙ্গ

এবার কৈলাস-আশ্রমে রন্ধনশালা দেখিলাম। এত অল্প ব্যয়ে দুইটী কুঠরীযুক্ত রন্ধনশালা কেহ কখন নির্ম্মাণ করিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। বড় বড় পাথর টানিয়া আনিয়া গৃহ-প্রাচীর হইয়াছে; গাছের ডালপালা, কিছু বাঁশ, কিছু খড়, রন্ধনশালার মূল উপাদান। দুইটী কুঠরীর মধ্যে একটা পাথরের দেয়াল। একটী কুঠরীতে রন্ধন হইত, অপরটীতে তাঁর এক সেবক থাকিত। তাঁহার শয্যার ব্যবস্থা চমৎকার; বাঁশের মাচার উপর কিছু খড় ও কম্বল। ঐ মাচার নীচে বাবার ভাণ্ডার, অর্থাৎ দুই তিনটী মৃৎপাত্রে কিছু আটা ও চাউল, নিমক ও লঙ্কা। ব্যস্! যেমন রন্ধনশালা, তেমনি ভাণ্ডার। কিন্তু ঘর যেমনই হউক, রন্ধন হইত অতি সুন্দর; বুঝি রাজার ঘরেও এমন হয় না। একদা আমরা প্রসাদ পাইলাম। রন্ধন হইয়াছিল খিচুড়ী। মশলা অতি সাধারণ, কিন্তু স্বাদ অপূর্ব্ব। প্রসাদ বলিয়াই বুঝি এত সুস্বাদু! তাহা না হইলে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে কেন এমনটা হয় না?

আর একদিন বাবার প্রসাদ পাইয়াছিলাম। সেদিন তরকারি

হইয়াছিল লাউ বা কদুর রাওতা। বাবা এক শাক ছাড়া দ্বিতীয় শাক* গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু কদুর ভিতরে এমন যে সুস্বাদ আছে তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। এ কদু আবার বাবার বাগানের। বাগানটী যে তখন কত বড় ছিল তাহা শুনিলে অনেকেই হাসিবেন।—দৈর্ঘ্যে আট হাত, প্রস্থে চারি হাত, তাহাতে আছে কয়েকটী বেগুন ও লঙ্কা গাছ, আর একপাশে আছে লাউ গাছটি ক্ষুদ্র চালাটিকে আশ্রয় করিয়া।

রাওতা খাইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনার এই সেবক এমন সুন্দরভাবে রাঁধিতে শিখিল, কিরূপে ?"

বাবা স্বীকার করিলেন যে, "তাঁহারই নিকটে তাহার শিক্ষা।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কিরূপে শিখিলেন ?"

উত্তর করিলেন, "গৃহত্যাগ করিয়া গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাঁহাদের প্রথমে রন্ধন, কিছু সূচিকার্য্য এবং কিছু লেখাপড়া শিখিতে হয়।"

বাবাকে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।—বাবা তাহা না বলিয়া আমাদিগকে একটা গল্প বলিয়া শুনাইলেন। গল্পটী এই :—

এক রাজা অমাত্য প্রভৃতি সহ এক অরণ্যে শিকার করিতে গিয়াছেন। অমাত্য-প্রধান দলচ্যুত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সহসা দেখিলেন, এক ব্যক্তি বৃক্ষারূঢ় হইয়া বৃক্ষশাখা ছেদন করিতেছে। অকস্মাৎ তাহার হস্তধৃত কুঠার ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। কিন্তু বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া মন্ত্রবলে অস্ত্রকে আকর্ষণ করিয়া লইল। সচিব তদ্দৃষ্টে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিলেন, এই মন্ত্র এই ব্যক্তির নিকট শিখিয়া লইতে হইবে। কারণ, এই মন্ত্র-দ্বারা ভবিষ্যতে অনেক সাহায্য হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া

* সাধুগণ সকল প্রকার ব্যঞ্জনকেই 'শাক' বলিয়া থাকেন।

মন্ত্রী বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তির সমীপস্থ হইলেন এবং তাহার নিকট মন্ত্র ভিক্ষা করিলেন। সে ব্যক্তি কহিল, "আমি ভাঙ্গি (মেথর), আর আপনি রাজার মন্ত্রী—আমি আপনার গুরু হইতে পারি না।"

অমাত্য নিরস্ত হইলেন না,—অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। অবশেষে ভাঙ্গি সম্মত হইয়া কহিল, "আপনি আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন ?"

"আছি।"

"আমি যখনই গুরুদক্ষিণা অথবা পরীক্ষা চাহিব, আপনি তখনই তাহা দিতে সম্মত আছেন ?"

"আছি।"

ভাঙ্গি মন্ত্র দান করিল। মন্ত্রী মন্ত্রের শক্তি তদ্দণ্ডে পরীক্ষা করিলেন। হস্তধৃত অস্ত্রাদি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ মন্ত্রবলে আকর্ষণ করিয়া হস্তে লইলেন। তখন তিনি গুরুকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

কয়েক মাস পরে রাজ্যে কোন উৎসব উপস্থিত। রাজধানীতে সকলেই আনন্দে উন্মত্ত। প্রাসাদ বাহিরে পথের ধারে এক সর্ব্বশোভা-ময় বৃহৎ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা পাত্রমিত্রসহ সেই মঞ্চে উপবিষ্ট থাকিয়া উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। এমন সময় পথের উপর হইতে এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কহিল, "কে আমার শিষ্য আছ, আমার মাথার উপর হইতে এই বিষ্ঠাপাত্র গ্রহণ করিয়া আমার শ্রম লাঘব কর।"

সকলেই সেই বিষ্ঠাবাহী ভাঙ্গির পানে চাহিল। মন্ত্রী তাহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার গুরু বলিয়া চিনিলেন। মন্ত্রী বুঝিলেন, তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ভাঙ্গি আসিয়াছে। তিনি সত্যবদ্ধ, সুতরাং পরীক্ষা

দিতে তিনি একটুও ইতস্ততঃ করিলেন না। তিনি বুঝিলেন যে, মন্ত্রিত্ব, রাজসম্মান, বন্ধুবান্ধবের প্রীতি বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা দিতে যাইতে হইবে। কিন্তু তিনি পিছাইলেন না—সত্যরক্ষা সর্ব্বাগ্রে। সচিব-প্রধান বিলম্ব না করিয়া রাজসভা ত্যাগ করিলেন এবং ভাঙ্গির সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, "আমার মাথায় বিষ্ঠাপাত্র দেও—আমি তোমার শিষ্য।"

ভাঙ্গি প্রসন্নচিত্তে কহিল, "আমি মহাসন্তুষ্ট হইলাম,—তোমাকে আর এ ভার গ্রহণ করিতে হইবে না—ভবিষ্যতে আর কোন পরীক্ষাও দিতে হইবে না।"

এই বলিয়া ভাঙ্গি প্রস্থান করিল; মন্ত্রীও রাজসভায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজা অতি রূঢ়কণ্ঠে মন্ত্রীকে কহিলেন, "তুমি কি দেশে মানুষ পেলে না, একটা ভাঙ্গিকে গুরু কর্‌লে?"

মন্ত্রী অধোমুখে নিরুত্তর রহিলেন। রাজা সরোষে কহিলেন, "তুমি এখনি দূর হও—আর কখন প্রাসাদে বা আমার সম্মুখে এসো না।"

মন্ত্রী লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ অপর এক ব্যক্তিকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি মন্ত্রিপদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। রাজ্যমধ্যে অচিরে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, শত্রুরা মাথা তুলিল, অরাজকতা দেখা দিল। এক প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা এতদিন নীরব ছিলেন, এক্ষণে তিনি সুযোগ বুঝিয়া প্রথম রাজার রাজ্য আক্রমণ করত ক্রমে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন। শত্রুকে প্রতি যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অবশেষে তিনি রাজধানী অবরোধ করিলেন।

প্রথম রাজা ভীত হইয়া অমাত্যকে ডাকিলেন। এই ব্যক্তি সুকৌশলী ছিল না, সুতরাং কোন পরামর্শ দিতে পারিল না। শঙ্কিত-

চিত্তে কহিল, "মহারাজ, আমি কোন উপায় দেখিতেছি না। শত্রুরা আমাদের রাজধানী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, অন্যান্য প্রদেশ হইতেও সাহায্য পাইবার উপায় নাই, সংখ্যায় আমরা দুর্ব্বল—"

"এ সকল কথা আমি অবগত আছি ; এক্ষণে উপায় কি বল ?"

"একমাত্র উপায় আত্ম-সমর্পণ।"

"ভীরু, কাপুরুষ—দূর হও।"

অমাত্য অপমানিত হইয়া প্রস্থান করিল। রাজার তখন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীর কথা মনে পড়িল। তিনি থাকিলে রাজ্যের এ বিপদ্ ঘটিত না। রাজা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে গভীর রাত্রিতে ছদ্মবেশে অনুতপ্ত-চিত্তে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মন্ত্রী সজাগ ছিলেন ; তিনি রাজাকে দেখিবামাত্র সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া উপযুক্ত আসনে বসাইলেন। রাজা উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "মন্ত্রি, আমাকে ক্ষমা কর, এই বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।"

মন্ত্রী কহিলেন, "আপনি নির্ভয় হউন মহারাজ! রজনী প্রভাতে দেখিবেন, শত্রুসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলাইতেছে।"

রাজা বলিলেন, "তুমি কি আমার সহিত রহস্য করিতেছ ?"

মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "কখন কি রহস্য করিয়াছি মহারাজ ? তবে আমার একটি প্রার্থনা আছে, পাঁচশত সৈন্য এখনি আমার চাই—আমার আদেশ অনুসারে তাহারা কার্য্য করিবে।"

রাজা—"এখনি সৈন্য পাঠাইয়া দিতেছি, তুমি আমাদের এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর।"

সৈন্য আসিল ; মন্ত্রী তাহাদের লইয়া দুর্গদ্বার উদ্‌ঘাটন করত দুর্গ-বাহিরে আসিলেন। শত্রু আক্রমণোদ্যত হইলে তিনি মন্ত্রপ্রভাবে তাহাদের অস্ত্রাদি আকর্ষণ করিয়া লইলেন, এবং বহু সৈন্যকে বন্দী

করিলেন। ক্রমে অগ্রসর হইয়া সেনাপতিকে নিরস্ত্র করিলেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া দুর্গমধ্যে প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট শত্রুসৈন্য আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল।

প্রভাতে উঠিয়া রাজা দেখিলেন, রাজধানী শত্রুমুক্ত। তিনি পরম পুলকিত হইয়া মন্ত্রীকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন এবং শ্রেষ্ঠ পদ ও বিপুল ধন পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিলেন। অতঃপর মন্ত্রীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিরূপে এই অসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিলে তাহা আমাকে সবিস্তারে বল।"

মন্ত্রী তখন মৃগয়ার ঘটনা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কথা অকপট-চিত্তে নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন। অতঃপর রাজা অনুতপ্তচিত্তে শ্রদ্ধাপূর্ণকণ্ঠে কহিলেন, "মন্ত্রি, তুমি তোমার সত্য রক্ষা করিয়াছ; সত্য রক্ষা করিতে তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে, তবু তুমি পিছাও নাই। আর আমার ব্যবহার অতি লজ্জাকর হইয়াছে। আমি তোমাকে শাস্তি দিলাম, কিন্তু বারেক জিজ্ঞাসাও করিলাম না, কেন তুমি ভাঙ্গিকে গুরুপদে বরণ করিলে? তোমার মত আমার হিতকামীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত করিলাম, শাস্তি দিলাম—এ দুঃখ আমার কখনও যাইবে না।"

আমরা মানুষের ভিতর না দেখিয়া, তাহার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তাহার বিচার করি। আমরা অহঙ্কারে পূর্ণ—আমিত্বে ভরা। যেমন দর্পণময় গৃহে কুকুরকে বাঁধিয়া রাখিলে সে চারিদিকে নিজের দেহেরই প্রতিবিম্ব দেখে, আমরাও এ সংসারে চারিদিকে নিজেকে, নিজের স্বার্থকেই দেখি; অপর কাহারও সুখ দুঃখ পানে চাহিয়া দেখি না। রাজা আগাগোড়া নিজের স্বার্থ ই অন্বেষণ করিয়াছিলেন, মন্ত্রী আগা-গোড়া নিজের স্বার্থকে পদদলিত করিয়া রাজার স্বার্থ ই দেখিয়াছিলেন।

তাই পরিণামে স্বার্থান্বেষী রাজার গর্ব্বচূর্ণ হইল, নিষ্কাম মন্ত্রীর জয় ও সুখলাভ হইল।

বাবা আর একদিন আমাদিগকে বুঝাইতেছিলেন, এ জগতে পামর, বিষয়ী, মুমুক্ষু ও জ্ঞানী এই চারি প্রকারের লোক সচরাচর দেখা যায়। পামর ধর্ম্মের দিকে চায় না, পাপ হইতে পাপান্তরে লিপ্ত হইতে থাকে। যে বিষয়ী, সে শাস্ত্রানুযায়ী সৎকর্ম্ম করে। তবে তাহাদের সকল কর্ম্মই সকাম। মুমুক্ষু বা তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি অনিত্য সুখ কামনা করেন না, তিনি বিষয়ানন্দ তুচ্ছ জ্ঞান করত ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তি সতত নির্ব্বিকার—বিপদ্ সম্পদ্ তাঁহার নিকট সমান—সম্পূর্ণ বাসনা-রহিত—সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন।

এইরূপ তিনি অনেক উপদেশ দিলেন। যখন তাঁহার অমৃতময় বাক্য শুনিতেছিলাম, তখন কয়েকটী অতি দরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসিত হইবার জন্য বাবার নিকট আসিল। তাহারা বহুদূর হইতে আসিয়াছিল। বহুদূর হইতে অনেকেই আসেন; এমন কি মুঙ্গের, পাটনা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতেও মাঝে মাঝে রোগীরা আসিয়া থাকেন। গাছ-গাছড়া হইতে বাবা নিজের হাতে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন; কখন কখন পারা, হরিতাল, স্বর্ণ ইত্যাদিও ভস্ম করেন বলিয়া শুনিয়াছি। অকাতরে ঔষধ দান করেন, কিন্তু কখন মূল্যস্বরূপ কিছু গ্রহণ করেন না। কেহ মূলা, কলা, বেগুন, শাক প্রভৃতি লইয়া আসিলে, বাবা তাহা সাদরে গ্রহণ করেন।

বাবা যেরূপ যত্ন ও প্রীতির সহিত এই দরিদ্র রোগী কয়টীকে ঔষধ দান করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দের গানটী মনে পড়িল।—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মনঃ-প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥"

চতুর্থ তরঙ্গ

সাধুরা কিরূপে সমাধিমগ্ন হ'ন, ইহা দেখিবার আমাদের খুব ইচ্ছা। আমার ছোট মেয়ে প্রফুল্ল পুনঃ পুনঃ আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, "বাবাকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহার সমাধি হয় কিনা।" আমি একদিন কথাটা ঘুরাইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কতদিন তপস্যার পর আপনার প্রথম সমাধি হয়?' বাবা উত্তর করিলেন, 'মায়ি, সকল সময়েই তো সমাধিতে আছি।'

আমি যোগীর সমাধির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বাবা জ্ঞানীর সমাধির কথা বলিলেন। জ্ঞানীরা সকল সময়ে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন—এই তন্ময়ত্বই সমাধি, বাবার কথায় তাহাই বুঝিলাম। কিন্তু আমরা যে সমাধি দেখিতে বাসনা করিয়াছিলাম, তাহা দেখিলাম কয়েকদিন পরে শ্রীশ্রীগুরুদেবের করণিবাগ আশ্রমে। একদা সন্ধ্যাকালে যখন আশ্রমের মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা নিনাদিত হইতেছে, স্তোত্রপাঠ হইতেছে, ভক্তকণ্ঠোত্থিত মধুময় গীতে আশ্রম প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তখন আমাদের গুরু মহারাজ শ্রীশ্রীবালানন্দস্বামী বৃহৎ নিম্ববৃক্ষতলে প্রজ্বলিত ধুনির সম্মুখে গভীর সমাধিমগ্ন। নিবাত নিষ্কম্প প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিশ্চল। আমরা তদ্দর্শনে চমৎকৃত ও পুলকিত হইলাম। আমরা কিয়ৎকাল

তথায় অপেক্ষা করিয়া যশিডি ফিরিলাম। পরে শুনিয়াছিলাম, গুরুদেব প্রায় দুই ঘণ্টা একাদিক্রমে সমাধিমগ্ন ছিলেন।

একদা অপরাহ্ণে গুরুভক্তির কথা উঠিল। বাবা একটী গল্প বলিয়া আমাদের বুঝাইলেন যে, যাহার হৃদয়ে গুরুভক্তি আছে, ভগবদ্দর্শন তাহার পক্ষে সহজসাধ্য। গল্পটী এই,—

কোন এক রাজার পরিণত বয়সে বৈরাগ্যের উদয় হইল; তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, গুরুলাভ না হইলে ভগবদ্দর্শন সম্ভবপর নয়। গুরু কোথায় পাওয়া যাইবে? চারিদিকে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, কিন্তু উপযুক্ত গুরু কোথাও পাওয়া গেল না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্ত্রী সংবাদ দিতেন, উপযুক্ত ব্যক্তি কোথাও দেখা যাইতেছে না। একদিন রাজা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "আমি নিজেই আমার গুরুর সন্ধান করিব। রাত্রিশেষে আমি রাজধানী ত্যাগ করিব—সিদ্ধকাম না হইলে আমি গৃহে ফিরিব না—তুমি রাজ্য দেখিও।" পরে ভাবিয়া কহিলেন, "আমার ধনাগারে যে শ্রেষ্ঠ রত্ন আছে, তাহা আনিয়া দেও—গুরুকে দক্ষিণা দিতে হইবে।"

রাত্রিশেষে রাজা মণিসহ একাকী পদব্রজে মলিনবেশে গৃহত্যাগ করিলেন। এদিকে রাজকর্ম্মচারীরা সকলেই রাজার গৃহত্যাগের কথা শুনিল। একজন নগণ্য ভৃত্য চিন্তা করিয়া দেখিল, মণিটা হাতছাড়া হয় কেন? একটু কৌশলসহ কার্য্য করিলে মণিটা তাহার হইতে পারে। এবং চিরদিনের তরে তাহার দারিদ্র্যদুঃখ নিবারণ হইতে পারে। চিন্তান্তে সে গোপনে রাজার অনুসরণ করিল। যখন দেখিল যে রাজা লোকালয় ত্যাগ করিয়া অরণ্যপথে অগ্রসর হইতেছেন, তখন সে বিভিন্ন পথে ঘুরিয়া রাজার অগ্রবর্ত্তী হইল। রাজা অনভ্যস্ত, ধীরে ধীরে পথ চলিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে বৃক্ষাশ্রয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন।

চোর স্থির জানিত যে, রাজা তাহাকে কোনমতেই চিনিতে পারিবেন না ; কেন না, রাজার সম্মুখে কখন সে আসে নাই। তাহার নিকট ছদ্মবেশ ছিল। সে যখন দেখিল যে, অন্ধকারে ধরিত্রী আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইতেছে, তখন সে পথের অনতিদূরে এক নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া সাধুর বেশ গ্রহণ করিল। দীর্ঘ জটা ও দীর্ঘ শ্মশ্রু থাকিলে অনেক সময় সাধু সাজা যায়। বেশ-গ্রহণান্তর প্রতারক পথের এক পার্শ্বে আসন করিয়া বসিল। যখন দেখিল, রাজা নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

রাজা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া সাধুর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। সেই অস্পষ্টালোকে তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতেই তাঁহার ভক্তির উদয় হইল। তিনি সাধুর চরণে পড়িয়া দীক্ষাপ্রার্থী হইলেন। সাধু কহিলেন 'বৈঠো।'

রাজা বৈঠো শব্দের অর্থ বুঝিলেন, সকল বাসনা ত্যাগ করিয়া ভগবৎ আরাধনায় এখানে বসিয়া যাও। এই কথাটি তিনি মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। অতঃপর রাজা ভক্তি-নম্রচিত্তে ভণ্ডের চরণে প্রণত হইয়া দক্ষিণাস্বরূপ রত্ন দান করিলেন। প্রতারক আশীর্ব্বদান্তে পুনঃ "বৈঠো" বলিয়া প্রস্থান করিল।

রাজা তথায় আসন করিয়া বসিয়া দৃঢ়চিত্তে জপ ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন।

দিনের পর দিন গত হইল,—রাজা কঠোর তপস্যায় মগ্ন রহিলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই—একাসনে বসিয়া বৈঠো-মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তপস্যার কঠোরতা-দর্শনে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর মন চঞ্চল হইল। তিনি ত্বরায় রাজাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, "আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি—তুমি উঠিয়া এস—রাজ্যে ফিরিয়া যাও।"

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুকে চিনিয়াও কহিলেন, "ক্ষমা করিবেন, আমি উঠিতে পারিব না।"

"কেন পারিবে না ? আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি।"

"আপনার আদেশের চেয়ে আমার গুরুর আদেশ বড়।"

বিষ্ণু তখন উপায়বিহীন হইয়া সেই ভণ্ডকে ধরিয়া আনিলেন। ভণ্ড তখন বিষ্ণুর আদেশে বৃক্ষকোটর মধ্যে লুক্কায়িত সাধুর ছদ্মবেশ গ্রহণ করিল এবং তাঁহার সহিত রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাঁহার গুরুকে দেখিবামাত্র পরম পুলকিত হইলেন ; এবং গুরুচরণে প্রণত হইয়া পরে বিষ্ণুকে প্রণাম করিলেন। গল্পটী বলিয়া সাধুবাবা কহিলেন—

গুরু গোবিন্দ দোনো খাড়ে, কিস্‌কো লাঁগু পায়,
বলিহারি গুরু আপ্‌নে যিন্‌কো গোবিন্‌-জি দিয়োলখায় ॥

সর্ব্বভূত মধ্যে পরমাত্মা যে বিরাজ করিতেছেন, সে সম্বন্ধে একদিন কথা উঠিয়াছিল। বাবা বলিলেন, "যে দেখিতে জানে, সে বাহিরের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিলেও মূলে একই বস্তু দেখিতে পায়। সে পৃথক্ দেখে না—একেরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি দেখে। এই কথাটা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা কহিলেন, এক ব্যক্তির পুরুষানুক্রমে কয়েকটী স্বুবর্ণ-বিগ্রহ ছিল। কোনটী শ্রীরামচন্দ্রের, কোনটী সীতাদেবীর, কোনটী বা মহাবীর হনুমানের। গৃহী ক্রমে ক্রমে অতি হীন অবস্থাপ্রাপ্ত হইল। তারপর দেশমধ্যে যখন দুর্ভিক্ষ জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে উপায়ান্তর না দেখিয়া বিগ্রহগুলি বিক্রয় করিবার অভিলাষ করিল। এবং তদভিপ্রায়ে সে বিগ্রহসহ এক স্বর্ণকারের নিকট উপস্থিত হইল। স্বর্ণকার যখন মূর্ত্তিগুলি ওজন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি অপেক্ষা

মহাবীরের মূর্ত্তির মূল্য অধিকতর নির্দ্দেশ করিল, তখন গৃহী বিস্মিত হইয়া কহিল, "একি সম্ভব ? প্রভু অপেক্ষা সেবকের মূল্য অধিক ?" স্বর্ণকার কহিল, "আমার নিকট সেব্য ও সেবক নাই—আমি দেখিতেছি সব সোণা—সব এক।"

বাবা অতঃপর কহিলেন, এক পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করত ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছেন। যথা গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি,
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ। ৬।২৯

বাবা আরও কত উপদেশ দিয়া সন্ধ্যা সমাগত হইতেছে দেখিয়া আমাদের বিদায় দিলেন। তাঁহার মধুময় সঙ্গ ছাড়িতে আমাদের ইচ্ছা হয় না।

পঞ্চম তরঙ্গ

পৌষ মাস। দুরন্ত শীত পড়িয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়িতেছে—প্রবল বাতাস। আকাশের গর্জ্জন, বায়ুর হুঙ্কার সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কয়েকদিন আমরা বাড়ীর বাহির হইতে পারি নাই। আকাশ বর্ষণক্ষান্ত হইলে বাবাকে দেখিতে আমরা কৈলাসে চলিলাম।

গিয়া দেখি—সর্ব্বনাশ! বাবার সেই ক্ষুদ্র ঘরখানি বর্ষা-প্লাবিত। খোলার ছাদ ভেদ করিয়া অজস্রধারে বৃষ্টি পড়িয়াছে। বাবার শয্যাদি সিক্ত, তিনি ছাতা মাথায় দিয়া কয়েক রাত্রি বসিয়া কাটাইয়াছেন। শয়নের ত এই ব্যবস্থা, আহারেরও তাই। যাই হোক প্রাণে বড় ব্যথা

লাগিল। বাবার প্রসন্ন বদন দেখিয়া ভুলিলাম না,—আবেগভরে বলিয়া ফেলিলাম, 'বাবার শত শত ধনী শিষ্য ও ভক্ত রহিয়াছে, বাবা একটু ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই এখনই ইমারত উঠিয়া পড়ে। কেন বাবা, আপনি এত কষ্ট পাইতেছেন ?'

বাবা হাসিমুখে উত্তর করিলেন, 'আমার কোন কষ্ট নাই ত মা।'

বাবার কথা শুনিয়া বহু পুরাতন এক আখ্যায়িকা মনে পড়িয়া গেল। বসোরার অধিবাসিনী মহাসাধিকা রাবেয়া একদা পীড়িতা হইয়া শয্যাশায়িনী ছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে দুইজন ভগবদ্ভক্ত আসিলেন। তাঁহাকে পীড়িতা দেখিয়া হোসেন বসোরি (বসোরা অধিবাসী) কহিলেন, "ভগবান্ রোগ শোক দিলে তাহা ধীরভাবে সহ্য করিতে হয়।" দ্বিতীয় ভক্ত মালেক দীনার দমস্তি (ডামেস্কাসের অধিবাসী) কহিলেন, "রোগশোক তাঁহার দান মনে করে আনন্দ কর্‌তে হয়।" রাবেয়া কহিলেন, "যিনি প্রভুতে আত্মহারা হয়েছেন, তাঁহার সুখদুঃখ বোধ কিছুই ত থাকে না।"

জানি না বাবা কি ভাবে তাঁহার এই কষ্ট গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কষ্ট বোধহয় ভগবান্ সহ্য করিতে পারিলেন না—কয়েকদিনের মধ্যে এই কুটীরখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে নূতন ঘর উঠিতে লাগিল। বাবা সেই কয় মাস একটী ছোট তাম্বুতে বাস করিতেন। শীতের অবশিষ্ট কয়েক মাস বাবাকে এই অতি ক্ষুদ্র তাম্বুতে কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। দিনের বেলায় বসিতেন একখানি বড় পাথরের উপর। আমরাও তাঁহার নিকটে ভূম্যাসনে বসিতাম। এই সময় বাবা আমাদের অনেক দোঁহা শুনাইতেন। কোনটি তাঁহার রচিত, কোনটি বা তুলসীদাসের, কোনটি মহাভক্ত নানক ও কবীর প্রভৃতি সাধুর।

ভক্ত কবীরের দুই তিনটী দোঁহা এবং কয়েকটী দোঁহার অর্থ আমাদিগের নিকট বড় সুন্দর লাগিয়াছিল, তাই উহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"ঘট ঘট মে রহি সাঁঈ রমতা, কটুক বচন মৎ বোলরে।
ধন যৌবন কো গর্ব্ব ন কীজৈ, ঝুটা পংচ রং চোল রে॥"

অর্থাৎ প্রত্যেক ঘটে ঘটে সেই একই স্বামী আনন্দ করিতেছেন, সুতরাং কটু বাক্য কাহাকেও বলিও না। তুমি বৃথা ধন বা যৌবনের গর্ব্ব করিও না ; এই তনু মিথ্যা পাঁচ রঙ্গা পরিচ্ছদ মাত্র।

"পানী বিচ মীন পিয়াসী, সোহিঁ সুন সুন আওত হাঁসী।
ঘরমে বস্তু নজর নহি আবত বন্ বন্ ফিরত উদাসী।
আত্মজ্ঞান বিনা জগ ঝুঠা ক্যা মথুরা ক্যা কাশী॥"

অর্থাৎ জলের মধ্যেও মীন পিপাসী রহিয়াছে, ইহা শুনিয়া আমার হাসি পাইতেছে। হায়, ঘরের মধ্যে বস্তু থাকিতেও দেখিতে পাইতেছ না—তাইত বনে বনে উদাসী হইয়া ফিরিতেছ! সার কথা এই যে, মথুরাই যাও আর কাশীই যাও—আত্মজ্ঞান না হইলে বিশ্ব তোমার নিকট মিথ্যা।

আর একটী দোঁহার অর্থ এইরূপ—ওগো যাত্রী, বহুদূর যাইতে হইবে, শুইয়া আছ কেন? হে নিদ্রিত, জাগ্রৎ হও। হে চঞ্চল, চিন্তা করিয়া দেখ, এত অধিক নিদ্রা দূর কর। নদী গভীর, তোমার নৌকা পুরাতন, কেমন করিয়া তুমি পার হইবে? কবীর কহেন, "সুদের লোভে মূলধন হারাইও না।"

"যে পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র জ্ঞান লইয়া জীব থাকে, সে পর্য্যন্ত চক্ষুর সমক্ষে যবনিকা দৃষ্ট হইবে। যখন স্বতন্ত্র জ্ঞান নষ্ট হইবে তখন সেই আনন্দ-রস তোমার অন্তরে স্থির হইবে।"

"এমন নহেন তিনি তেমন গো, কেমন করিয়া সে কথা বলিব? যদি বলি তিনি অন্তরে আছেন,—তবে বিশ্ব জগৎ লজ্জায় পড়ে; যদি বলি তিনি বাহিরে, তবে সে কথাও মিথ্যা হয়। বাহির ভিতর সকলকেই নিরন্তর করিয়া আছেন, চেতন অচেতন, এই দুই তাঁহার পাদপীঠ। তিনি দৃষ্টও নহেন তিনি প্রচ্ছন্নও নহেন—তিনি প্রকটও নহেন, অগোচরও নহেন। বাক্যে সে কথা বলা যায় না।"

"এই মলিন জগৎ-সংসারের মধ্যে তাঁহার নাম-সাগরে ডুব দিলেই পবিত্র। কবীর কহেন ভক্তিকে ছাড়িও না। উত্থান পতনের মধ্য দিয়া উচ্চে উঠ।"

"সংসারে সবাই রোগী হইয়া আছে—কারণ যিনি অসীম বৈদ্য তাঁহার সন্ধান এখনও লওয়া হয় নাই। কবীর কহেন বিরহ অগ্নি যদি অন্তরকে দগ্ধ করে তবেই সে পূর্ণপদকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

কবীর কহেন—"হে মন, প্রভুর হাসি হইতে দূরে দূরে কেন পলাইয়া ফিরিতেছ? প্রিয়তমকে ছাড়িয়া তুমি অন্যকে ধ্যান করিতেছ—তাই তোমার সব ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। বিষয় ছাড়িয়া প্রিয়তম-কেই সতত অন্তরে ধ্যান কর।"

দোঁহা ছাড়া আরও অনেক সদুপদেশ দিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আসক্তিই বন্ধনের কারণ। মনে কোন আসক্তি উৎপন্ন হইতেছে বুঝিতে পারিলেই তাহা তৎক্ষণাৎ সমূলে উৎপাটনের জন্য চেষ্টিত হইবে। কারণ ঐ আসক্তিই যত দুঃখের মূল এবং উহাই মনুষ্যের পুনরাবর্ত্তনের কারণ। দেখ, প্রথমে ভূমিতে কোন বৃক্ষ রোপণ করিলে ভূমি উহা রস-প্রদানে ক্রমশঃ ঐ বৃক্ষটীকে বর্দ্ধিত করিতে থাকে। ধীরে ধীরে ঐ বৃক্ষের শিকড় যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই ক্রমে ক্রমে উহা ভূমির অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া লয়। পরে যদি ঐ বৃক্ষটী

উৎপাটনও করিয়া ফেলা যায় তবুও সেস্থানে বৃহৎ গর্ত্ত থাকিয়া যায়। সেইরূপ আমাদের আসক্তির বস্তুটী যত অধিক হৃদয় অধিকার করে, তাহার রেখা বা গর্ত্ত ততই অধিক হয় এবং উহার রেখা অপসারিত হইতেও তত অধিক সময় লাগে।” বাবা বলিতেছিলেন—“যাহা মায়া রচিত বস্তু, তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ঐ আসক্তির বস্তু একদিন না একদিন অবশ্যই তোমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, নতুবা সময় পূর্ণ হইলে তুমিই চলিয়া যাইবে। তখন দুঃখ ভোগ অনিবার্য্য।” বাবা নানকজীর এই দোঁহাটী বলিলেন—

“চিন্তা তাঁকো কি যিয়ে যো আন্ হোনি হোয়।
ইয়ে মার্গ হ্বায় সংসারকো নানক থির নেই কোই॥”

অর্থাৎ নানকজী বলিতেছেন—এই সংসারে সবই নশ্বর বা ‘চল্‌নে ওআলা’ অস্থির অস্থায়ী বস্তু ; সুতরাং ইহাতে চিত্ত স্থাপন না করিয়া তুমি সেই অব্যয় অবিনশ্বর নিত্য স্থায়ী বস্তুকেই চিন্তা কর। তারপর বাবা বলিয়াছিলেন, “ভগবানের দ্বারে কখন কোন প্রার্থনা জানাইতে নাই। যদি কিছু চাহিতে হয়, তবে ভক্তি জ্ঞান চাও, তাঁকে চাও—ছোট খাট জিনিষ চাহিয়া সব হারাইও না।” পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগজ্জননীর চরণে শ্রদ্ধা ভক্তি চাহিতেন। কিন্তু মায়াধীন ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট ধন পুত্র জয় প্রার্থনা করে।

ইহা ভাল করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বাবা একটী দৃষ্টান্ত দিলেন। কোন এক রাজা অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে বহুদূরে গিয়া পড়িলেন ; আতপতাপে পীড়িত হইয়া তৃষ্ণাতুর হইয়া পড়িলেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, নিকটে কোন জলাশয় নাই। এক ব্যক্তি মাঠে চাষ করিতেছিল, অনন্যোপায় হইয়া তাহার নিকট জলপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। কৃষকের নিকট জল ছিল না, কিন্তু মাঠে প্রচুর

তরমুজ ছিল। তাহারই একটা রাজাকে দিল। রাজা পরম তৃপ্তি-সহকারে তরমুজের জল পান করিলেন। কৃষককে কহিলেন, 'যদি তুমি কোন অভাবে পড়, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট যাইও—আমি সাধ্যমত তোমার অভাব মোচন করিব।'

কিছুকাল পরে কৃষকের ধান্যক্ষেত্রে দেখা গেল, বৃষ্টির অভাবে শস্য পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই শুকাইয়া যাইতেছে। কৃষক তখন মহাচিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহার বলদ কয়টী কি খাইয়া থাকিবে? তখন রাজার কথা মনে পড়িল। সে ব্যাকুল হইয়া রাজার কাছে গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?" কৃষক উত্তর করিল, "আমাকে দুই গাড়ী খড় দিতে হুকুম হউক।" রাজা কহিলেন, "ইহা অতি সামান্য বস্তু, আমার ভাণ্ডারে বহু মূল্যবান্ বস্তু আছে; তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে আরও অনেক জিনিষ দিতে পারি।"

কৃষক তখন তাহার বলদের চিন্তায় বিভোর, অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা তাহার অন্তরে তখন নাই। সে বলিল, 'আমি খড় পাইলেই সন্তুষ্ট।'

রাজা একটু হাসিয়া খড় দিয়াই তাহাকে বিদায় করিলেন। জগন্মাতাও এইরূপ হাসেন, যখন আমরা তাঁহার অনন্ত ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য কামনা না করিয়া সামান্য ধন পুত্র লইয়াই সন্তুষ্ট হই।

বাবা বলিয়াছিলেন—তাঁহার নিকট চাহিতে হইলে মোক্ষই প্রার্থনা করিবে।

আমাদের গুরুদেব একদা বলিয়াছিলেন,—

'বিনা মাঙ্গে মতি মিলে, মাঙ্গে মিলে না ভিখ্।'

তিনি বলিয়াছিলেন, ভগবানের চরণে ভিক্ষা চাহিলে কিছু মিলিতে পারে, কিন্তু না চাহিলে মণিমাণিক্য মিলিতে পারে।

বাবা আমাদের বুঝাইতেছিলেন যে, আমরা মোহে এতই আচ্ছন্ন যে, আমাদের স্বরূপমূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই না। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটী আখ্যায়িকা বলিলেন,—

কোন রাজার চারিটী মহিষী ছিল, কিন্তু কাহারও গর্ভে সন্তান জন্মিল না। রাজা পুত্রাভাবে বড়ই বিষণ্ণ। এমন সময় রাজ-সভায় এক সাধু দর্শন দিলেন। রাজা স্বহস্তে তাঁহার বহু সেবা করিলেন। সাধু পরিতুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?" রাজা কহিলেন, "একটী পুত্র।" সাধু উত্তর করিলেন, "বেশ, পুত্র পাইবে। কিন্তু বর্ত্তমান মহিষীদের গর্ভে সম্ভব নয়। তুমি দরিদ্র গৃহীর ঘর হইতে কন্যা আনিয়া বিবাহ কর।"

রাজা তাহাই করিলেন; এবং অল্পকাল মধ্যে নবরাণী গর্ভবতী হইলেন। রাজ্যময় আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল; কিন্তু জ্যেষ্ঠা রাণীরা হিংসায় জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহারা এক চক্রান্ত করিলেন; দুইটী ধাত্রীকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিলেন এবং উত্তম শিল্পী দ্বারা একটী প্রস্তরের শিশু নির্ম্মাণ করাইলেন। অবশেষে কনিষ্ঠা রাণীকে নির্জ্জনে কহিলেন, "তুমি ছোট ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের আচার ব্যবহার কিছু জান না। এই রাজ-গৃহে পুরুষানুক্রমে নিয়ম চলিতেছে যে, প্রসবের সময় প্রসূতিকে সুবর্ণখচিত বস্ত্রে বদনমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া সন্তান প্রসব করিতে হয়; নতুবা সে সন্তান চিরদুঃখী হয়।"

সরলা কনিষ্ঠা মহিষী এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মতা হইলেন। কে চাহে যে তাহার সন্তান চিরদুঃখী হইবে? অতঃপর প্রসবের সময় প্রসূতির বদন আবৃত করা হইল। রাণী এক অতি সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন; তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইল এবং তাহার স্থানে প্রস্তর-পুত্তলী রক্ষিত হইল। জ্যেষ্ঠা মহিষীরা তৎক্ষণাৎ প্রচার

করিলেন, নবরাণী এক পাষাণ পুত্তলী প্রসব করিয়াছেন। রাজাও সেকথা বিশ্বাস করিয়া দুঃখে মুহ্যমান হইলেন।

এদিকে নবজাত রাজপুত্র নগরের বাহিরে বহুদূরে এক অরণ্যমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। এক প্রৌঢ় ভীল সে সময় তথায় কাষ্ঠান্বেষণে আসিয়াছিল। নবজাত শিশুর রোদনধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অগ্রসর হইল; এবং তাহাকে দেখিতে পাইয়া কাঠের বোঝা ফেলিয়া শিশুকে বুকে লইয়া গৃহে ফিরিল। ভীল-গৃহিণীর পুত্রাদি ছিল না; সে অতি স্নেহযত্নের সহিত এই রাজপুত্রকে প্রতিপালন করিতে লাগিল।

এই শিশু নিজেকে ভীল-বালক বলিয়াই জানিত। প্রতিপালককে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিত; ভীলের ন্যায় শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া ভীলের আচরণ ও ব্যবসায় শিখিয়াছিল। যখন তাহার বয়স দশ বৎসর, তখন ভীল-গৃহে পূর্ব্বকথিত সাধু আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ ভীল ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে অতিথিসৎকারে প্রবৃত্ত হইল। ভীল-বালক পিতাকে সাহায্য করিতে লাগিল। সহসা সাধুর দৃষ্টি বালকের উপর পড়িল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। এত রূপলাবণ্য ভীলের গৃহে ত সম্ভব নয়। বালকের ললাট উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তথায় রাজটীকা স্পষ্ট রহিয়াছে। তিনি বৃদ্ধ ভীলকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ বালককে কোথায় পাইলে?" ভীল তখন সমস্ত কথা প্রকাশ করিল। সাধু তাহাকে বিদায় দিয়া বালককে ডাকিলেন; কহিলেন, "তুমি ভীল নও, তুমি রাজপুত্র।" সে উত্তর করিল, "আমি ভীল, রাজপুত্র নহি—এই আমার গৃহ, এই আমার বাপ-মা।"

সাধু তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিল না যে, সে ভীল হইতে অন্য কিছু। সাধু তখন নিরস্ত হইয়া বিদায় গ্রহণ

করিলেন। যোগ-বলে অথবা বুদ্ধি-প্রভাবে তিনি বুঝিতে পারিলেন, এগার বৎসর পূর্ব্বে যে অপুত্রক রাজা তাঁহার নিকট পুত্র কামনা করিয়াছিলেন, এই ভীল-পালিত বালক তাঁহারই সন্তান। রাজার চারিটী মহিষী হিংসাপরবশ হইয়া পঞ্চম রাণীর সদ্যোজাত পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া থাকিবেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সাধু রাজধানী উদ্দেশে যাত্রা করিলেন এবং অচিরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পঞ্চম রাণীর গর্ভে কোন সন্তান হইয়াছিল কি ?"

রাজা। রাণী এক প্রস্তর-পুত্তলী প্রসব করিয়াছিলেন।

সাধু। মনুষ্য-গর্ভে প্রস্তর-পুত্তলীর জন্ম কি সম্ভব ?

রাজা। সম্ভব নয় বটে ; কিন্তু রাণীরা ও ধাত্রীদ্বয় যখন সকলেই একই কথা বলিলেন, তখন বিশ্বাস করিতে হইল।

সাধু। ধাত্রীদ্বয় যদি জীবিত থাকে, তাহাদের এখনি আনিতে পাঠাও।

ধাত্রীদ্বয় জীবিত ছিল, রাজ-আদেশে তৎক্ষণাৎ আসিল। সাধুর কঠোর হুকুমে তাহারা সকল কথা প্রকাশ করিল। রাজা তখন সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার সে পুত্র কি জীবিত আছে ? সে এখন কোথায় ?'

সাধু নির্জ্জনে কহিলেন, "তুমি সে পুত্রকে অচিরে দেখিতে পাইবে। তার আগে দুইটী একই রকমের পোষাক প্রস্তুত হওয়া দরকার। একটী তোমার উপযোগী, আর একটী দশ বৎসরের বালকের উপযোগী। যে কক্ষে বালকের পোষাক রক্ষিত হইবে, সেই কক্ষে একখানি বৃহৎ দর্পণ রাখিও। আমি শীঘ্রই ফিরিব।"

সাধু প্রস্থান করিলেন এবং যথাকালে ভীলের গৃহে আসিলেন। বালককে পুনঃ পুনঃ বুঝাইলেন, 'সে ভীল নয়—সে রাজ-পুত্র—ভীলগৃহে

পালিত হইতেছে,' বালক তাহা বুঝিল না ; কথাটা উপহাস্য বোধে উড়াইয়া দিল। সে জোর করিয়া বলিতে লাগিল, "ইহারাই আমার বাপ-মা, এই আমার গৃহ—আমি ভীল-সন্তান—রাজপুত্র নই।"

সাধু তখন ভীলদম্পতি ও বালককে লইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাকালে প্রাসাদ-দ্বারে উপনীত হইয়া দম্পতিকে বাহিরে রাখিলেন এবং বালককে লইয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে নববস্ত্রাদিতে সজ্জিত করিয়া রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। রাজা নববেশে সজ্জিত হইয়া সাধুর চরণে প্রণাম করত পুত্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কক্ষ-প্রাচীরে বৃহদায়তন দর্পণ বিলম্বিত ছিল ; সাধুর আদেশে উভয়ে দর্পণ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বালক বিস্মিত নয়নে নিজের প্রতিবিম্ব দর্পণে দেখিতে লাগিল। সে পূর্ব্বে দর্পণে নিজমূর্ত্তি কখন দেখে নাই ; এক্ষণে লাবণ্যময় মূর্ত্তি দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া সে বুঝিল, সে ভীল-বালক নয়—সে মহামহিমময় রাজার পুত্র।

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে বালক ?

বালক। আমি রাজপুত্র।

সাধু। পিতাকে চিনিয়াছ ?

বালক। চিনিয়াছি—আমার কাছেই আমার পিতা। আমি এতদিন মোহাচ্ছন্ন ছিলাম, আপনার কৃপায় আমি এখন নিজেকে চিনিয়াছি—আমার প্রকৃত পিতাকে চিনিয়াছি।

গল্পটী বলিয়া বাবা কহিলেন, ভীলগৃহ-পালিত বালক এতদিন যেমন নিজ পরিচয় অনবগত ছিল, জীবও তেমনি মায়াচ্ছন্ন অবস্থায় নিজ পরিচয় অনবগত। তাহাকে বুঝাইলেও সে তাহার প্রকৃত পরিচয় বুঝিতে চায় না। যে গৃহে সে পালিত হইতেছে সেই গৃহই তাহার বলিয়া জানে, যে তাহাকে পালন করিতেছে তাহাকেই পিতা বলিয়া

জানে ; তাহার প্রকৃত গৃহের কথা তাহার প্রকৃত পিতার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া দিন যাপন করিতে থাকে। তবে যদি কোন সদ্‌গুরু তাহাকে কৃপা করিয়া আত্মজ্ঞান প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহার মায়ার ঘোর কাটিয়া যায়,—সে তখন বুঝিতে পারে সে কে, তাহার পিতা কে, তাহার গৃহ কোথায়।

বাবা আমাদের উপদেশ দিতেছেন, এমন সময় একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কাঁদিয়া কহিল, "আমার কি হ'বে বাবা ? আমি যে ভগবানকে ডাকৃতে পারি না !"

বাবা মধুর হাস্যসহ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি তাঁকে ডাকৃতে না পারলেও মায়ি, তিনি তোমাকে ভুলেন নি—"

বাবার এই আশাপ্রদ বাক্যে বৃদ্ধা ভক্তি-বিগলিত-চিত্তে কাঁদিয়া ফেলিল। আমাদের মধ্যে অনেকেরই নয়ন সজল হইল।

কৈলাসপতি

তৃতীয় খণ্ড

১৩৩৪-৩৫

যশিডি

কৈলাসপতি

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম তরঙ্গ

পূর্ব্বে মহাত্মা শ্রুতানন্দজীর নাম উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার কোন পরিচয় দিই নাই। সাধুর পরিচয়ই বা কি? সাধুর পরিচয় তাঁহার জ্ঞানে, তাঁহার ত্যাগে—গৈরিক পরিচ্ছদে নয়। শ্রুতানন্দজী চল্লিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি আজন্ম ব্রহ্মচারী। যদিও বাল্যাকালাবধি ইঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্য ভাব, কিন্তু বৃদ্ধা জননীর মনে কষ্ট দিতে অপারগ হওয়ায় তাঁহার একান্ত অনুরোধে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ সময়েই তিনি বেদান্ত শাস্ত্রাদি বহু যত্নে পাঠ করত অধিগত করেন। ইঁহার মাতা দেহত্যাগ করিলে, ইনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীরও ঠিক এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। প্রথমে ইনি এক গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া একাদিক্রমে নয় বৎসর কাল তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং কায়মনোবাক্যে গুরুর সর্ব্ববিধ সেবা করিয়াছিলেন। ইঁহাকে গুরু যেরূপ পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন ইনিও তদ্রূপ গুরুর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। গুরু দেহত্যাগ করিলে ইনি পদব্রজে তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং ১২।১৩ বৎসর নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। কোন স্থানেই ঐ সময় অধিক দিবস অবস্থান করিতেন না। সম্প্রতি

কয়েকদিন মাত্র তিনি 'যশিডিতে' আসিয়া বাস করিতেছেন। এক দিবস ইনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীহংস মহারাজ যখন পূর্ব্বে নানা তীর্থাদিতে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, সেই সময় হংসদেব ইঁহাকে লক্ষ্য না করিলেও ইনি তাঁহাকে বহুস্থানে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এতদিন পরে উভয়ে একই স্থানে অবস্থান হেতু পরস্পর পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাতের বেশ উত্তম সুযোগ ঘটিয়াছে। শ্রুতানন্দ স্বামীজী বলেন, শ্রীশ্রীহংস মহারাজ অতি কঠোর সাধক ছিলেন অর্থাৎ ইনি অতিশয় তিতিক্ষা-পরায়ণ সাধু। ইনি বহু বৎসরাবধি ঝড়-বৃষ্টি-শীত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক উপদ্রবের মধ্যে মাত্র কৌপীন-পরিহিত অবস্থায় অচঞ্চল ও প্রসন্নচিত্তে বহু সাধন করিয়াছেন। এক দিবস আমাদের নিকট ঐ সাধুজী গল্প করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে হংসদেব যে পান পাত্রটিতে জলপান করিতেন তাহাও তথায় পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যস্থানে গমন করিতেন। কিছুই তিনি সঞ্চয় করিতেন না। শুনিয়াছি, সনাতন গোস্বামী দুই রাত্রি এক বৃক্ষতলে অতিবাহিত করিতেন না, পাছে তাঁহার ঐ বৃক্ষের প্রতি মায়া জন্মে। এইরূপে একাদিক্রমে ১২ বৎসর বা ততোধিক কাল কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া সাধুবাবা অবধূত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অবধূতদের এইরূপ ভাব 'গুজর গেই গুজরাণ, কেয়া ঝোপ্‌রি কেয়া ময়দান।' পথ চলিতে চলিতে বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে বৃক্ষের শুষ্ক পত্র একত্রিত করিয়া উহার উপর বাহু উপাধানে সাধুবাবা পরম নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেন। যাঁহাদের হৃদয়ে তৃষ্ণা নাই, সন্তোষ কখনও তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করে না।

আমরা একদিবস শ্রুতানন্দ স্বামীজীর নিকট কিছু সৎপ্রসঙ্গ শুনিবার অভিপ্রায়ে আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে তাঁহার বাসস্থানে গিয়াছিলাম। ইঁহার নামটি খুব বড়, বিশেষতঃ স্থানীয় ব্যক্তিগণ ইঁহাকে "বাবাজী"

বলিয়াই সম্বোধন করেন, সুতরাং আমরাও এখন হইতে ইঁহার বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে 'বাবাজীই' বলিব। বাবাজী আদৌ বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন না। তবে আমরা বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলিলে তিনি বুঝিতে পারেন। সেদিন বাবাজীর নিকট গমন-পূর্ব্বক সৎপ্রসঙ্গ উত্থাপন নিমিত্ত 'ধ্যান' সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি তাঁহার নিজ ভাষায় যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমাদের হৃদয়গ্রাহী হওয়ায় নিম্নে তাহার ভাবার্থ লিখিলাম।

বাবাজী বলিয়াছিলেন—প্রত্যেক মনুষ্যের মনে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিন প্রকার বৃত্তিরই প্রবাহ মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে। স্বাভাবিকভাবে চিত্তে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইলে ঐ সময় ধ্যানে বসিয়া যাইতে হয়। এই সময় ধ্যানে বসিলে মন সত্বর একাগ্র হয় এবং তাহাতে কার্য্য উত্তমরূপে হইয়া থাকে। কতক্ষণ এইভাবে বসিতে হইবে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। অভ্যাসের গুণে মন নিয়মের বাধা মানে না। মন একবার বসিয়া গেলে দুই তিন ঘণ্টা কিংবা যত বেশী সময় পারা যায় ততই, মন ধ্যানে লাগাইয়া রাখিতে হয়। মনে তামসিক বা রাজসিক ভাব প্রবল থাকা অবস্থায় ধ্যানে বসিলে তাদৃশ ফলপ্রদ হয় না। তবু সে সময়েও মনকে বুঝাইয়া ঐ কার্য্যে লাগাইয়া দিতে পারাই কর্ত্তব্য। মনকে এই বলিয়া বুঝাইবে "হে মিত্র, কতকাল ধরিয়া তুমি বিষয়ানন্দ ভোগ করিতেছ, কল্পারম্ভ থাকিয়া কতশত জীবন ভরিয়া এই বিষয় ভোগ ও সাংসারিক সুখ ভোগ করিতেছ,—কিন্তু তাহাতে কি তুমি তৃপ্তি পাইয়াছ? রে মূর্খ! এতকাল ভোগ করিয়াও কোনরূপ তোমার তৃপ্তিলাভ হইল না, কখনও হইবেও না, তবুও তুমি বুঝ না যে উহাতে প্রকৃত সুখ নাই। অতএব ঐরূপ সুখে তুমি 'পিঠ দেখাও', অর্থাৎ ও সব ক্ষণস্থায়ী স্বল্প,

ক্ষণিক সুখদায়ক ভোগ্য পদার্থ বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ উদাসীন হও। ঐ সকল পার্থিব পদার্থে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া তুমি পরমাত্মাকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করত একবার জাগরিত হইয়া উঠিয়া একাগ্রভাবে ভজনে বসিয়া যাও দেখি, তাহাতে স্থায়ী আনন্দ পাও কি না ?" এইরূপে নানা প্রকার বিচারপূর্ব্বক মনকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া বিষয়াসক্ত চিত্তের প্রবাহ ক্রমে ক্রমে পরমাত্মার দিকে ঘুরাইয়া দিতে হয়। এই বিষয়াভিমুখী মনকে ঘুরাইয়া ভগবন্মুখী করিবার উপায় সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা, জপ ও ধ্যান ইহাই পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হইবে। ইহার দ্বারা মন পবিত্র ও সূক্ষ্ম হইবে। সূক্ষ্ম মনের সাহায্যে তখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা হইবে। অভ্যাস ও সাধনার দ্বারা এইরূপে ক্রমে ক্রমে মনে বৈরাগ্যের উদয় হইলে, মন যতই পবিত্র ও সূক্ষ্ম হইবে ততই সে মনে পরমাত্মার উপলব্ধির ক্ষমতা জন্মিবে। সমাধি অবস্থায় সূক্ষ্ম মন, কারণ শরীর, মহাকারণ আত্মা ও পরমাত্মা সব এক হইয়া যায়। ইহাকেই মনোলয় বলে এবং এইরূপ সূক্ষ্ম পবিত্র মন দ্বারাই পরমাত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে। মনে যদি রজস্তমোভাব থাকে, তবে মন সূক্ষ্ম হইতে পারে না এবং সম্পূর্ণ পবিত্র না হইলে তাহা কখনই সমাধি-লাভের উপযুক্ত হয় না।

বাবাজী আরও বলিলেন, শ্বাস প্রশ্বাসেই মনোযোগ স্থাপন করা হউক, কিংবা পরমাত্মাতেই মন লাগাইয়া রাখা যাউক, যে পন্থায় মন ভাল ব'সে, সেই পন্থাই অবলম্বন করা উচিত ও তাহাতে একেবারে আপ্রাণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাহা ভাল লাগে, যাহা প্রাণ চায়, সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া ধ্যানে বসিয়া যাইতে হয়, তাহাতে নিশ্চিত ফললাভ হইবে। ঋষিরা এইভাবে নানারূপে—বিভিন্ন পন্থায়, বিবিধ সাধনায়, তাঁহার কৃপায়, তাঁহাকে লাভ হইতে পারে বলিয়া গিয়াছেন।

যাহার যাহা ভাল লাগে, যাহার মন যেরূপ চায়, কিংবা যাহাকে গুরু যেরূপ উপদেশ দিয়ছেন, সেই এক পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাকে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে সাধন করিয়া যাইতে হইবে। তাহাতে অবশ্যই ফললাভ হইবে। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজও বলেন, "পার পার করিয়া, একবার এপার একবার ওপার করিও না, এক পার দৃঢ়রূপে ধরিয়া বসিয়া থাক, তাহাতেই ইষ্টলাভ হইবে।" অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ একবার এপার একবার ওপার করিলে কেবল হায়রাণ হওয়াই সার হয়, উহা না করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত এক পন্থাই ধৈর্য্যের সহিত দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া থাকিলে সময় হইলে অবশ্যই সত্যের উপলব্ধি হইবে।

আর একদিন আমরা পূর্ব্বোক্ত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ সরাফের বাগানের মধ্যে বাবাজীর নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে গিয়া দেখি, বাগানের মধ্যে একখানি বেঞ্চের উপর পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া তিনি বসিয়া আছেন ও গভীর মনোযোগের সহিত একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। তাঁহার মুখে যে প্রখর রৌদ্র আসিয়া লাগিতেছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই। আমরা সকলে নিকটে গিয়া প্রণাম করিতেই বাবাজী "জয় মা লক্ষ্মী" বলিয়া উঠিলেন। ইঁহাকে কেহ প্রণাম করিলে ইনি কখন "জয় শঙ্কর", কখনও "জয় মহাদেব", বা "জয় মা লক্ষ্মী" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সেদিন বাবাজীর সহিত যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহাই এখন বলি।

সাধু ব্যক্তিগণ যে নির্ভয়ে পাহাড়-পর্ব্বত বন-জঙ্গল ভ্রমণ ও সাধনাদি করেন, সেদিন সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল। হিংস্র বন্য জন্তুর সম্মুখে পড়িলেও সাধু মহাত্মাদিগের মনে কোনরূপ শঙ্কা বা বিকার উপস্থিত হয় না। তাঁহারা সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকেন, সেই সম্বন্ধে সেদিন অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি যখন বনে জঙ্গলে নানা স্থানে

ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন তখন, বন্য জন্তুর সম্মুখে কোন সময়ে পড়িয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—"অনেকবার।" আমরা আগ্রহের সহিত সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন যে, তিনি যখন হৃষীকেশে থাকিয়া সাধনাদি করিতেন, সেই সময় একদিন অরণ্যের পার্শ্বে পর্ব্বতের নিম্নে গঙ্গাতীরে ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন। এমন সময় বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট এক বন্য হস্তী পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিতেছিল। তিনি যেস্থানে আহার করিতে বসিয়াছিলেন তাহার দুই ধারেই জঙ্গল এবং মাঝখানে একটি সঙ্কীর্ণ পথ। সেই পথ ধরিয়াই হস্তীটী তাঁহার দিকেই ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছিল। তৎকালে তাঁহার পার্শ্বে অপর এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল, সে তাঁহাকে সাবধান করিবার নিমিত্ত ঐ সংবাদ জানাইলে তিনি বলিলেন, "তুমি এই স্থান হইতে যাইতে পার, আমার ভোজন সমাপ্ত না হইলে আমি এস্থান পরিত্যাগ করিব না।" ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি প্রস্থান করিল; বাবাজী যে স্থানে আহার করিতেছিলেন, সেই স্থানে ঐ সুবৃহৎ হস্তীটী আসিয়া থামিল এবং শুণ্ড ঈষৎ আন্দোলন করত বাবাজীকে যেন ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না,—নির্ব্বিকার-চিত্তে পূর্ব্ববৎ ভোজন করিতে লাগিলেন। হস্তীটী ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুনঃ পুনঃ শুণ্ড আন্দোলন করিতে লাগিল; তখন তিনি উহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে জানাইলেন, 'তুমি ঘুরিয়া যাও, ভোজন সমাপ্ত না হইলে আমি এ স্থান হইতে উঠিতেছি না,—হস্তী কি বুঝিল জানি না,—সে কিয়ৎকাল তথায় ঐ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অবশেষে বাবাজীকে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

বাবাজী বলিয়াছিলেন, বন্য ভল্লুক ও ব্যাঘ্র কতবার তাঁহার সম্মুখে

পড়িয়াছে। যদি সম্পূর্ণ অহিংস ও নিজের চিত্তে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত না হয়, তবে হিংস্র জন্তু দ্বারা মনুষ্যের কোন প্রকার অনিষ্ট সাধিত হয় না। অর্থাৎ যাহার অন্তরে হিংসা ও ভয় নাই, তাহাকে কেহই হিংসা করে না। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, শিকারী ব্যক্তির দর্শনে মৃগকুল শঙ্কিত হইয়া পলায়ন করিয়া থাকে, কিন্তু তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে বহুবার বন্য মৃগদিগের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন,—তাহাতে তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, তাহারা পূর্ব্ববৎ ইতস্ততঃ বিচরণপূর্ব্বক নির্ভয়ে স্বেচ্ছামত তৃণ ভক্ষণ করিতেছে,—তাঁহার উপস্থিতি সত্ত্বেও কিছুমাত্র শঙ্কিত হইয়া উঠে নাই কিংবা পলায়ন করে নাই। একদিনের এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তিনি এক অরণ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ অদূরে দেখিতে পাইলেন, একটি বন্য হরিণী তাহার সদ্যঃপ্রসূত শাবকের গাত্র-লেহন করিতেছে। তিনি উপস্থিত হওয়ায় যদিও হরিণী শঙ্কিত হয় নাই, তথাপি পাছে উহার উদ্বেগের কারণ হন এই ভাবিয়া, তিনি সত্বর সেস্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সেদিন তোতারাম নামক এক বড় সাধুর সম্বন্ধে তিনি এইরূপ গল্প বলিয়াছিলেন। তোতারাম একমাত্র কৌপীন ব্যতীত অন্য বস্ত্র আদৌ ব্যবহার করিতেন না কিংবা কখনও লোকালয়ে বাস করিতেন না। তিনি এক দিবস কোন নির্জ্জন স্থানে শয়নপূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে নিদ্রার ঘোরে এদিক ওদিক হস্ত সঞ্চালন করিতে-ছিলেন। একবার ঐরূপ হস্ত সঞ্চালন করিতেই হস্তে কোন শীতল স্পর্শ অনুভব হওয়ায় চক্ষু উন্মীলন পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন তাঁহার দেহোপরি একটি সর্প উঠিয়াছে। উহা দর্শন করিয়া তিনি পুনর্ব্বার নিরুদ্বেগচিত্তে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। যখন তিনি নিদ্রা হইতে উত্থিত

হইলেন, তখন আর সর্পটি দেখিতে পাইলেন না; সে তখন অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছিল। সর্প-দর্শনে তিনি যেমন আদৌ ভীত বা বিচলিত হন নাই, তেমনি সর্পদ্বারাও তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট হয় নাই। বাবাজীর নিকট এই গল্প-শ্রবণে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সম্বন্ধেও নিম্নলিখিত ঐরূপ একটি গল্প মনে পড়ায় তাহা তাঁহাকে শুনাইলাম।

দেওঘর হইতে প্রায় চার মাইল দূরে তপোবন নামক পাহাড়ের উপর এক দিবস শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সাধনার স্থানে তিনি ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় একবার হঠাৎ চক্ষু উন্মীলন করিতেই তিনি দেখিতে পাইলেন সম্মুখেই অদূরে একটি প্রকাণ্ড বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তিনি উহার দর্শনেও পূর্ব্ববৎ নির্ব্বিকার-চিত্তে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্বীয় কার্য্যে মনোযোগী ছিলেন। বহুক্ষণ পরে কার্য্যান্তে যখন পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিলেন, তখন দেখিলেন, সর্পটি আর তথায় নাই, অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।

যখন ঐ তপোবনে বহু বৎসরাবধি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ বাস করিতেন, সেই সময় তিনি তথায় কোন কোন সময় স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া ব্যাঘ্রকে লাড্ডু খাওয়াইয়াছেন। সেই গল্পটি আমি বাবাজীর নিকট বিবৃত করায়, তিনি আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন যে, শ্রীমৎ বালানন্দ স্বামীজিকে তিনি দর্শন করিয়াছেন এবং করণীবাগ আশ্রমে কিয়ৎ দিবস তাঁহার নিকট বাস করিয়াও আসিয়াছেন। বাবাজী বলিলেন, "তিনি ত স্বয়ং শঙ্করতুল্য ব্যক্তি।"

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের পুরাতন সেবক, তপোবনের বৃদ্ধ পাণ্ডা, মনভরণের নিকট আমরা গুরুদেবের সর্পসম্বন্ধে উল্লিখিত গল্প দুইটি শুনিয়া শ্রীশ্রীগুরুমহারাজকেই উহার সত্যতা সম্বন্ধে এক দিবস প্রশ্ন করায় তিনি সহাস্য আননে মস্তক আন্দোলনপূর্ব্বক উহা যে সত্য ঘটনা তাহা

স্বীকার করিয়াছিলেন। সাধু মহাত্মা ব্যক্তিগণ যে হিংস্র জন্তু হইতে আক্রান্ত কিংবা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হন না বা তাঁহাদের সম্মুখে পড়িলে বিচলিত অথবা ভীত হন না, ইহার জন্য আমরা বিস্ময় প্রকাশ করায় বাবাজী বলিলেন যে, এক পরমাত্মাই সর্ব্বজগৎ এবং সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। মনুষ্য যদি কায়মনোবাক্যে হিংসা এবং ভয়শূন্য নির্ব্বিকার হইতে পারে এবং কোন হিংস্রজন্তুর সম্মুখেও যদি ঐরূপ সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার অহিংস থাকিতে পারে, তবে সেই প্রতিবিম্ব ঐ হিংস্র প্রাণীর হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কারণে উহারা তাঁহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট করে না। কিন্তু আমাদের মন যদি সেই সময় কোনরূপ বিকারযুক্ত হয় অর্থাৎ মনে ভয় কিংবা হিংসা ভাবের উদ্রেক হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের মনও ঐভাবে আক্রান্ত হয় এবং তখন তাহারা আক্রমণ করিয়া থাকে। বাবাজী সেদিন বলিয়াছিলেন, যখন তাঁহারা শিখাসূত্র ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন অনেক মন্ত্রের সহিত ইহাও প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছিল যে, 'আমা হইতে যেন কোন প্রাণী উদ্বেগ না পায়, এবং আমা হইতে সকল প্রাণী অভয় প্রাপ্ত হউক' ইত্যাদি। ইঁহাদের সর্ব্বজীবের প্রতি অহিংস ভাব, প্রীতি ও করুণা-দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়।

সেদিন বহুক্ষণ সদালোচনার পর যখন আমরা বাবাজীকে প্রণাম করিয়া বাড়ী রওনা হইলাম, তখন তিনি রৌদ্রের মধ্যেই বসিয়া বেদান্ত গ্রন্থখানি খুলিয়া পুনর্ব্বার অধ্যয়নে রত হইলেন। শীত গ্রীষ্ম ইঁহারা প্রকৃতই সহ্য করিতে শিখিয়াছেন। বাবাজী পরম পণ্ডিত এবং অনেক সময় বহু শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। প্রকৃত সাধু যাঁহারা, তাঁহারা এক মুহূর্ত্তকালও বৃথা নষ্ট করেন না।

বাবাজী আর একটি কথা বলিলেন—"অনেক জন্মের নিষ্কাম কর্ম্মের

ফল দ্বারা যে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, উহার ফলই বৈরাগ্যরূপে পরে দেখা দেয়।" তিনি বলিলেন **"পূর্ণ বিশ্বাস ও গাঢ় ভক্তি এ একই** বস্তু। কারণ, পূর্ণ বিশ্বাস হইলেই তবে জীবের গাঢ় ভক্তি জন্মে। এ দুটিতে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই।"

তিনি আর একটি কথা বলিয়াছিলেন—বুলাসা নামক এক ফকির তাহার এক গুরুকে প্রশ্ন করিয়াছিল—"খোদাকো ক্যায়সা গানা?" গুরু—"ইধারসে হটানা, উধার লাগানা।"

অর্থাৎ ঈশ্বরকে লাভ করিবার এই উপায় ;—সংসার হইতে মনকে হটাইয়া সেই মন ঈশ্বরে লাগাইতে হইবে। বিষয়ে বিরক্তি এবং শ্রীভগবানে অনুরক্তি ইহাই প্রয়োজন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

১৩৩৪ সালে শারদীয়া পূজার পর আমরা যশিডি গিয়া দেখিলাম, কৈলাস অন্ধকার,—কৈলাসপতি তাঁহার জনৈক ভক্তের আহ্বানে ব্রোচ গিয়াছেন। ভক্তের নাম ডাক্তার শ্রীচন্নূলাল দেশাই। তিনি একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক। দেশবিদেশে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি স্বদেশে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। অবশেষে জনহিতার্থে সমস্ত অর্থ দান করিয়া তিনি এক্ষণে প্রকৃত সন্ন্যাসী—মহাত্যাগী। নর্ম্মদাতীরে তিনি একটী দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, প্রধানতঃ দন্তের চিকিৎসা এই স্থানে হয়। এই ত্যাগী বীরের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বাবাকে এই চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে ব্রোচ সহরে যাইতে হইয়াছিল।

বাবা ফিরিলেন—কার্ত্তিক মাসের শেষে। তখন আমরা গৃহে

ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছি। পারিবারিক কারণে বাধ্য হইয়া সে বৎসর আমাদের তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিতে হইল। বাবার সহিত আমাদের একদিন মাত্র দেখা হইয়াছিল, বাবার নব আশ্রমের নির্ম্মাণ-কার্য্য তখন শেষ হইয়াছে।

সাধুবাবা একদিন আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন যে, "যখন তিনি প্রথমে এই পাহাড়টীতে বাস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তখন অনেকে ভয় দেখাইয়াছিল যে, ও পাহাড়ে ভূত প্রেত বাস করে, তাহারা আপনাকে মারিয়া ফেলিবে। বাবা বলিলেন, কিন্তু এতদিন ধরিয়া ত এই পাহাড়ে একা বাস করিলাম, কৈ কোন বিপদ ত এ পর্য্যন্ত হয় নাই।" কৈলাস পাহাড়ের নীচে উত্তর দিকে ঠিক সম্মুখেই খানিকটা উচ্চ প্রস্তরময় স্থান আছে। তদুপরি একখানি ইষ্টকনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহ আছে। স্থানীয় ব্যক্তিগণ আসিয়া মধ্যে মধ্যে ঐখানে পূজা দেয়। মায়ের ঘরখানি আছে বলিয়া ঐ ক্ষুদ্র শিলামণ্ডিত স্থানকে সাধুবাবা "দেবীর পাহাড়" বলিয়া থাকেন। আমরা ঐ দিবস সেই গৃহখানি দেখাইয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "ঐটি কি মায়ের স্থান?" প্রত্যুত্তরে সাধুবাবা বলিয়াছিলেন, ঐ স্থানে মা আছেন, তিনি আমায় রক্ষা করিতেছেন। সাধুবাবার মুখে পূর্ব্বে কখনও ঐ প্রকার কথা শুনি নাই। সেদিন বাবার কথাটি শুনিয়া আনন্দ পাইয়াছিলাম। যদিও তিনি জ্ঞানী পুরুষ, তথাপি কোন বাক্যে কিংবা ব্যবহারে কোনরূপ নীরসতা তাঁহার মধ্যে লক্ষিত হয় না।

বাবাকে একদিন আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাবা, জ্ঞানলাভ কিরূপে হয়?"

বাবা উত্তর করিয়াছিলেন, "প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে বিবেক, বিবেক হইতে বৈরাগ্য, এবং বৈরাগ্য হইতে সন্তোষ

লাভ হয়। সন্তোষ হইতে শান্তি, শান্তি হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হয়।”

বাবার চরণে প্রণাম করিয়া বাবার উপদেশ চিন্তা করিতে করিতে আমরা বিদায় লইলাম।

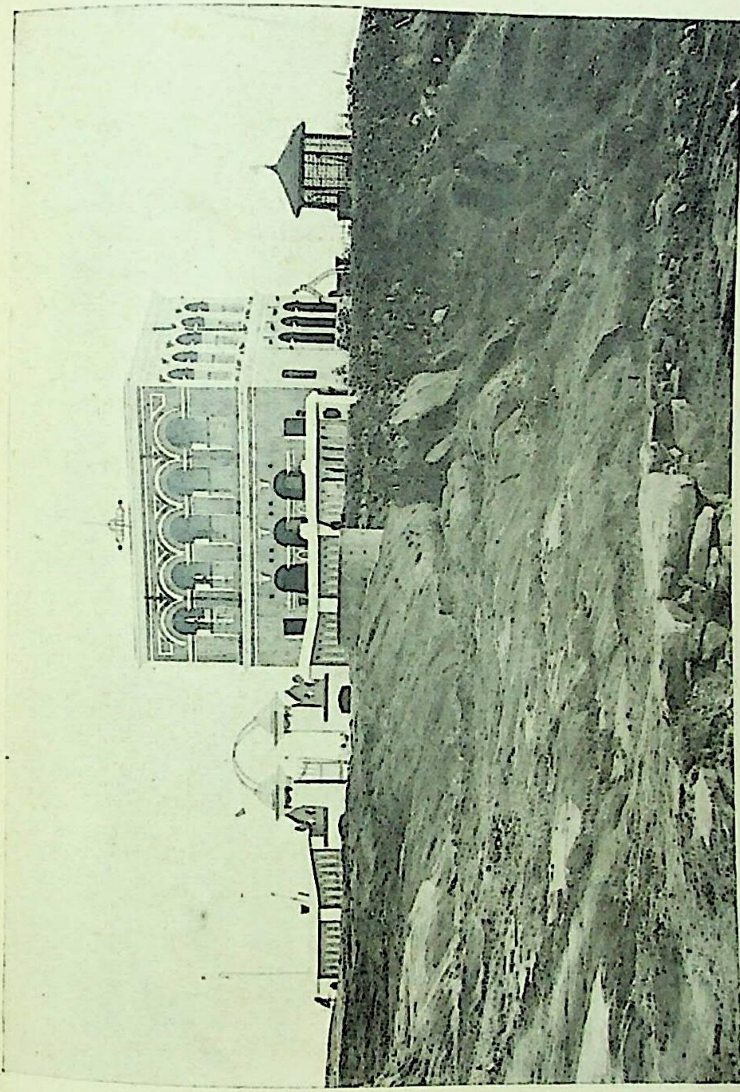
তৃতীয় তরঙ্গ

১৩৩৫ সালে যশিডিতে আবার আসিলাম। কিন্তু এবার পূজার পূর্ব্বে—আশ্বিন মাসে। আসিয়াই বাবাকে প্রণাম করিতে কৈলাসে গেলাম। কিন্তু বাবার দর্শন পাইলাম না। অন্যান্য সেবকদের মুখে শুনিলাম বাবা কোন ভক্তের আমন্ত্রণে দেওঘর গিয়াছেন। বাবার আসনকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলাম। তারপর কয়েকদিন অবিরাম বৃষ্টি—গৃহের বাহির হইতে পারি নাই।

বৃষ্টি থামিলে আমরা আবার কৈলাসে গেলাম। চারিদিকে গাছ-পালার ধূলা ধুইয়া গিয়াছে, মলিনত্ব নষ্ট হইয়াছে, প্রকৃতির স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা কৈলাসের যাত্রী, আমাদের অন্তরের মল কি ধুইয়া যাইবে না?—আমাদের স্বরূপমূর্ত্তি কি প্রকাশ পাইবে না?

বাবার দর্শন পাইলাম। তিনি আমাদের দেখিয়া সানন্দে “হরিহর” বলিয়া উঠিলেন। নূতন আশ্রমের দ্বিতলের বারান্দায় লইয়া গিয়া বসাইলেন। পুরাতন আশ্রমের কোন চিহ্ন নাই। আমরাই যা' পুরাতন। কিন্তু আমাদের মন বুঝি পুরাতন নয়—সাধু সঙ্গে মনের ভাব নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; হয়ত একদিন গুরুকৃপায় পুরাতনের কোন চিহ্নই থাকিবে না।

বাবা একটু উচ্চ চত্বরের উপর মৃগ-চর্ম্মাসনে বসিলেন, আমরা



সকলে তাঁহার নিকটে বসিলাম। গ্রাম্য কথায় কিছু কাল অতীত হইলে পর বাবা জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন,—এই শরীর হইল মহল, সেই মহলের রাজা হইতেছে অহঙ্কার; শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ হইতেছে রাজার পারিষদ্ বা সভাসদ্; বুদ্ধি নর্ত্তকী এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি) বাজনদার। আত্মা দীপকস্বরূপ সেই সভায় প্রকাশমান, কিন্তু তিনি নৃত্যগীত হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, অসঙ্গ। যেরূপ মহাকাশ সর্ব্বব্যাপক হইয়াও কোন পদার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন, সেইরূপ আমাদের আত্মাও নির্লিপ্ত—পাপ-পুণ্যাদি কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

বাবা আরও বলিলেন, রঙ্গমঞ্চে কেহ রাজা সাজে, কেহ রাণী, কেহ সেবক, কেহ ঝাড়ুদার, কিন্তু সেজন্য তাহাদের কোন প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তাহারা সকলে মনে মনে স্থির জানে যে, তাহারা কিছুকালের জন্য অভিনয় করিতেছে মাত্র। সেইরূপ আমরা সংসার-নাট্যশালায় কিছুদিনের জন্যে নানা সাজে সাজিয়া ক্রীড়া করিতেছি মাত্র। অভিনয় সমাপ্ত হইলে আমরা ফিরিয়া যাইব। সংসারে এই অভিনেতা রূপ নকল অভিমান লইয়া সকল কর্ত্তব্যাদি ঠিক মত করিয়া যাইতে হইবে। এখন আমি যাহা সাজিয়াছি প্রকৃত পক্ষে আমি তাহা নই। এখন আমাকে যে নামে সকলে ডাকিতেছে, উহা কেবল কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত। দেহটীকে নাম দেওয়া হইয়াছে; এই নাম বা দেহ আমি নই। আমি সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ। আমার শরীরের বিনাশ আছে, কিন্তু আমার বিনাশ নাই। আমি অক্ষয়, অমর, অবিনশ্বর।

বাবা একটী কবিতা বলিলেন; যথা—

"দীনতাকো ত্যজ নর আপন স্বরূপ দ্যাখ্।
তু'ত শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ দৃশ্যকো প্রকাশিয়ে॥

আপ্‌নে অজ্ঞান্‌সে জগৎ সব তুঁহি রচে।
সর্ব্বকো সংহার কার আপ্‌ অবিনাশী হ্যায়॥
মিথ্যা প্রপঞ্চ দেখ, দুঃখ যেন্‌ আন্‌জিয়ে।
দেবন্‌কো দেব তুঁত আপ্‌ সুখ রাশিহেঁ॥
জীব জাগো ঈশ হৈ মায়াসে প্রভাসে তুঁই
যেয়সে রজ্জু সাঁপ সিপো রূপ হৈয় প্রভাসিয়ে॥"

ইহার মর্ম্ম এই যে, হে নর, তুমি দীনতা ত্যাগ করিয়া নিজের স্বরূপ দেখ। তোমার স্বরূপ হইতেছে, মায়া-অবিদ্যা-বিবর্জ্জিত শুদ্ধ বুদ্ধ নিরঞ্জন আত্মা। তুমি ব্রহ্ম, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক; তুমি অজ, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-বিরহিত। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ ইহার দ্রষ্টা তুমি—তুমি জগৎ নহ। তুমি অজ্ঞানতাবশতঃ জগৎ রচনা করিয়াছ; অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা, তুমি মায়াচ্ছন্ন হইয়া মনে করিতেছ ইহা সত্য। তুমি অবিনাশী ব্রহ্ম, তুমি দেবতার দেবতা, অর্থাৎ তুমি দেবেরও প্রকাশক। যেমন রজ্জু সর্পরূপে, সিপা (ঝিনুক) রৌপ্যরূপে মনুষ্যের ভ্রম উৎপন্ন করে, মায়াবদ্ধ জীব সেইরূপ ভ্রমে পড়িয়া মনে করে জগৎ সত্য, দেহের সহিত তাহার লয়প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু বস্তুত আত্মার নাশ নাই।

জিজ্ঞাসিত হইয়া বাবা আরও বলিয়াছিলেন, রাগ ও দ্বেষ নিবৃত্তি করিবার দুইটী উপায় আছে; প্রথম সমদৃষ্টি, দ্বিতীয় সমবৃত্তি। সমদৃষ্টি অর্থে সর্ব্বে আত্মদৃষ্টি—"সব্‌মে একই আত্মা হ্যায়"—এই দৃষ্টি-প্রভাবে সকল জীবকে সমান ভাবে দেখা। আর সমবৃত্তির অর্থ, সকল জীবের প্রতি ঘৃণা দ্বেষ বর্জ্জনপূর্ব্বক একত্র আহার বিহার। ঘটে ঘটে পরমাত্মাই বিরাজ করিতেছেন, এই বুদ্ধিতে সর্ব্বজীবকে দর্শন করা ও তদ্রূপ ব্যবহার করা সমবৃত্তির উদ্দেশ্য।

আর এক দিন বাবা উন্মুক্ত চৌতারার উপর বসিয়া আমাদের বলিয়াছিলেন, এই যে প্রস্তরপার্শ্বে তৃণগুচ্ছ রহিয়াছে, উহা কর্ত্তনপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিলেও বর্ষাগমে বারিবর্ষণে উহার মূলদেশ হইতে যেরূপ পুনরায় অঙ্কুরোদ্গম হইবে, সেইরূপ জীবগণ এ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই মরধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেও, পূর্ব্ব কর্ম্মফলে পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

"বাবা, কিরূপে তবে এই গতায়াত বন্ধ হইবে ?"

"মূলচ্ছেদ হইলেই বন্ধ হইবে। তৃণের মূল উৎপাটিত হইলে যেরূপ পুনরায় অঙ্কুর-উদ্গমের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ বাসনা-রহিত হইলে জীবকে আর জন্ম লইতে হয় না।"

"কিরূপে বাবা, বাসনা-রহিত হওয়া যায় ?"

"ব্রহ্ম-অভ্যাস দ্বারা। এই অভ্যাস দ্বারা চিত্তভূমি যেমন ক্রমে শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়া আসিবে, বাসনার বীজও তেমনি মনোমধ্যে বর্ষণ-অভাবে শুষ্ক ও নষ্ট হইয়া যাইবে। চিত্ত নির্ম্মল ও শুদ্ধ হইলে জ্ঞানালোক তথায় ফুটিয়া উঠিবে। জ্ঞানের উদয়ে কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইবে; বাসনার ধ্বংস হইবে।"

সাধুবাবা একদা বলিয়াছিলেন, এক বৈরাগী সাধুর আশ্রমে একটী গাভী ছিল। সুতরাং তাহাকে বাঁধিবার জন্য একটা রজ্জু ছিল। একদা রাত্রিতে ঐ রজ্জুর ছিন্নাংশ অন্ধকারময় গোশালার একস্থানে মাটীর উপর পড়িয়াছিল। সাধুর জনৈক শিষ্য অস্পষ্টালোকে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিল। আতঙ্কে সে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং উচ্চৈঃস্বরে গুরুকে জানাইল গোশালায় সর্প প্রবেশ করিয়াছে। গুরু নিকটে এক কুটীরে ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভয় নাই, বল বদ্রিনারায়ণজীকি জয়।" শিষ্য আদিষ্ট হইয়া তাহাই করিল, কিন্তু

সর্প অর্থাৎ রজ্জু সরিল না। শিষ্য কহিল, "সাপ যাচ্ছে না।" সাধু কহিলেন, "বল জগন্নাথজীকি জয়।" শিষ্য তাহাই করিল, কিন্তু সর্প নিশ্চল। গুরু তখন কহিলেন, "বল সর্ব্বদেবদেবীর জয়।" শিষ্য একে একে সকল দেব-দেবীর জয় উচ্চারণ করিল, কিন্তু সর্প নিষ্কম্প। গুরু তখন উপদেশ দিলেন, "তুমি পঞ্চোপচারে নাগ-দেবতার পূজা কর।" শিষ্য পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা নাগ-দেবতার পূজা করিল, কিন্তু সর্প যথাস্থানে পড়িয়া রহিল—অন্তর্দ্ধানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তখন সাধুও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন; তিনি ব্যস্ত হইয়া গোশালায় আসিয়া অস্পষ্টালোকে দেখিলেন, সত্যই একটা সর্প গাভীর সন্নিকটে শায়িত রহিয়াছে। একটা আলো আনিতে শিষ্য আদিষ্ট হইল। সেই আলোর সাহায্যে উভয়ে তখন দেখিলেন, সেটা সর্প নয়—রজ্জু মাত্র। তখন তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন।

ইহা বলিয়া বাবা আমাদের বুঝাইলেন যে, জ্ঞান-দীপক ব্যতীত অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবার নয়। সর্ব্ব দেবদেবীর জয়ধ্বনি অথবা পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা পূজা করিলেও মোহ বা অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হইবার নয়। যখন সাধন দ্বারা পরা বিদ্যা বা আত্মজ্ঞানের দীপক জ্বলিবে, তখন অন্তরমধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। এই অজ্ঞানতাই ভ্রম, আর ভ্রম দূর হয় জ্ঞানের দ্বারা।

বাবা একদিন বলিয়াছিলেন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ—এই পনরজন হইলেন ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ, ইঁহারা "যজ্ঞকরনে-ওয়ালা।" মন ইঁহাদের যজমান, আর বুদ্ধি হইল যজমান-পত্নী। মোট এই সতের জনের উপদেষ্টা হইলেন আত্মা। মন ও বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া বাকি পনর জন স্ব স্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। আত্মা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকিয়া এই পনর জন ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণের কার্য্যাকার্য্য

দর্শন করেন, কিন্তু স্বয়ং অনাসক্ত, নির্লিপ্ত। নিদ্রা বা সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগরণ এই তিন অবস্থারও দ্রষ্টা হইতেছেন আত্মা, কিন্তু এ স্থলেও তিনি নির্লিপ্ত।

বাবা একদা বলিয়াছিলেন, বৃদ্ধ পাঁচ প্রকার; যথা,—বয়োবৃদ্ধ, জাতিবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও কুলবৃদ্ধ। যে বড়, তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য; সম্মানীকে সম্মান না দেখাইলে অপরাধ হয়।

চতুর্থ তরঙ্গ

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন আচার্য্য মহাশয় দেওঘরে নিজ বাটীতে বাস করিতেন। তিনি এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় ৺কাশীধামে বাস করিতেছেন। তিনি বহুকাল বিষয়-কার্য্য করিয়া এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধ, সংযমী, ভক্ত ও সাধক। এক দিবস তিনি কন্যাসহ আমাদের সহিত কৈলাসে গিয়াছিলেন। বাবা আমাদের দেখিয়া 'হরিহর' বলিয়া উঠিলেন। বাবার মুখে সততই হরিহর। কাহারও মৃত্যু ঘটিলে বাবা বলিবেন—'উস্কো হরিহর হো গিয়া'; কেহ আনন্দে মত্ত থাকিলে বাবা বলিবেন, 'ওহ হরিহরমে মজ্‌গুল্।' কেহ আসিয়া প্রণাম করিলে তাহাকে 'হরিহর' বলিয়া অভ্যর্থনা করেন; কেহ বিদায় লইলেও তাহাকে 'হরিহর' বলিয়া বিদায় দিয়া থাকেন।

সে যাই হউক, আমরা উপরের বারান্দায় মাদুরের উপর বসিলাম। বাবা যথাপূর্ব্ব তাঁহার মৃগচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট। অনেক কথা হইল, বাবা অনেক উপদেশ দিলেন। অতঃপর আচার্য্য মহাশয় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। বাবা কহিলেন, 'প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যেৎনা

বাঢ়ায়ে গা ওৎনাই বাঢ় যায়ে গা।' বলিয়া তিনি একটি উপাখ্যান বলিলেন, যথা,—

কোন সময়ে এক বড় সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত, এবং বহু সামন্ত নৃপতি তাহার অধীনে ছিলেন। একদা তিনি তাঁহার প্রধান সচিবকে ডাকিয়া কহিলেন, "সাম্রাজ্য পরিদর্শন করিবার বাসনা করিয়াছি, আপনি তাঁহার যথাযথ ব্যবস্থা করুন।"

সচিব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সহিত কত অনুচর থাকিবে?"

সম্রাট্—"আমার পদের উপযুক্ত যত লোক ও সৈন্যাদি লইয়া যাওয়া প্রয়োজন তত অনুচর থাকিবে।"

সচিব তদনুরূপ ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া সম্রাট্ একদিন তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সচিব কহিলেন, "শাহান শা, ভারবাহী উষ্ট্রের যথোপযুক্ত সংখ্যা এখনও সংগৃহীত হয় নাই। পঞ্চাশ লক্ষ উষ্ট্র সংগৃহীত হইয়াছে, আরও পঞ্চাশ লক্ষ প্রয়োজন। এক কোটী উষ্ট্র প্রয়োজন আপনার রসদ বহিবার জন্য।" কিছুকাল পরে উপযুক্ত আয়োজন সমাপ্ত হইল; সম্রাট্ তখন বহুলক্ষ অনুচরসহ রাজ্যভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তাঁহার বিশাল রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে তিন বৎসর অতিবাহিত হইল। তিন বৎসর পরে তিনি স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একদা রাজা নিভৃতে তাঁহার কক্ষমধ্যে বসিয়া তাঁহার সুখ-সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার কোন বস্তুরই অভাব নাই,—সুবিশাল সাম্রাজ্য, অনুরক্ত প্রজা, অনুগত পুত্র, সুরূপা গৃহভূষণা পতিব্রতা মহিষী, পূর্ণ ধনাগার, অসংখ্য অনুচর, সর্ব্বোপরি

তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ ও অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য—সকলই তাঁহার আছে। মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহা কিছু কাম্য হইতে পারে সকলই তাঁহার আছে; ভোগও তিনি যথেষ্ট করিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, "পৃথিবীতে যাহা কিছু কাম্য, উপভোগ্য, তাহা আমি পাইয়াছি,যথেষ্ট ভোগও করিয়াছি। ভোগে কি সুখ তাহা আমি জানিয়াছি। এক্ষণে দেখিতে বাসনা হয় ত্যাগে কি সুখ। সাধু ফকির সমস্ত ত্যাগ করিয়া মনের আনন্দে যে ঘুরিয়া বেড়ান, তাহা উপভোগ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি সমস্ত ত্যাগ করিয়া ফকিরি গ্রহণ করিব।"

কিয়দ্দিবস মধ্যে সম্রাট্ তাঁহার বাসনা কার্য্যে পরিণত করিলেন। রাজ্য সিংহাসন স্ত্রী পুত্র সমস্ত ত্যাগ করিয়া রাজধানী হইতে বহুদূরে এক নদী-কূলে নির্জ্জন ও,পবিত্র স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কাহাকেও সঙ্গে আনেন নাই, যাহারা আসিতে চাহিয়াছিল, তাহাদেরও নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বস্ত্র, আহার্য্য, অর্থ কিছুই সঙ্গে আনেন নাই। দিবসে একবার ভিক্ষার্থে বহির্গত হইতেন; এবং ভিক্ষা-লব্ধ তণ্ডুল একটী মৃন্ময় পাত্রে সিদ্ধ করিয়া অপরাহ্ণে তাহাই গ্রহণ করিতেন। অবশিষ্ট সময় তিনি ভগবৎ আরাধনায় অতিবাহিত করিতেন। করতল ভোজ্যপাত্র, আশ্রয় বৃক্ষতল।

দিনের পর দিন এইরূপে অতিবাহিত করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইল। তিনি তখন বুঝিলেন, যাহার মনে সদা সন্তোষ বিরাজ করে, বাসনা নাই, কামনা নাই, সেই প্রকৃত সম্রাট্; যাহার ভয় নাই, সে সম্রাটের চেয়েও বড়—শাহান সা বাদসা। তিনি আরও বুঝিলেন, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ—ভোগে নয়। এইরূপে তিনি দিনের পর মাস, মাসের পর বর্ষ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এদিকে সামন্ত নৃপতিগণ তাঁহাদের সম্রাটকে দেখিবার বাসনা

করিলেন। তাঁহারা শুনিয়াছেন, তিনি রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া ফকিরি লইয়াছেন। কিন্তু কোন্ নিভৃত স্থানে তিনি অবস্থান করিতেছেন তাহা তাঁহারা অবগত ছিলেন না। বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহার সংবাদ পাওয়া গেল। নৃপতিগণ ইচ্ছা করিলেন, তাঁহাদের সম্রাটকে একবার দর্শন করেন—সেই মহাপ্রভাবশালী মহাভোগী সম্রাট্ কিরূপে অরণ্য মধ্যে নির্জ্জনে নিঃসহায় অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন ইহা, একবার দেখিয়া আসেন। কিন্তু তাঁহার বিনানুমতিতে তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সাহস না করিয়া তাঁহারা কোন প্রবীণ ব্যক্তিকে দূতস্বরূপ অগ্রে প্রেরণ করিলেন। সম্রাট্ অনুমতি দান করিলেন।

একদা অপরাহ্নে সম্রাট্ যখন মৃন্ময় পাত্রে অন্ন সিদ্ধ করিয়া ভোজনে বসিবার উপক্রম করিতেছেন, তখন সামন্ত রাজগণ অদূরে দেখা দিলেন। সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ আহার্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ইত্যবসরে এক কুকুর সম্রাট্ প্রভৃতি সকলকে অসতর্ক দেখিয়া অন্নপূর্ণ মৃন্ময় পাত্রটী মুখে করিয়া পলায়ন করিল। সকলেই তাহা দেখিলেন। সম্রাটের পার্শ্ব দিয়া কুকুর যখন ছুটিয়া যায়, তখন তিনি একটু হাসিলেন। নৃপতিগণ হায় হায় করিয়া উঠিলেন; তাঁহারা জানিতেন সাধু ফকির দ্বিতীয়বার ভিক্ষার্থে গমন করেন না। সুতরাং অদ্য তাঁহাকে উপবাসে থাকিতে হইবে। কিন্তু সম্রাট্ কেন হাসিলেন তাহা জানিবার জন্য তাঁহারা কৌতূহলী হইলেন। সম্রাট্ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন, আমি যখন পূর্ব্বাশ্রমে প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিতাম, তখন আমার রসদ বহিবার জন্য এক কোটী উষ্ট্রের প্রয়োজন হইয়াছিল, আর আজ বর্ত্তমান আশ্রমে নিবৃত্তিমার্গে অবস্থানকালে একটী ছোট কুকুর আমার রসদ-বহনে সমর্থ হইয়াছে—ইহা দেখিয়া আমি হাসিয়াছিলাম।

গল্প শেষ করিয়া বাবা কহিলেন, ভোগ এইরূপে কমান যায়।

আবার প্রবৃত্তি বাড়ানও যায়; ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা আর একটি গল্প বলিলেন। এক দরিদ্র ব্যক্তি চিন্তা করিল, সে যদি সহস্র মুদ্রা পায় তাহা হইলে সে নিশ্চিন্তমনে ভগবৎ আরাধনা করিতে সমর্থ হয়। ভগবান্ তাহাকে সহস্র মুদ্রাই দিলেন। তখন সে দশ সহস্র, দশ সহস্র প্রাপ্ত হইলে লক্ষ, লক্ষ-প্রাপ্তির পর জমিদারী, রাজ্য এইরূপ কামনা করিয়া চলিল। ভগবান্ একে একে তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ করিলেন। কিন্তু রাজ্য পাইয়াও তাহার কামনার অন্ত নাই; ক্রমে সে দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব চাহিল। তাহা পাইয়াও সে তৃপ্ত হইল না,—তখন সে ব্রহ্মত্ব চাহিয়া বসিল। ভগবান্ তখন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'পুনর্মূষিকো-ভব। তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তি আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। যথা,—

নিঃস্বো বষ্টি শতং, শতী দশশতং, লক্ষং সহস্রাধিপঃ,
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং, ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং, সুরপতি র্ব্রাহ্মং পদং বাঞ্ছতি,
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং, বিষ্ণুঃ শিবপদং ত্বাশাবধিং কো গতঃ।

বাবা গল্প শেষ করিয়া আমাদিগকে বুঝাইলেন, একমাত্র সন্তোষ অভ্যাস দ্বারা সুখলাভ ঘটিয়া থাকে; জীবের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, সুতরাং তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রবৃত্তির ফল দুঃখ, কেন না, তাহার অনেক বন্ধন, বাসনা জীবকে বাঁধিয়া রাখে। যতদিন না নিবৃত্তি আসে ততদিন সে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে না। যে জীবের নিবৃত্তি আসিয়াছে, তাহার অন্তরে সন্তোষ বিরাজ করে, সেই বন্ধন-মুক্ত—সম্পূর্ণ স্বাধীন। স্বাধীনতার ফল শান্তি, আর বদ্ধাবস্থার ফল তদ্‌বিপরীত।

তারাপ্রসন্নবাবু কহিলেন, 'বুঝিলাম ত সব, কিন্তু মানব-মন বুঝিয়াও

বুঝে না। কিরূপে বাসনার লোপ হয় তাহা দয়া করিয়া উপদেশ করুন।'

এই বাসনা কামনা লইয়াই ত সব। শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব বলিয়াছেন, আমিত্ব ও কামনা নাশ হইলেই নির্ব্বাণ। তাঁর আগে উপনিষদ্ উপদেশ করিয়াছেন—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ *

কামনা লইয়াই যত গোল। কি করিলে কামনার নাশ হয়? বাবা উত্তর করিলেন, "বস্তুবিচার দ্বারা কামনার নাশ সম্ভব। বিবেকযুক্ত বিচারপরায়ণ হইয়া নিয়ত চলিলে বুঝিতে সমর্থ হইবে যে, মায়িক বস্তুদ্বারা যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষণস্থায়ী—তাহা প্রকৃত সুখ নয়—সুখাভাস মাত্র। নকল রত্ন পাইয়া জীব যেমন অনেক সময় উহাকে প্রকৃত রত্ন-বোধে ভ্রমান্ধ থাকে, তেমনি জীবও অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী মায়িক সুখকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া গ্রহণ করে। যখন উপযুক্ত সৎসঙ্গ ও সাধনাদি দ্বারা মনের অজ্ঞানতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইবে, তখন কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজেই বুঝিতে পারিবে, কোন্ বস্তু মায়িক, আর কোন্ বস্তু নিত্য।" এই বলিয়া বাবা নকল রত্ন নামক একটী সুন্দর গল্প শুনাইলেন। উহা "কুম্ভমেলা ও সাধুসঙ্গ" নামক গ্রন্থের ১৯০ পৃষ্ঠায় আছে।

সেদিন বাবা আমাদিগকে এইরূপ অনেক উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

---

* হৃদয়স্থিত কামনারাশি যখন বিলীন হইয়া যায়, তখনই মর্ত্ত্যজীব অমৃতত্ব লাভ করে; এবং এই জীবনেই (ইহলোকেই) তিনি ব্রহ্মলাভ করেন। (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন) ॥—বৃহদারণ্যক।

পঞ্চম তরঙ্গ

আর এক দিবস বাবা আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, কার্য্য করিয়া বা কোন উপকার করিয়া কাহারও নিকট হইতে পুরস্কারের আশা করিতে নাই। প্রত্যুপকার বা পুরস্কারের প্রত্যাশা না করিয়া কাজ করিয়া গেলে পরিণামে সুফল লাভ হয়। মনে কর এক ব্যক্তির দুইটি ভৃত্য আছে; প্রথম ভৃত্য মাসান্তে প্রভুকে বেতনের জন্য তাগাদা দেয়; অপর ভৃত্য বেতন চায় না, প্রভু দিতে আসিলেও লয় না, বলে, আপনার নিকট জমা থাক্, আমার নিকট থাকিলেও যা,' আপনার নিকট থাকিলেও তাই। বল দেখি প্রভু কোন্ ভৃত্যের প্রতি সদয় হইবেন? জগৎপিতাও আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন যদি আমরা আমাদের কর্ম্মের পুরস্কার তাঁহার নিকট প্রার্থনা না করি।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, দান করিয়া বা কোন সৎকর্ম্ম করিয়া কোন ফলাশা করিতে নাই। এই সম্বন্ধে মহাসাধিকা রাবেয়ার একটি উক্তি লিপিবদ্ধ আছে। তাহা এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদা রাবেয়ার ক্ষুদ্র কুটীরে এক সাধু আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহে মাত্র দুইখানি রোটী। এমন সময় এক ভিখারিণী আসিয়া কুটীর দ্বারে দাঁড়াইল এবং কিছু আহার্য্য চাহিল। রাবেয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে রোটী দুইখানি দিলেন। অতিথি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন; গৃহে সম্বল ছিল, মাত্র দুইখানি রোটী, তাহাও দান করা হইল। কিছুক্ষণ পরে একটী স্ত্রীলোক কয়েকখানি রোটী আনিয়া রাবেয়ার চরণসমীপে রক্ষা করিল; কহিল, আমার প্রভু-পত্নী আপনার সেবার্থে

পাঠাইয়া দিয়াছেন। রাবেয়া রোটীর সংখ্যা গণনা করিলেন। অতঃপর দাসীকে কহিলেন, তুমি রোটী ফেরৎ লইয়া যাও, তোমার প্রভুপত্নীকে বলগে, রোটী কম হইয়াছে। দাসী ফেরৎ লইয়া গেল এবং কিছুকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া আবার রোটীর পাত্র রাবেয়ার সম্মুখে রক্ষা করিল। রাবেয়া পুনরপি গণনা করিলেন; অবশেষে কহিলেন, এইবার ঠিক হয়েছে—তুমি যাও। দাসী বিদায় হইলে অতিথি জিজ্ঞাসু নয়নে রাবেয়ার পানে চাহিলেন। রাবেয়া উত্তর করিলেন, যাহা দান করা যায় তাহার দশগুণ ঈশ্বর দিয়া থাকেন। আমি দুইখানি রোটী দিয়াছিলাম, তাহার স্থানে বিশখানি রোটী প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। দাসী প্রথমে আনিল আঠারখানি—দুই খানি কম ছিল—আমি ফেরৎ দিলাম। পরে সে আনিল বিশ খানি।

এ স্থলে দেখা যায় পুরস্কারের প্রত্যাশা করিয়া দান। বাবার উপদেশ, পুরস্কারের কোন প্রত্যাশা করিয়া কার্য্য করিও না—নিষ্কাম ভাবে কার্য্য করিয়া যাইবে।

বাবার আর একটি উপদেশ,—মনে সতত সন্তোষ রাখিবে। যেখানে বিষাদ সেখানে ঈশ্বর আসেন না; তিনি আনন্দময়, আনন্দই দেখিতে চান। বিষাদকে মনে স্থান দিলে আমরা তাঁহা হইতে 'জুদা' হইয়া যাই। গুরুমহারাজও আমাদের মনকে সতত সন্তোষ ও শান্তিপূর্ণ রাখিতে উপদেশ দান করেন। তিনি বলিয়া থাকেন—"শান্তিখড়্গো হস্তে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জ্জনঃ।"

বাবা বলিতেছিলেন, মানুষ মায়াতে এতই আবদ্ধ যে, অন্তরের সহিত তাঁহাকে বড় বেশী লোক চাহে না। তাঁহার দর্শনাভাবে বড় কেহ যে কাতর ও বিষণ্ণ তাহা মনে হয় না। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটা দৃষ্টান্ত দিলেন। কোন এক স্থানে এক যোগী আসিয়াছেন

শুনিয়া বহুলোক তাঁহার দর্শনার্থে গমন করিল। ঐ সকল ব্যক্তি নিষ্কামভাবে তাঁহার দর্শনার্থে আসিয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পথের উপর পয়সা বর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন। বহু ব্যক্তি পয়সা কুড়াইয়া লইয়া বোঝা সহ গৃহে ফিরিল। যে সকল ব্যক্তি পয়সার মোহ না ভুলিয়া অগ্রসর হইল, তাহাদের সম্মুখে রৌপ্যমুদ্রা বর্ষিত হইল। রৌপ্যমুদ্রা কুড়াইয়া অনেকেই গৃহে ফিরিল—সাধুর কথা ভুলিয়া গেল। আবার যে কয়েক জন টাকার মোহে না ভুলিয়া অগ্রসর হইল, তাঁহাদের সম্মুখে স্বর্ণমুদ্রা বর্ষিত হইল; স্বর্ণ মুদ্রা কুড়াইয়া নিজেদের ভাগ্যবান্ মনে করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গৃহে ফিরিলেন। স্বর্ণের আকর্ষণেও মুগ্ধ না হইয়া যাঁহারা সাধু-দর্শন কামনায় অগ্রসর হইলেন, তাঁহাদের সম্মুখে পথের উপর বর্ষিত হইল মণিমুক্তা। মণিমুক্তার আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া যে দুই এক জন বুদ্ধিমান্ ও নির্লোভ ব্যক্তি অগ্রসর হইলেন, তাঁহারা অবশেষে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি মায়াসিদ্ধ যোগিবরকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

অতঃপর বাবা আমাদিগকে ইহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন; কহিলেন, এই মায়াসিদ্ধ যোগিরাজ হইলেন স্বয়ং শ্রীভগবান্; পয়সা, সাধারণ সুখ; রৌপ্যমুদ্রা, সাধারণ বৈভব; সুবর্ণ, রাজ্যসম্পদ্; মণিমুক্তা, স্বর্গসুখ। বাবা বলিলেন, এই যে সাংসারিক সুখের আসক্তি, রাজ্যসম্পদ্, ঐশ্বর্য্য বৈভব ক্ষমতা প্রতিপত্তি, স্বর্গাদি-লাভের কামনা, ইহা জীব সাধারণতঃ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। আর এই সকল মায়িক বস্তুর মোহে ডুবিয়া মানব শ্রীভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারে না। যে সকল বিবেকী পুরুষ আসক্তিশূন্য হইয়া মনকে নির্ম্মল করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে সমর্থ।

প্রকৃত অনাসক্তি ও আসক্তির মধ্যে প্রভেদ কতখানি তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা আমাদের একটী গল্প বলিলেন,—কোন এক ধনী শেঠের সহিত এক মোহান্তের পরিচয় ছিল। শেঠ ছিলেন সংসারাসক্ত ব্যক্তি, ও মোহান্ত ছিলেন সম্পূর্ণ অনাসক্ত। কিন্তু উভয়েই ধনী—ঐশ্বর্য্য জমীজমা উভয়েরই সমান। শেঠের স্ত্রীপুত্র ছিল, মোহান্তের শিষ্য-শিষ্যা ছিল, প্রভেদ এইটুকু। একদা শেঠ, উদাসীন মোহান্তের নিকট উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাতে আমাতে প্রভেদ কি ? আপনার যেমন ধন জন শিষ্য শিষ্যা ঐশ্বর্য্যাদি আছে, আমারও তেমনি ধন জন স্ত্রীপুত্র, বিভব ইত্যাদি আছে। তবে আমাদের মধ্যে পার্থক্য কি ?

প্রশ্ন শুনিয়া মোহান্ত একটু হাসিলেন, উত্তর করিলেন না ; শেঠজী পীড়াপীড়ি করাতে কহিলেন, একদিন তাহা বুঝিবে।

কিছুকাল পরে শেঠ বহু লাভের প্রত্যাশায় বিদেশে মাল কিনিবার অভিপ্রায় করিলেন। সমুদ্রকূল হইতে মাল আনিতে হইবে ; তদভিপ্রায়ে জাহাজ ভাড়া করিলেন। কিন্তু জাহাজ পূর্ণ করিয়া মাল আনিতে হইলে তাঁহার সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়। এজন্য তিনি মোহান্তের নিকট আসিয়া প্রস্তাব করিলেন, আপনি অর্দ্ধেক অর্থ দিন, অর্দ্ধেক আমি দিব ; লভ্যাংশ আমরা তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া লইব। মোহান্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধনাগার হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ বাহির করিয়া দিলেন। এই বিপুল অর্থ লইয়া কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি জাহাজে চড়িয়া বিদেশে যাত্রা করিল।

বিদেশ হইতে সংবাদ আসিল জাহাজপূর্ণ মাল আসিতেছে ; তারপর সংবাদ আসিল জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। শেঠজী এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং শোকসন্তপ্তচিত্তে

মোহান্তকে সংবাদ দিতে আসিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে—সব গিয়াছে।

মোহান্ত হাসিয়া কহিলেন, পরমাত্মার ইচ্ছায় গিয়াছে; সে জন্য তুমি এত বিচলিত হইতেছ কেন? জাহাজই ডুবিয়াছে, তুমি ত ডুব নাই।

শেঠ শান্ত হইলেন না; কহিলেন, তুমি বুঝিবে না আমার কি ক্ষতি হইয়াছে। তোমার কি? তোমার ঐশ্বর্য্য গেলে তুমি কৌপীন আঁটিয়া ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিবে; কিন্তু আমি যে নিরুপায়।

কয়েকদিন পরে সংবাদ আসিল, পূর্ব্ব সংবাদ মিথ্যা, জাহাজ ডুবে নাই—সত্বরই বন্দরে পৌঁছিবে। শেঠজী আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া মোহান্তকে সংবাদ দিতে ছুটিলেন। সংবাদ পাইয়া মোহান্ত যে কিছুমাত্র আনন্দিত হইলেন, তাহা বুঝা গেল না। তিনি কেবলমাত্র কহিলেন, পরমাত্মার ইচ্ছা।

তখন শেঠজী বুঝিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়। শেঠজী ভক্তির সহিত অনাসক্ত পুরুষকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

বাবা গল্পটী শেষ করিয়া একটী দোঁহা বলিলেন—

ব্রহ্মজ্ঞানী সদা নির্লেপ।
যৈসে জল্‌মে কমল অলেপ॥

অর্থাৎ জলে থাকিয়াও কমল পুষ্প যেমন জলে অলিপ্ত, ব্রহ্মজ্ঞানীও তদ্রূপ সততই নির্লিপ্ত বা অনাসক্ত।

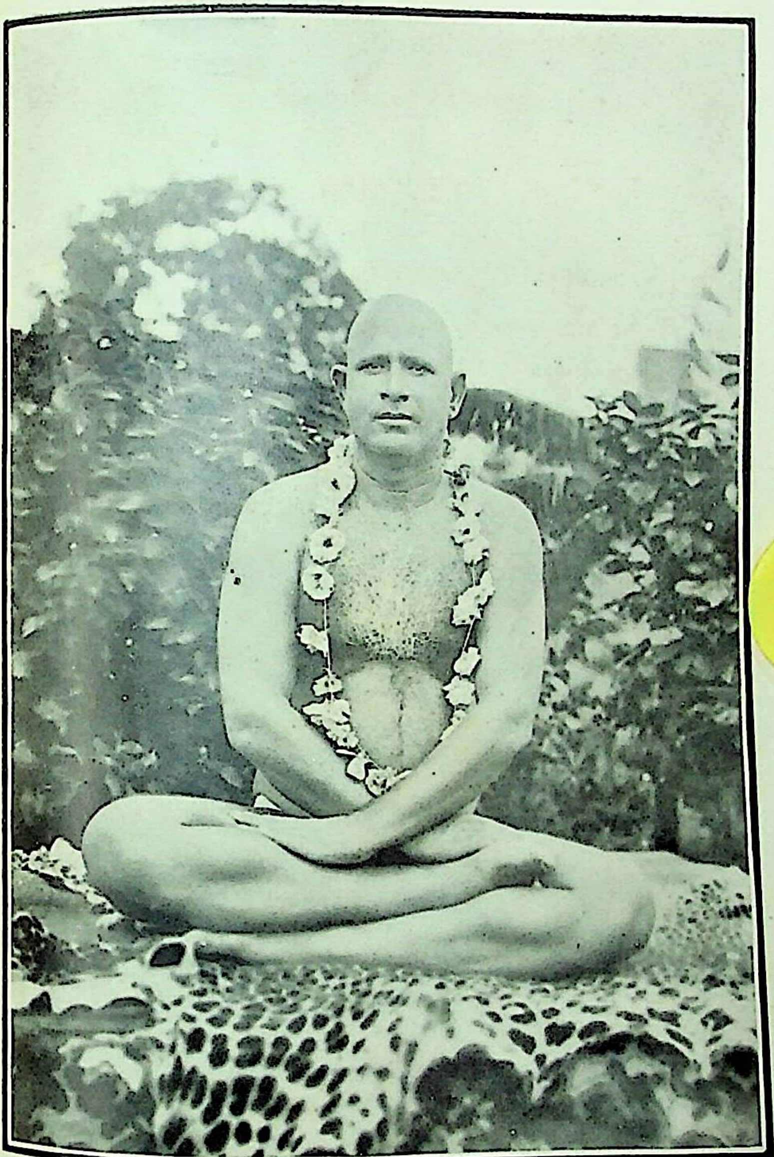
ষষ্ঠ তরঙ্গ

বাবা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, পঞ্জাবের অধিবাসী সাধারণতঃ ধর্ম্মপরায়ণ, অতিথি-সেবায় তাঁহাদের বড়ই আগ্রহ। প্রত্যেক নগর ও গণ্ডগ্রামে ধর্ম্মশালা দেখা যাইত। এই সব ধর্ম্মশালায় বহু সাধু সন্ন্যাসী আসিতেন। গৃহিগণ সাধু-সৎকারে কখন পশ্চাৎপদ হইতেন না। গ্রামে গ্রামে এই নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক গৃহে প্রয়োজনাতিরিক্ত তিনখানি রুটি প্রস্তুত হইবে। উহার একখানি তৎক্ষণাৎ সাধুসেবায় ব্যয়িত হইবে, দ্বিতীয়খানি ধর্ম্মশালায় প্রেরিত হইবে, তৃতীয়খানি গৃহে কোন অতিথি অভ্যাগতের জন্য রক্ষিত হইবে। যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনদিন অতিথি না আসেন, তাহা হইলে সেখানি গো-সেবায় ব্যয়িত হইবে। যে রুটিখানি অতিথির জন্য জমা আছে, তাহা কোন মতে গৃহের কোন ব্যক্তি ভোজন করিবে না।

বাবা ইহাও বলিয়াছিলেন যে, পঞ্জাবে এক সময়ে জাতিবিচার ছিল না। প্রত্যেক হিন্দু, হিন্দুর অন্ন গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না। তবে মুসলমান-স্পৃষ্ট অন্ন কোন আচারী হিন্দু গ্রহণ করিত না। চামার প্রভৃতির কার্য্য মুসলমান কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইত।

বাবা বলিয়াছিলেন, পঞ্জাবের অধিবাসীরা সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধাযুক্ত, প্রার্থনার পূর্ব্বেই তাঁহারা সাধু-সজ্জনের সেবা করিতেন। সাধুর সাজে সজ্জিত হইলেই লোকে সাধু হয় না। যাহার চিত্ত শুদ্ধ, যে হিংসাশূন্য কামনাশূন্য নিষ্কপট সেই প্রকৃত সাধু।

বাবার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলে বাবা বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে



শ্রীশ্রীহংসদেব অবধূত মহারাজ।

প্রথম অবস্থায় দেশবিদেশে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে এবং তৎকালে নানা ভাষাও তাঁহাকে শিখিতে হইয়াছে; আমরা জানিতে চাহিলে আফগানের ভাষা এবং দাক্ষিণাত্যের ভাষা ও গুজরাট ভাষা কিছু কিছু শুনাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ তাঁহাকে পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। অবধূতকে দ্বাদশবর্ষকাল একাদিক্রমে মাত্র কৌপীন সম্বলে সম্পূর্ণ নগ্নদেহে যথালব্ধ আহার্য্যে সন্তুষ্ট থাকিয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ করিতে হয়। বাবাকেও নগ্নদেহে শীতপ্রধান দেশে কত দিবারাত্র অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। তিনি রাত্রিকালে বৃক্ষতলে শুষ্ক পত্রের উপর শয়ন করিয়া বাহু উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া দারুণ শীতের রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন। শিয়রে যে পাত্রে জল ভরিয়া রাখিতেন সে জল জমিয়া বরফ হইত, কিন্তু বৃক্ষাশ্রয়ে শায়িত সাধুদের শৈত্যহেতু নিদ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটিত না। বাবা বলিতেন, 'গুজর গেয়ি গুজরাণ, কেয়া ঝোপরি কেয়া ময়দান।' পথ চলিতে চলিতে যেখানে রাত্রি হইত, অথবা ক্লান্তি বোধ হইত, সেইখানেই নিশা অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু জনাকীর্ণ অঞ্চলে জনসঙ্ঘ এড়াইবার উদ্দেশ্যে রাত্রিতেই পথ চলিতে হইত, দিবসে গ্রাম বা নগর-বাহিরে নির্জ্জন স্থানে অতিবাহিত করিতেন।

বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, শীতপ্রধান দেশে অনাবৃত-দেহে উন্মুক্ত স্থানে আপনি কিরূপে রাত্রি অতিবাহিত করিতেন?—শীতে কষ্ট হইত না?

বাবা। আমাদের গাত্রচর্ম্ম, হস্তিচর্ম্মবৎ পুরু হইয়া গিয়াছিল, শীতবোধের শক্তি ছিল না।

প্রশ্ন। আপনি যখন একা একা নির্জ্জন প্রদেশে ভ্রমণ করিতেন, তখন আপনার ভয় করিত না?

বাবা। প্রথম প্রথম কিছু ভয় করিত বই কি মায়ি; একটু কোথাও শব্দ হইলে চমকিয়া উঠিতাম—ক্রমে সব সহিয়া গেল। বৃক্ষতলে বাহুতে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতাম। যে হৃদয়ে তৃষ্ণা নাই, সে হৃদয়ে শান্তি নিয়ত বিরাজ করে। তৃষ্ণা হইতেই অভাব-বোধ, আর অভাব-বোধ হইতেই অশান্তির সৃষ্টি।

অবধূত হইবার পূর্ব্বে বাবাকে যখন দ্বাদশবর্ষকাল একাদিক্রমে দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল, তখন এই দীর্ঘ সময় তিনি একদিনের জন্যও স্বহস্তে পাক করেন নাই। গৃহীর দ্বারে আসিয়া হরিহর বলিয়া দাঁড়াইতেন; গৃহী যাহা কিছু দিতেন, তাহা অনেক সময় ভ্রমণ করিতে করিতে আহার করিতেন, যদি কোন আহার্য্যে রুচি না হইত, তাহা হইলে তাহা পথপার্শ্বে নিক্ষেপ করিতেন এবং দ্বিতীয় গৃহদ্বারে ভিক্ষার্থে আসিয়া দাঁড়াইতেন। যদি কোন গৃহে ভিক্ষা না মিলিয়া ভৎর্সনা মিলিত তাহা হইলেও তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া গৃহীর কল্যাণ কামনা করিতে করিতে সন্তুষ্টমনে অপর গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেন।

ভ্রমণ করিতে করিতে বাবা আফগানিস্থানে গিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তথায় দেড় বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তখন হিন্দু মুসলমান মধ্যে সদ্ভাব থাকিলেও আফগান রাজ্যদ্বারে তাঁহাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হইয়াছিল এবং তাঁহার অঙ্গে প্রহারের কোন চিহ্ন আছে কিনা তাহাও দেখাইতে হইয়াছিল। বাবা ঐদেশের চিমন গ্রাম নামক স্থানে একাদিক্রমে তিন মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। স্থানটি সুন্দর, মনোরম দৃশ্য; ক্ষুদ্র নদী পাহাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। দৃশ্যাবলী বাবাকে মুগ্ধ করিল,—তিনি সেই নির্জ্জন প্রদেশে পর্ব্বতাশ্রয়ে সাধনরত হইলেন। কিন্তু আহার জুটিল না; তিন দিবস কিছুই মিলিল

না। ক্ষুধা পাইলে নদী হইতে করপুটে জল লইয়া পান করিতেন। ঐ স্থান হইতে বহুদূরে কৃষকগণ মাঠে চাষ করিত, তাহাদের মধ্যে একব্যক্তি চতুর্থ দিবসে বাবার নিকট আসিল; কহিল, আপনার এ স্থানে থাকা ঠিক নয়; এখানে হিন্দু সাধুর আদর নাই, বরং পীড়ন আছে।

বাবা উত্তর করিলেন, আমি কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি না, কাহারও সহিত কখন দুর্ব্যবহারও করি না। তবু যদি আমাকে কেহ পীড়ন করে, তবে 'ওভি আচ্ছা।' ঐ ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাবার মুখপানে চাহিয়া রহিল; পরে তাঁহাকে দুইখানি ইক্ষুদণ্ড দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

সেই দিবস অপরাহ্নে এক বলিষ্ঠদেহ দীর্ঘাকার সুন্দরকান্তি পাঠান অশ্বারোহণে বাবার নিকট আসিয়া বাবাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করিল এবং আহারের নিমিত্ত অনুরোধ করিল। বাবা জানাইলেন, তাঁহাদের স্পৃষ্ট আহার্য্য তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না। পাঠান কহিল, আপনি স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করুন। বাবা তাহাতেও সম্মত না হইলে পাঠান কিছু চঞ্চল হইয়া পড়িল এবং বাবাকে কহিল, আপনিই আপনার আহারের ব্যবস্থা করুন। বাবা কহিলেন যে, তিনি ত কাহাকেও কোন কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহার আহারের জন্য কেন পাঠান ব্যস্ত হইতেছেন?

বাবা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লইতে উপদেশ দিলেন। পাঠান অশ্ব হইতে নামিয়া বাবার নিকটে বসিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক কথাবার্ত্তা হইল; ধার্ম্মিক পাঠান অনেক জটিল প্রশ্ন করিলেন। সদুত্তর পাইয়া তিনি শ্রদ্ধান্বিত-চিত্তে বিদায় লইলেন। কিছুকাল পরে ভৃত্য-হস্তে দুগ্ধ ও ফলমূল প্রেরণ করিলেন। পরে বাবা জানিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি স্থানীয় মুসলমান জমীদার।

ইহার পর হইতে বাবার নিকট বহুব্যক্তির সমাগম হইতে লাগিল। তাহারা প্রায় সকলেই বাবার জন্যে কিছু না কিছু আহার্য্য আনিত। সময় সময় এতই আহার্য্য আসিত যে, বিতরণ করিয়া দিয়াও তাহার শেষ হইত না। কোন কোন দিন কিস্‌মিস্ বাদাম এক মণেরও বেশী আসিয়া জমিত ; কিন্তু বাবা পরদিবসের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিতেন না—দিনের আয় দিবসের মধ্যেই ব্যয় করিতেন।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'বাবা, সকলেই কি ধর্ম্মোপদেশ লইতে আপনার নিকট আসিত ?'

বাবা উত্তর করিয়াছিলেন, 'না মায়ি, উপদেশ লইতে অতি অল্প লোকই আসিত। কেহ ঔষধ, কেহ ভাগ্য, কেহ পুত্র এই রকম একটা না একটা কামনা লইয়া অধিকাংশ লোকই আসিত। তবে মায়ীরা কখন কিছু চাহিতেন না। তাঁহারা দূরে নদীকূলে দাঁড়াইয়া অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সাধু-দর্শন করিতেন।'

বাবা দেখিলেন, ক্রমশঃ ভিড় বাড়িয়া চলিতেছে ; জনতা সাধনের অনুকূল নয় বুঝিয়া, বাবা একদা গভীর রাত্রিতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন।

যাঁহারা আসক্তি-শূন্য, তাঁহাদের পক্ষে সকল দেশই সমান।

বাবা তাঁহার অতীত জীবনের একটী কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এক সময় তিনি গুজরাটে ব্রোচ নগরের সন্নিধানে একটী সুবৃহৎ সরোবর-তীরে বাস করিতেন। যে সরোবরটীর পার্শ্বে তিনি রাত্রি যাপন করিতেন, উহা এমনই বৃহৎ যে, একবার উহার চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিলে দুই মাইল ভ্রমণ হইত। বাবা প্রত্যহই স্বেচ্ছামত ঐ সরোবরটীর চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। যে রাস্তা দিয়া তিনি ভ্রমণ করিতেন তাহার অদূরে এক নিম্ববৃক্ষমূলে

একজন মুসলমান ফকিরের কবর ছিল। একদা বাবা ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানটী দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় উহা রমণীয় বোধে তথায় গিয়া বসিলেন। যখন তিনি ঐ স্থান হইতে উঠিয়া আসিতেছিলেন, তখন দূর হইতে এক মুসলমান তাঁহাকে দেখিতে পায়। বাবা কিন্তু তাহাকে লক্ষ্য করেন নাই; তিনি নিশ্চিন্তমনে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। পরে ঐ মুসলমান তাহার গ্রামের মধ্যে প্রচার করিল যে, এক হিন্দু সাধু তাহাদের ফকিরের কবরে বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াছে এবং সে ঐ স্থলে মৃত ফকিরের আত্মাকে বশে আনিবার নিমিত্ত বহুক্ষণ ধরিয়া মন্ত্র জপ করিয়াছে। এমন কি সেই হিন্দু সাধু এখনও প্রত্যহ ফকিরের কবর স্থান প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মনে মনে মন্ত্র জপ করিয়া থাকে। ইহা শুনিয়া গ্রামের বহু মুসলমান উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং স্থির করিল যে, এই হিন্দু সাধুকে হত্যা করিতে হইবে। সঙ্কল্পানুযায়ী তাহারা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

সাধুবাবা এ সকল মিথ্যা অপবাদ কিংবা তাহাদের এই চক্রান্তের কথা কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি পূর্ব্ববৎ পরদিবস অপরাহ্ণ-কালে একাকী পদব্রজে সরোবর-তীরে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার গাত্র বস্ত্রশূন্য। পরিধানে মাত্র কৌপীন এবং বামস্কন্ধে একখানি গামছা। তাঁহার এক হস্তে এক দণ্ড ও অপর হস্তে একটী লোটা ছিল। এদিকে রাস্তার আশে পাশে প্রায় ৫০।৬০ জন মুসলমান বাবাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রাদিসহ লুক্কায়িত ছিল। উহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বাবার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং নানারূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে বাবার সহিত পথ চলিতে লাগিল। ক্রমে এ-দিক ও-দিক হইতে অস্ত্রাদি-হস্তে আরও বহু ব্যক্তি আসিয়া তাহার দল পুষ্ট করিতে লাগিল। একসঙ্গে এতগুলি ব্যক্তির অস্ত্রসহ

আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই এক ব্যক্তি বাবাকে কৈফিয়ৎ দিল যে, তাহারা সকলে শস্যক্ষেত্রে বানর তাড়াইবার নিমিত্ত একত্র হইয়াছে। বাবার মনে তখন পর্য্যন্ত কিছুমাত্র সন্দেহ জাগে নাই। তিনি পূর্ব্ববৎ অন্যান্য দিনের মত প্রসন্নচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি বাবাকে তাহাদের গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে বলায় তিনি নিঃসঙ্কোচে তাহাদের সহিত অগ্রসর হইলেন। বাবা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, সেখানেও প্রায় ৬০।৭০ জন মুসলমান কোন না কোন হাতিয়ার লইয়া যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছে। তখনও পর্য্যন্ত বাবা তাহাদের কু-অভিসন্ধি কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই। ক্রমে দিবসের আলোক অন্তর্হিত হইল, সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইতেছে দেখিয়া, বাবা উহাদের নিকট তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যদিও বাবার সর্ব্বস্থানই সমান, কিন্তু তাঁহার দর্শন-কামনায় বহু ব্যক্তি যে আশ্রমে অপেক্ষা করিতেছে! সময় সময় কত দূরদেশ হইতে কত ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। বাবা ভাবিলেন, অদ্য যদি সেই প্রকার কেহ তাঁহার বাসস্থানে আসিয়া থাকে, তবে এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে তথায় দেখিতে না পাইয়া নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। বাবা এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক কোমলবাক্যে উহাদের নিকট বিদায় লইয়া যখন আশ্রমাভিমুখে রওনা হইলেন, তখনও কেহ কিছু তাঁহাকে বলিল না, কিংবা কোন আপত্তি প্রকাশ করিল না। কিন্তু তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই এক অস্ত্রধারী ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিল ও বাবাকে দণ্ডায়মান হইতে বলিল। বাবা তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে চায়। বাবা ভাবিলেন, সে ব্যক্তি যদি বাবার দর্শনে তৃপ্তি

পায়, তবে না হয় তিনি তাঁহার বাসস্থানে একটু বিলম্বেই ফিরিবেন। ইহা ভাবিয়া তিনি একটু দাঁড়াইলেন। ক্ষণপরে এক বৃদ্ধ এবং ঐ স্থানের সর্দ্দারের যুবক পুত্র, বাবার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ও তাহারা বাবাকে পুনঃ পুনঃ নানাবিধ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের কর্কশ-বাক্য-শ্রবণে ও রুক্ষ-মুখমণ্ডল-দর্শনে বাবা বুঝিলেন, ইহাদের কোন কু-অভিসন্ধি আছে। উহারা প্রথমে বাবাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, তাহাদের ফকিরের গোরস্থানে গিয়া তিনি কি বসিয়াছিলেন ? তিনি তদুত্তরে অকুণ্ঠিতভাবে "হুঁ" উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি তখনও অবগত নহেন যে, এই ঘটনার নিমিত্তই ইহাদের মনে এত আক্রোশ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি উহাদের সকল প্রশ্নের উত্তরই অকুণ্ঠিতভাবে দিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু পরে সাধুবাবা উহাদিগকে ঐরূপ রাগান্বিত দেখিয়া উহাদের ক্রোধের কারণ কি তাহা অতি কোমল-ভাবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন উহারা পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল কথাগুলি ব্যক্ত করিল এবং বলিল এই নিমিত্ত তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে। উহাদের বাক্যশ্রবণে বাবা কিছুমাত্র বিচলিত বা ভীত হইলেন না। তিনি উহাদের বাক্যে প্রথমে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। পরে সহাস্যবদনে উহাদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "নিরস্ত্র এক ব্যক্তির বধের জন্য এত আয়োজন ?" তিনি আরও বলিলেন, "আমি একাকী এবং অস্ত্রশূন্য, আর তোমরা প্রায় একশত ব্যক্তি অস্ত্রে সজ্জিত। যদি তোমরা আমাকে হত্যা কর, তবে আমার কিছু করিবার কিংবা বলিবার নাই। যদি আমি বলি যে, আমি ফকিরের গোর-স্থানে বিষ্ঠা ত্যাগ করি নাই, তবে তোমরা বিশ্বাস করিবে না। ভাবিবে যে আমি বোধ হয় প্রাণভয়ে এরূপ মিথ্যা বাক্য বলিতেছি। আচ্ছা, কি করিলে তোমাদের মন হইতে এই ভ্রম দূর হইবে, তাহা শুনি ?" বাবার

বাক্যে ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিল যে, আমরা শুনিয়াছি আপনি প্রত্যহই বামধার দিয়া ঐ গোরস্থানটী পরিক্রমণ করেন এবং মনে মনে বশীকরণ মন্ত্র উচ্চারণ করেন। আপনি যদি অদ্য ডাহিন পাকে এই গোরস্থানটী পরিক্রমণ করেন, তবে বুঝিব আপনি মনে কোন কু-মতলব পোষণ করিয়া ঐরূপ পরিক্রমণ করেন নাই। এই বাক্যে বাবা প্রসন্নচিত্তে সহাস্যবদনে উহাদের ভ্রম অপনোদন করিবার নিমিত্ত ডাইন পাকে ঐ গোরস্থানটী প্রদক্ষিণ করিলেন। প্রথম হইতেই বাবার সুমিষ্ট ব্যবহার ও কোমল বাক্যে এবং তাঁহার অবিচলিত ভাবদর্শনে বোধ হয় চক্রান্তকারীরা একটু আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার সুমধুর ব্যবহারে ক্রমেই তাহারা অধিক আকৃষ্ট এবং অবশেষে মুগ্ধ হইল। তখন তাহাদের ভ্রম বিদূরিত হইল। ইনি যে প্রকৃতই সাধু, তাহা বুঝিতে পারিয়া সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি যুক্তকরে বাবার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিল, "আমরা যদি বুঝিবার ভ্রমে অদ্য এই কুকার্য্যটী করিতাম, তাহা হইলে না জানি আমাদের কত অপরাধ হইত!" ইত্যাদি বাক্য বলিয়া সে বাবাকে প্রণাম করিয়া জোড়হাতে তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা এই ঘটনা অপ্রকাশ রাখিতে বাবাকে অনুরোধ করিল; কেননা, হিন্দু সাধুর অবমাননায় স্থানীয় হিন্দুরা উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, অনর্থক একটা হাঙ্গামা বাধিতে পারে।

সপ্তম তরঙ্গ

একদিবস সাধুবাবা নেপাল রাজ্য সম্বন্ধে একটী গল্প বলিয়াছিলেন। বাবা বলিলেন যে, সিদ্ধ মহাত্মা গোরক্ষনাথজী এক ব্রাহ্মণ-গৃহে নিত্য উপস্থিত হইতেন এবং ঐ ব্রাহ্মণপত্নী অতি সমাদরে তাঁহাকে প্রত্যহ আহার করাইতেন। সাধুজ্ঞানে ব্রাহ্মণ-পত্নী তাঁহাকে আদর যত্ন করিতেন বটে, কিন্তু তিনি যে কত বড় ব্যক্তি তাহা ব্রাহ্মণী অবগত ছিলেন না। একদা সেই গৃহস্বামী-ব্রাহ্মণ জানিতে পারিলেন যে, সিদ্ধ মহাত্মা গোরক্ষনাথজী কৃপাপূর্ব্বক প্রত্যহ তাঁহাদের বাড়ী আসেন এবং তাঁহার পত্নীর নিকট ভোজন করেন। তিনি পত্নীকে বলিয়া দিলেন, কল্য যখন সাধু আগমন করিবেন, তখন তুমি আমাদের পুত্রটীকে সাধুর নিকট লইয়া গিয়া তাহার 'ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ ক্ষমতা লাভ হউক' এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া লইও।

পরদিবস দ্বিপ্রহরে গোরক্ষনাথজী ব্রাহ্মণ-গৃহে আগমন করিলে, প্রথমে ব্রাহ্মণ-পত্নী তাঁহাকে ভোজনে বসাইলেন। তৎপরে স্বামীর উপদেশ-অনুসারে পুত্রসহ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া গোরক্ষনাথজীর নিকট পুত্রের 'রাজ্যলাভ হউক' এই প্রার্থনা জানাইলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সুপ্রসন্নবদনে বালকটীর প্রতি চাহিয়া নিজের মুখবিবর হইতে কিছু চর্ব্বিত খাদ্য পুত্রটীর হস্তে দিতে গেলেন। প্রথমে সাধু দিতেছেন বলিয়া বালকটী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অঞ্জলি পাতিয়া ঐ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু পরে উহা আহার করিতে তাহার ঘৃণাবোধ হওয়ায়, বদ্ধাঞ্জলি নীচের দিকে ঈষৎ ফাঁক করায় ঐ চর্ব্বিত খাদ্য বালকের পদদ্বয়ে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া সিদ্ধ গোরক্ষনাথজী বলিলেন, "বালক যদি

ইহা আহার করিত, তবে নিশ্চয়ই সে সম্রাট্ হইত। কিন্তু উহা পায়ের উপর ফেলিয়া দেওয়াতে এই বালকের পা যে যে স্থানে যাইবে সেই সেই স্থান ইহার রাজ্যভুক্ত হইবে।” এই আশীর্ব্বাদ লাভ করায় ব্রাহ্মণ-দম্পতি অতি আনন্দিত হইয়াছিলেন। অতঃপর পুত্রটী বড় হইলে তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া নেপাল দেশের যে সকল স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সকল স্থানই সাধু গোরক্ষনাথজীর কৃপায় তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। গোরক্ষনাথজীর আশীর্ব্বাদে সেই বিস্তৃত রাজ্য প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ নূতন রাজ্যের নাম হইয়াছিল “গোর্খার রাজ্য”। ঐ পুত্র রাজ্যস্থাপন-পূর্ব্বক যখন রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তখন গোরক্ষনাথের নামে “ঝাণ্ডা” এবং নূতন মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া মুদ্রার উপরও গোরক্ষ-নাথজীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। বাবা বলিতেছিলেন, এই সূত্রে নেপাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

বাবা বুঝাইতেছিলেন, যে সাধু, সে সকলকেই সাধু দেখে; যে চোর, সে ভাবে জগতের সকলেই বুঝি চোর। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন।

একদা এক সাধু নদীতীরে নির্জ্জন অরণ্যপার্শ্বে এক বৃক্ষতলে বসিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। এক তস্কর গৃহে গৃহে চুরি করিয়া রাত্রিশেষে নিজ গৃহে ফিরিবার কালে ঐ স্থানে উপস্থিত হইল। সাধুকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া সে মনে করিল, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই চোর, সমস্ত রাত্রি চুরি করিয়া শ্রান্তদেহে বিশ্রাম লইতেছিল, অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঐ ব্যক্তি কত টাকা লুণ্ঠন করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য চোরের কৌতূহল জন্মিল; এবং এক বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ রক্ষা করত সাধুর নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। চোর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সত্বর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। উষাসমাগমে সাধুর ধ্যানভঙ্গ

হইলে তিনি দেখিলেন, অদূরে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সাধু মনে করিলেন, এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন বড় সাধক, সূর্য্যদেব প্রকাশ হইতে চলিলেন, এখনও ইনি সমাধিস্থ। কাল রাত্রিতে অন্ধকারবশতঃ আমি ইঁহাকে দেখিতে পাই নাই। অতঃপর সাধু চোরকে শ্রদ্ধার সহিত নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কথা উঠিল প্রারব্ধ কি, এবং তাহার শক্তি অতিক্রম করা সম্ভবপর কি না। বাবা বলিলেন, কর্ম্ম তিন প্রকার,—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। সঞ্চিত অর্থে, যে কর্ম্ম জীব বহু বহু জন্মে করিয়া আসিয়াছে, সেই কর্ম্মের সমষ্টি। অর্থাৎ যে কর্ম্মফল জীবের ভোগের নিমিত্ত জমা আছে, আর প্রারব্ধ অর্থে ঐ সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্য হইতে যাহা অর্থাৎ যে অংশ জীবের বর্ত্তমান কালে বা দেহে ভোগ করিতে হইবে। বাবা বলিতে লাগিলেন, প্রারব্ধ-ভোগ নিমিত্তই জীব দেহধারণপূর্ব্বক জন্ম লইয়াছে। সঞ্চিত কর্ম্ম হইতে যে অংশ জীবের ভোগের নিমিত্ত উপস্থিত হয়, তাহাই প্রারব্ধ। এই প্রারব্ধ অনেক সময় সম্পদ্ বা বিপদ্রূপে উপস্থিত হয়। উদাহরণ দিয়া কহিলেন, যদি কোন ভাণ্ডার ঘরে বহুদ্রব্য সঞ্চিত রাখা হয়, এবং প্রয়োজনমত সঞ্চিত দ্রব্য হইতে কিছু কিছু লইয়া ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে যে জিনিষটি ভোগের নিমিত্ত আসিল, সেটীকে প্রারব্ধ বলা যাইতে পারে; আর ভাণ্ডারের সঞ্চিত দ্রব্যগুলি হইল সঞ্চিত কর্ম্মফল। বাবা বলিলেন, এই প্রারব্ধ বড়ই বলবান্—

প্রশ্ন,—তবে কি জীবের এই প্রারব্ধের প্রভাব হইতে পরিত্রাণ নাই, বাবা?

উত্তর,—যদিও প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে, কিন্তু মধ্যাহ্নকালে প্রখর সূর্য্যকিরণে পীড়িত হইয়া যেরূপ কোন পথিক

মাথার উপর ছত্র ধরিয়া কিছু আরাম ভোগ করে, সেইরূপ কোন ব্যক্তি ভগবানের চরণে শরণ লইলে, কঠোর প্রারব্ধের দণ্ডও কিঞ্চিৎ লঘু হয়।

প্রশ্ন,—ক্রিয়মাণ কি বাবা ?

উত্তর,—জীব যে সকল কর্ম্ম বর্ত্তমান কালে করিতেছে উহাই ক্রিয়মান কর্ম্ম। প্রারব্ধ অত্যন্ত বলবান্ হইলেও যদি কেহ একান্তভাবে ভগবৎ চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে যেমন উহার প্রকোপ কর্ম্মানুরূপ মৃদু হইয়া আসে, তেমনি জীবের বহু জন্মার্জ্জিত সঞ্চিত কর্ম্মফল ক্রিয়মাণ কর্ম্মদ্বারা লঘু করা যায়। প্রারব্ধ হইতেছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের ফল, এ জন্মের পুরুষকার দ্বারাও পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা যায়।

প্রশ্ন,—এ জীবনে যাহা করা হইতেছে সেই ক্রিয়মাণ কর্ম্মফল কিরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ?

উত্তর,—জ্ঞান দ্বারা। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।" (গীতা ৪।৩৮)।

প্রারব্ধ যে কিরূপ বলবান্ তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটী গল্প বলিলেন। ঘটনাটি নাকি সত্য।

পূর্ব্বে কাশ্মীর প্রদেশে এক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। গৃহে ব্রাহ্মণ, তাঁহার স্ত্রী ও কুমারী কন্যা ছিলেন। সাধু তাঁহাদের গৃহে অতিথি হওয়ায় ব্রাহ্মণ সাতিশয় পুলকিত হইলেন এবং অত্যন্ত যত্ন-সহকারে তাঁহার সেবা করিলেন। উঁহাদের সেবায় সাধু অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে কিছুকাল তথায় রহিয়া গেলেন। স্থানটী প্রাকৃতিক দৃশ্যে সৌন্দর্য্যময়, স্বাস্থ্যকর ও নির্জ্জন।

সাধনার সম্পূর্ণ অনুকূল মনে করিয়া তিনি ব্রাহ্মণের গৃহে সানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একদা এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সাধু প্রকৃতির শোভা দর্শন করিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণের কুমারী-কন্যা আসিয়া সাধুকে কহিল, আমি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন।

সাধু, 'রাম' 'রাম' বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলী দিলেন। পরে কুমারীকে বুঝাইয়া বলিলেন, আমি ব্রহ্মচারী, বিবাহ করিলে ধর্ম্মচ্যুত হইব। এ বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না।

কুমারী কহিলেন, আপনি ধর্ম্মচ্যুত হন, ইহা আমার অভিপ্রেত নয়; কিন্তু আমি যখন আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন আপনি ছাড়া আমার দ্বিতীয় স্বামী নাই। আপনার যদি ইহাই অভিপ্রায় হয়, তবে আমি চিরদিন অবিবাহিত থাকিব।

কুমারী প্রস্থান করিলেন। সাধু চিন্তানিবিষ্ট হইলেন। মনে মনে বহু বিচার বিতর্ক করিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, এ স্থান ত্যাগ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য এবং বিলম্ব করিলে যদি কোন ব্যাঘাত ঘটে, ইহা আশঙ্কা করিয়া তিনি সেই রাত্রিতেই ব্রাহ্মণের আশ্রম ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

গভীর রাত্রিতে যখন সকলে সুপ্ত, তখন সাধু গৃহত্যাগ করত হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রজনী-প্রভাতে ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সাধুর কক্ষ শূন্য, তাঁহার আসন শূন্য। বেলা বাড়িতে লাগিল, কিন্তু সাধুর দেখা নাই, ব্রাহ্মণের বুকের ভিতর কেমন একটা হাহাকার উঠিল; তাঁহার স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র ব্রহ্মচারী সহসা অদৃশ্য। দুই তিন দিন অপেক্ষা করিলেন; সাধু ফিরিলেন না দেখিয়া তিনি সেই শূন্য

গৃহে আর থাকিতে পারিলেন না,—স্ত্রীকন্যা লইয়া তীর্থ করিতে হরিদ্বারাভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। তখন রেল হয় নাই, সাধারণতঃ লোকে পদব্রজে গমনাগমন করিত।

কিন্তু পথে যাত্রীদের বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হইত না ; মাঝে মাঝে ধর্ম্মশালা, সুপেয় জল, উপযুক্ত আহার্য্যের অভাব হইত না। ব্রাহ্মণ দিবাভাগে পথ চলিতেন, সন্ধ্যা-সমাগমে ধর্ম্মশালায় বিশ্রাম লইতেন। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে যাইতে একদা এক ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় পূর্ব্বকথিত সাধু অবস্থান করিতেছেন। আকস্মিক সাক্ষাতে উভয় পক্ষই সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দুঃখভরে কহিলেন, আমাদের সেবার কোন ত্রুটি হইয়া থাকিবে, তাই আপনি সহসা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সাধু কহিলেন, আপনারা আমার যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন, কোন ত্রুটি হয় নাই। হরিদ্বার-তীর্থদর্শনে আমার বাসনা হইল, তাই হরিদ্বারের দিকে চলিয়াছি। তচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া কহিলেন, আমরাও হরিদ্বারে যাইতেছি—একত্র যাওয়া যাইবে।

সাধু রাত্রিকালে শয্যায় শুইয়া চিন্তানিবিষ্ট হইলেন। এ কিরূপে ঘটিল ? আমি যাহাকে ত্যাগ করিয়া নিশীথে গোপনে পলায়ন করিলাম, সেই আমার অনুসরণ করিতেছে ! এ সঙ্গ কিছুতেই আমার বাঞ্ছনীয় নহে—পুনরায় আমি পলায়ন করিব ; কিন্তু হরিদ্বারের পথে আর যাইব না, কি জানি যদি পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটে ! আমি কাশীর পথ ধরিব।

ব্রাহ্মণ গভীর রাত্রিতে ধর্ম্মশালা ত্যাগ করিয়া কাশী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরদিবস প্রভাতে ব্রাহ্মণদম্পতি সাধুকে দেখিতে না পাইয়া বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলেন। গৃহিণী তখন প্রস্তাব করিলেন, সাধু যখন

আমাদিগকে এড়াইবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছেন, তখন আমরা এখন আর হরিদ্বারে যাইব না ; চল আমরা তীর্থরাজ প্রয়াগে স্নান করিয়া কাশী যাই, ফিরিবার পথে হরিদ্বারে যাইব। ব্রাহ্মণ এই যুক্তি সমীচীন মনে করিয়া প্রয়াগের পথ ধরিলেন।

কয়েকদিনের মধ্যে এক ধর্ম্মশালায় ব্রহ্মচারীর সহিত আবার তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটিল। উভয়পক্ষই সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। ব্রাহ্মণ পুনরায় অনুযোগ করিলেন। সাধু উত্তর করিলেন, বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে সহসা তাঁহার অভিলাষ হওয়াতে তিনি কাশীর পথ ধরিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সানন্দে কহিলেন, আমরাও কাশী যাইতেছি, অতএব একত্র যাওয়া যাক্। সাধু দেখিলেন, এ ত বড়ই উৎপাত! আমি যতই ইহাদের এড়াইবার চেষ্টা করিতেছি, ততই ইহারা আমার সম্মুখে আসিতেছে। এখন আমি কোথায় যাই? এমন স্থানে যাইতে হইবে যেখানে ইহাদের সহিত আমার আর সাক্ষাৎ না ঘটে। তীর্থে আর যাইব না, এবার বিপরীত দিকে যাইব—কাশ্মীরের পথ ধরিব। সাধু মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প আঁটিয়া গভীর রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রামগ্ন, তখন ধর্ম্মশালা ত্যাগ করিয়া কাশ্মীরের পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদম্পতি সাধুকে দেখিতে না পাইয়া বুঝিলেন, সাধু তাঁহাদের সঙ্গ পছন্দ না করিয়া গোপনে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং ভবিষ্যতে তাঁহারাও সাধুর সঙ্গ এড়াইয়া চলিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণকে সহসা সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল না,—তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণী মহাচিন্তিত হইয়া স্থির করিলেন, আর তীর্থভ্রমণে প্রয়োজন নাই, এখন আমরা গৃহে ফিরি। যদি ইতোমধ্যে ব্রাহ্মণ

সুস্থ হইয়া উঠেন, তাহা হইলে আমরা হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে যাইব। অতঃপর তাঁহারা কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণের দৌর্ব্বল্য হেতু তাঁহাদের দুই চারি দিন গোযানের সাহায্য লইতে হইয়াছিল।

অতঃপর তাঁহারা নিশাকালে এক ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অন্যান্য পথিকরা নিদ্রামগ্ন; সকল ঘরেই লোক, কেবল একটী ছোট ঘরে কেহ নাই দেখিয়া তাঁহারা তথায় আশ্রয় লইলেন। ঘরের একপার্শ্বে কি একটা পদার্থ বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে অস্পষ্ট দৃষ্ট হইল। তাঁহারা কেহই তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া অন্ধকারেই পাশাপাশি শুইয়া পড়িলেন। কুমারীর পার্শ্বেই রহিল, সেই বস্ত্রাবৃত পদার্থ। এখন এই পদার্থ আর কিছু নয়, জীবিত মনুষ্যদেহ—পূর্ব্ব পরিচিত ব্রহ্মচারী। উভয়ে নিদ্রাঘোরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন। তখন উভয়েরই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সাধু কহিলেন, 'এ যে স্ত্রীলোক! এ কি তুমি!' কণ্ঠস্বরে কুমারী সাধুকে চিনিলেন; তিনি উত্তর করিলেন, 'হ্যাঁ, আমি। নিয়তি আমাকে আপনার কাছেই পুনঃ পুনঃ আনিতেছে।"

সাধু কহিলেন, 'আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আমি কিছুতেই তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না। তোমাকে এড়াইবার জন্যেই আমি তোমার পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছি, এবং পুনঃ পুনঃ দূরে পলাইবার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু দৈব বারংবার আমাদিগকে একত্র করিতেছে।'

ব্রাহ্মণদম্পতি জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা সাধুর কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন কেন তিনি তাঁহাদের গৃহ ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের এড়াইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহারা ইহাও বুঝিলেন যে, তাঁহাদের কুমারী কন্যা ব্রহ্মচারীর প্রতি অনুরাগিণী। তখন ব্রাহ্মণ শয্যায় উঠিয়া বসিয়া সাধুকে কহিলেন, তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে অসম্মত কেন? বিবাহ করিতে আপত্তি কি? আর তোমার শত আপত্তি থাকিলেও এ বিবাহ ঘটিবেই, তুমি পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু সমর্থ হও নাই। নিয়তি আমাদিগকে একত্র করিয়াছে। নিয়তির বিধান কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।

সাধু কিন্তু কিছুতেই বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন ব্রাহ্মণের পক্ষ হইতে প্রস্তাব হইল, চল, আমরা হৃষীকেশ তীর্থে যাই। তথায় বহু সাধু আছেন, তাঁহারা আমাদের এ দ্বন্দ্ব মীমাংসা করিয়া দিবেন।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সাধু এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং হৃষীকেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত পথ চলিতে স্বীকৃত হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহারা হৃষীকেশে উপস্থিত হইয়া সাধুমণ্ডলীর নিকট তাঁহাদের বক্তব্য নিবেদন করিলেন। ব্রাহ্মণ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাগ্য যাহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুর সম্মুখে আনিতেছে, তাহাকে ত্যাগ করা তাঁহার উচিত হয় কিনা, ইহাই আপনাদের নিকট জিজ্ঞাস্য। ব্রহ্মচারীর যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা তিনি বলিলেন। সকল কথা বলিয়া অবশেষে তিনি নিবেদন করিলেন যে, তিনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব বিবাহ করিতে পারেন না। বুধমণ্ডলী উভয়পক্ষের কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারীকে কহিলেন, "তুমি প্রারব্ধ কিছুতেই এড়াইতে পারিবে না—সহস্র চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইবে না। অতএব সন্তোষের সহিত প্রারব্ধের দান মাথা পাতিয়া গ্রহণ কর।" ব্রহ্মচারীর প্রথমে অনিচ্ছা থাকিলেও তিনি কুমারীর মনোভাব বুঝিয়া অবশেষে

বিবাহে স্বীকৃত হইলেন। নিয়তির বিধান অলঙ্ঘ্য বুঝিয়া তিনি গঙ্গাতীরে হরিদ্বারক্ষেত্রে বালিকার পাণিগ্রহণ করিলেন।

নিয়তি যে অনতিক্রম্য, ইহার দৃষ্টান্ত আমরা একখানি ইংরাজি কাগজে দেখিয়াছিলাম। কোনও আমেরিকাবাসী ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া বড়ই বিচলিত হইলেন। তাঁহার অবস্থা পূর্ব্বে স্বচ্ছল ছিল; কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাকে তিনি সমস্ত হারাইলেন। অবশেষে আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দুইবার চেষ্টা করিলেন, দুইবারই তিনি অকৃতকার্য্য হইলেন। তৃতীয়বারে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বিপুল আয়োজন করিলেন। সঙ্গে পিস্তল লইলেন, শক্ত রজ্জু নির্ম্মিত একটা ফাঁস প্রস্তুত করিয়া লইলেন; অতঃপর নদীকূলে আসিলেন। গভীর রাত্রি, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন, জনমানবশূন্য। নদীকূলে আসিয়া একখানি ছোট নৌকা ও একটা শক্ত বাঁশ লইলেন, নৌকায় চড়িয়া গভীর জলে আসিলেন এবং বাঁশটা কোন রকমে নদী-গর্ভে প্রোথিত করিয়া তাহার মাথায় ফাঁস লাগাইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, তিন উপায় একত্র অবলম্বন করিয়া তিনি আত্মহত্যা করিবেন; কি জানি দুই একটা উপায় যদি বিফল হয়! ফাঁস্ গলায় লাগাইয়া বংশদণ্ডে ঝুলিয়া নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িবেন; লাফাইবার পূর্ব্বে তিনি স্বীয় মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলি ছাড়িবেন। অর্থাৎ পিস্তলের গুলি যদি বিফল হয়, ফাঁসি রজ্জু বিফল হইবে না; যদি কোন গতিকে ফাঁসি রজ্জু বিফল হয়, তাহা হইলে গভীর জল হইতে তাঁহার রক্ষা নাই; কেননা, তিনি সন্তরণপটু ছিলেন না। সকল আয়োজন ঠিক করিয়া লইয়া তিনি গলায় ফাঁস লাগাইলেন এবং জলের উপর লাফাইয়া পড়িতে পড়িতে স্বীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের ঘোঁড়া টিপিলেন। তাঁহার পদভরে ক্ষুদ্র নৌকা দুলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট

হইল। গুলি ছুটিয়া গিয়া লাগিল রজ্জুতে ; ফলে ফাঁস কাটিয়া গেল। দুইটা উপায় বিফল হইল। তৃতীয় উপায়ও নিয়তির আদেশে বিফল হইল। বংশদণ্ড তেমন দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় নাই ; তাঁহার ভার রক্ষা করিতে না পারিয়া সে নৌকার দিকে হেলিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে লইয়া সবেগে নৌকার উপর পড়িল। গোলমালে অন্যান্য মাঝি মাল্লা আসিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে লইয়া গৃহে ফিরিল। এই ব্যক্তি আর আত্মহত্যার চেষ্টা করেন নাই ; লর্ড ক্লাইভের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন তাঁহার দ্বারা জগতে বিশেষ কোন কাজ হইবে। হইয়াছিলও তাই, তিনি আমেরিকার মধ্যে ধনে মানে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন।

অষ্টম তরঙ্গ

শারদীয়া পূজার পর আমরা কয়েকদিনের জন্য আগ্রায় গিয়াছিলাম। বৃন্দাবনে যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অশৌচ হওয়ায় পবিত্র বৃন্দাবনধামে যাওয়া ঘটে নাই।

যশিডিতে ফিরিয়া আসিয়া বাবাকে যখন তাহা বলিলাম, বাবা তখন বলিলেন, দেবতার নিকট শুচি অশুচি নাই ; আমাদের মনই পবিত্র বা অপবিত্র করে। ইহা বলিয়া তিনি একটী দোঁহা বলিলেন—

সমর্থকো নেহি দোষ গোঁসাই।
রবি পাবক সুরেশ্বরী কি নাই॥

বাবা বলিলেন, সমর্থ ব্যক্তিকে মলিনতা বা দোষ কিছুই স্পর্শ

করে না। সে কি রূপ? যেরূপ সূর্য্য, অগ্নি ও গঙ্গাকে কখন কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ইঁহারা মলিন দ্রব্যের স্পর্শেও পবিত্র। অগ্নিতে যে কোন বস্তু নিক্ষেপ কর তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া যায়; সূর্য্যদেব সকল বস্তুতে—কি পবিত্র কি অপবিত্র—সমভাবে কিরণ নিক্ষেপ করেন; গঙ্গাবারি মলিন বস্তুকেও পবিত্র করেন।

এই প্রসঙ্গ উঠিলে আমরা সাধুবাবার নিকট গঙ্গার মর্ত্তে আগমনের বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন,—

একদা অমরাবতীতে ইন্দ্রসভায় কোন এক সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ গন্ধর্ব্ব সঙ্গীত করিতেছিলেন। সভাস্থল দেবতা ও ঋষিতে পূর্ণ। গন্ধর্ব্বের সঙ্গীত শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন; মুগ্ধ হইলেন না কেবল একজন,—তিনি দেবর্ষি নারদ। গন্ধর্ব্ব তাহা লক্ষ্য করিলেন। লক্ষ্য করিয়া একদা তিনি নির্জ্জনে দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেদিন দেবসভায় আমি যে গান করিয়াছিলাম, তাহা আপনার পছন্দ হয় নাই বলিয়া মনে হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

দেবর্ষি উত্তর করিলেন, তুমি সেদিন যাহা গান করিয়াছ তাহা উৎকৃষ্ট হয় নাই।

গায়ক বিস্মিত হইয়া কহিলেন, সে কি! ইহা অপেক্ষা ভাল গান সম্ভব কি?

দেবর্ষি—নিশ্চয়ই সম্ভব। তুমি যদি দেবাদিদেব মহাদেবের কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত শুনিতে তাহা হইলে এ কথা বলিতে না।

গন্ধর্ব্ব বিদায় লইয়া মহাদেবের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। মহাদেব তুষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন; তখন গন্ধর্ব্ব প্রার্থনা করিলেন, তিনি মহেশ্বরের মুখে সঙ্গীত শুনিতে অভিলাষ করেন। মহেশ্বর উত্তর করিলেন, তুমি আমার সঙ্গীত শুনিবার উপযুক্ত পাত্র নও; বিষ্ণুই

একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। যদি তিনি কখন আমার সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি।

গন্ধর্ব্ব তখন বিষ্ণুর উদ্দেশে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া দর্শন দিলে গন্ধর্ব্ব তাঁহার প্রার্থনা সকাতরে নিবেদন করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। বিষ্ণুর আজ্ঞাক্রমে তখন সুমেরু পর্ব্বত-শিখরে মহতী সভার আয়োজন হইল। তথায় সকল দেবতা মুনিঋষি গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। বিষ্ণুর অনুরোধে শঙ্করজী সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সে সঙ্গীত এতই মধুর যে বিষ্ণু দ্রবীভূত হইয়া সলিলরূপে প্রবাহিত হইলেন। তখন মহেশ্বর ত্বরায় উঠিয়া সেই বিগলিত ধারা কমণ্ডলুতে ধারণ করিলেন। কমণ্ডলু উছলিয়া ধারা প্রবাহিত হইল। পদ্মযোনি তখন মহাদেবের হস্ত হইতে কমণ্ডলু গ্রহণ করিলেন।

তারপর ভগীরথ কর্ত্তৃক সেই পবিত্রধারা ধরাধামে আনীত হয়। সে পুণ্য কথা সকলেই অবগত আছেন সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বাবা বলিতেছিলেন,—বেদ পুরাণ প্রভৃতি যত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করা যায়, উহা কেবল মনকে নিশ্চয় করাইবার জন্য। মনে বিশ্বাস দৃঢ় হইলে পাঠের আর প্রয়োজন হয় না।

সদ্‌গ্রন্থ যেমন সৎসঙ্গ, সজ্জন ব্যক্তিও তেমনি সৎসঙ্গ। এই সঙ্গের প্রভাব অতি গুরুতর। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা, হিরণ্যকশিপু-পুত্র প্রহ্লাদের দুইটী গল্প বলিলেন, প্রথমটী বাল্যকালের। একদা প্রহ্লাদ খেলা করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক কুম্ভকারের পোণের নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। কুম্ভকার তখন কতকগুলি মৃন্ময় পাত্র পোণে পুড়াইতেছিল। পোড়ান শেষ হইলে কুম্ভকার একে একে

তাহা টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। দেখিল, একটী পাত্রমধ্যে একটী বিড়াল অক্ষত দেহে অবস্থান করিতেছে। অগ্নির প্রচণ্ড উত্তাপে তাহার কোন অনিষ্ট হওয়া দূরে যাক্ তাহার একটী লোম পর্য্যন্ত দগ্ধ হয় নাই। তদ্দর্শনে কুম্ভকার সাতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, হরি যাহাকে রক্ষা করেন, কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে মারে। কুম্ভকারের এই কথাগুলি প্রহ্লাদের অন্তরে গভীর অঙ্কপাত করিল। তিনি বহু বিপদে পড়িয়া এই অমূল্য সত্য বিস্মৃত হন নাই। পরে যখন তিনি হস্তিপদতলে, অগ্নিমধ্যে, পর্ব্বতশিখর হইতে সমুদ্র মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি এই অমূল্য সত্য বিস্মৃত হয়েন নাই। শ্রীহরির অপার করুণায় মুগ্ধ হইয়া তিনি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলেন—তাঁহার চিত্ত আরও আকৃষ্ট হইল ভগবানের প্রতি। এত বিপদের মাঝে কুম্ভকারের মহাবাক্য তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই। এই বাক্যই তাঁহার সৎসঙ্গ।

তারপর অসৎসঙ্গের প্রভাব কতদূর বিষময়, তাহাও এই মহা ভক্ত প্রহ্লাদের চরিত্রে দৃষ্ট হয়। বাবা বলিলেন, প্রহ্লাদ যখন সিংহাসনারূঢ় হইলেন, তখন তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিষ্ণুদ্বেষী পারিষদ। দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্য্য নিয়ত তাঁহাকে বলিতেন, "বিষ্ণু তোমার বংশের শত্রু, অতএব তাঁহার পূজা তোমার পক্ষে বিধেয় নহে। পিতৃবৈরীকে শাস্তি দেওয়া পুত্রের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য।" প্রহ্লাদের মন তখন হরিভক্তি হারাইয়াছে—বিলাস-ব্যসনে মন মাতিয়া উঠিয়াছে—রাজকার্য্যে মন লিপ্ত হইয়াছে। এমন সময় একদিন প্রহ্লাদ তাঁহার কুলগুরু শুক্রাচার্য্যকে গৃহে ভোজনার্থে নিমন্ত্রণ করিলেন। শুক্রাচার্য্য নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তি পিতৃহত্যাকারীকে শাস্তি না দিয়া সমাদর করে, আমি তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি না।

গুরুর এই প্রত্যাখ্যান প্রহ্লাদের মনে বড় আঘাত করিল। তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন, তাঁহারই অন্যায় হইয়াছে। অতঃপর তিনি উত্তেজিত হইয়া বিষ্ণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন; প্রধান সেনাপতি আহূত হইলেন; বিপুল বাহিনী গঠিত হইল; শুক্রাচার্য্য পরামর্শ দিতে লাগিলেন; রাজ্যময় বিপুল সমর-আয়োজন চলিতে লাগিল। এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যষ্টি-হস্তে প্রাসাদ-দ্বারে দর্শন দিলেন। সৈনিক পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমি রাজদর্শনপ্রার্থী, তোমরা বাধা দেও কেন?" সৈনিক কহিল, "রাজার বিনা হুকুমে আমরা তোমাকে যাইতে দিতে পারিব না।" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "তবে যাও, রাজার হুকুম লইয়া এস।"

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর প্রহরী তখন রাজ-আদেশ আনিতে গেল। রাজা প্রহ্লাদ তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণ সভাতলে আসিয়া যষ্টি ভূপৃষ্ঠে রক্ষা করত রাজাকে অভিবাদন করিলেন; কহিলেন, "অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিলাম—"

প্রহ্লাদ,—তোমার কি প্রয়োজন বৃদ্ধ?

বৃদ্ধ,—শুনিলাম আপনি বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন।

প্রহ্লাদ,—ঠিকই শুনিয়াছ।

বৃদ্ধ। আমারও বহুদিন হইতে বাসনা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করি; কিন্তু তাঁহার বাসস্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া এতকাল আমার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। তাই আজ যখন শুনিলাম আমাদের মহারাজ বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন ভাবিলাম আমাদের মহারাজ নিশ্চয়ই অবগত আছেন, কোথায় বিষ্ণুর দর্শন পাওয়া যাইবে। আমি সেই সংবাদটীর জন্যে আপনার নিকট আসিয়াছি।

বৃদ্ধের কথায় প্রহ্লাদ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ত জানেন না বিষ্ণু কোথায় অবস্থান করেন। একদিন বুঝি জানিতেন, একদিন বুঝি অপরকে সন্ধান বলিয়াও দিয়াছিলেন। কিন্তু আজ? তিনি এখন কোন সন্ধান রাখেন না।

বৃদ্ধ রাজাকে চিন্তিত দেখিয়া কহিলেন, "বুঝিলাম, আপনি বিষ্ণুর কোন সন্ধান অবগত নহেন; অথচ যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইতেছেন। যাই, যদি অন্যত্র কোন সন্ধান পাই।"

রাজা,—সত্যই ব্রাহ্মণ, আমি তাঁহার সন্ধান জানি না।

বৃদ্ধ,—তবে আর এখানে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া কি হইবে? যাই— আপনি দয়া করিয়া কোন ব্যক্তিকে আমার লাঠিটা উঠাইয়া দিতে বলুন—বুড়া হইয়াছি, হেঁট হইতে কষ্ট হয়।

রাজা জনৈক প্রহরীকে লাঠিটা উঠাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। বলিষ্ঠ-দেহ প্রহরী লাঠিটা তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু অশক্ত হইল। রাজার শরীর-রক্ষী চেষ্টা করিলেন—বিফল হইলেন। একে একে অনেকেই আসিলেন, কিন্তু কেহই বৃদ্ধের লাঠিটা তুলিতে সমর্থ হইলেন না। যে লাঠিখানি এক স্থবির বৃদ্ধ কিছু পূর্ব্বে অবলীলাক্রমে হস্তে ধারণপূর্ব্বক আসিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে বড় বড় বীর, বড় বড় যশস্বী যোদ্ধা একটুও নড়াইতে সমর্থ হইলেন না দেখিয়া প্রহ্লাদ চমকিত হইলেন; তাঁহার সহসা স্মরণ হইল, যিনি স্ফটিক-স্তম্ভ-মধ্য হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই এখন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তিতে এই যষ্টির মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, "আমিই এতদিন শ্রীহরিকে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, কিন্তু সেই অপার করুণাসাগর আমাকে ত বিস্মৃত হ'ন নাই! কত দয়া তাঁর!"

বহুকাল পরে শ্রীহরিকে স্মরণ হওয়ায় মহাভক্ত প্রহ্লাদের চিত্ত

বিগলিত হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে সিংহাসন হইতে নামিয়া বৃদ্ধের চরণের উপর লুটাইয়া পড়িলেন। অশ্রুতে চরণ সিক্ত করিয়া আবেগভরে কহিলেন, "প্রভু, এতদিনে দাসকে স্মরণ হইল!"

বৃদ্ধবেশী বিষ্ণু কহিলেন, "আমি ত তোমাকে ভুলি নাই প্রহ্লাদ, তুমিই আমাকে ভুলিয়াছিলে।"

সৎ ও অসৎ সঙ্গের প্রভাব কিরূপ তাহা বুঝাইয়া বাবা বলিলেন, যতক্ষণ মানবের অহমিকা থাকে, ততক্ষণ সে স্বীয় কর্ম্মফলের জন্য দায়ী। আমাদের তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটী উপাখ্যান বলিলেন।—

কোন এক ধনী তাঁহার গৃহ-সন্নিকটে উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন; উদ্যানের মধ্যে এক সুন্দর পুষ্করিণী খনন করাইয়া নিত্য তাহার কূলে বসিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। সরোবরের জল স্বচ্ছ ও গভীর। পাছে এই জল স্পর্শ করিলে ইহার স্বচ্ছতা নষ্ট হয়, তাই তিনি নামিবার ঘাট বা সোপান নির্ম্মাণ করান নাই। চতুর্দ্দিকের পাহাড় বা পাড় এত উচ্চ ও খাড়া যে, সরোবরে নামিবার বা উঠিবার কোন উপায় ছিল না।

একদা একটী গাভী পিপাসার্ত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; দূর হইতে উল্লিখিত জলাশয় দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া তথায় আসিল। কিন্তু নামিবার কোন পথ দেখিল না। সরোবরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া যখন কোন উপায় দেখিল না, তখন সে জলের উপর লাফাইয়া পড়িল। প্রাণ ভরিয়া জলপান করিল, পরে উপরে উঠিবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। কোন উপায় দেখিল না, চতুর্দ্দিকে পাড় সোজা উঠিয়াছে, পা রাখিবার ঠাঁই নাই; জল এত গভীর, মৃত্তিকা স্পর্শ করিবার উপায় নাই। গাভী চতুর্দ্দিকে সাঁতার কাটিয়া উপায় অন্বেষণ করিয়া

বেড়াইতে লাগিল; অবশেষে ক্লান্ত হইয়া গভীর জলে ডুবিয়া মরিল।

পরদিবস প্রাতে উদ্যান ও সরোবরের মালিক যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পূজায় বসিয়াছেন, তখন গোবধজনিত পাপ, মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইল; কহিল, "তোমার এই সরোবরে ডুবিয়া একটী গাভী প্রাণ হারাইয়াছে। ইহার জন্য দায়ী তুমি—আমি তোমাকে আশ্রয় করিতে আসিয়াছি।"

মালিক,—আমার হস্ত দ্বারা এই সরোবর খনিত হয় নাই—অপরের হস্ত দ্বারা হইয়াছে। হস্তের কর্ত্তা ইন্দ্র; যদি কাহাকেও এই পাপের জন্য দায়ী করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইন্দ্রকে করিতে হইবে। এই উদ্যান বা সরোবর কিছুই আমার দ্বারা হয় নাই। সুতরাং আমি দায়ী নই।

পাপ প্রস্থান করিল এবং স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা বলিল। ইন্দ্র কহিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"

তিনি মর্ত্ত্যধামে আসিলেন এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করত সরোবর তীরে আসিলেন। উদ্যানের মালিক তথায় উপস্থিত ছিলেন। ছদ্মবেশী ইন্দ্র উদ্যানে ঘুরিতে ঘুরিতে দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষাদির বহু সুখ্যাতি করিলেন। মালিক গর্ব্বস্ফীত হইয়া কহিলেন, "এই সকল বৃক্ষাদি বহু কষ্টে সংগ্রহ করিয়া স্বহস্তে আমি রোপণ করিয়াছি।" ছদ্মবেশী ইন্দ্র জলাশয়ের তীরে আসিয়া স্বচ্ছ জলের বহু সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন, "এমন সুন্দর সরোবর সচরাচর দৃষ্ট হয় না; এমন স্বচ্ছ জল, তল পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে—।" মালিক কহিলেন, "আমি গভীর করিয়া এই সরোবর কাটাইয়াছি—স্বচ্ছতা রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, জল যে কেহ স্পর্শ করিবে সে উপায়ও রাখি নাই।"

ছদ্মবেশী তখন বলিয়া উঠিলেন, "সবই তুমি করিয়াছ, আর পাপ-গ্রহণের সময় বুঝি আমি ?"

গল্প শেষ করিয়া বাবা কহিলেন, পুণ্য-প্রত্যাশী হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে গিয়া যদি বিধিবিরুদ্ধ কোন অন্যায় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার ফল সেই কর্ম্মীকে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু কেহ যদি নিষ্কামভাবে ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধিতে সকল কর্ম্ম করিয়া যায়, তাহা হইলে শুভাশুভ কোন কর্ম্মেরই ফলভোগ তাহাকে করিতে হয় না। যতক্ষণ চিত্তে অহমিকা ভাব, ততক্ষণ সকল কর্ম্মের জন্য কর্ম্মী দায়ী। কর্ত্তাই কর্ম্মের ফলভোগী হয়। কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া অকর্ত্তৃ-বুদ্ধিতে ব্রহ্মার্পণভাবে কর্ম্ম করিয়া গেলে সে কর্ম্মে কোন বন্ধন হয় না। এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ গীতার সকল কর্ম্মের ফলাফল তাঁহাকে অর্পণ করিয়া অকর্ত্তৃভাবে সকল কর্ম্ম সমাধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

প্রশ্ন—কি করিলে বাবা, রিপু দমন করা যায় ?

উত্তর—কাম দমন হয় বস্তু বিচার দ্বারা,

ক্রোধ—ক্ষমা দ্বারা,

লোভ—সন্তোষ দ্বারা,

হিংসা—প্রেমের দ্বারা,

মোহ—বিবেক দ্বারা এবং

অহঙ্কার—বিচার ও নিরভিমান দ্বারা।

তারপর বাবা এই সব রিপু সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়া বলিলেন, সাধুরা উপদেশ শুনিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, তাঁহারা সকল সময় উপদেশ 'ইয়াদ' রাখিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করেন।

বাবা অতি মধুরকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন,—

শিবোঽহম্
শুদ্ধোঽহম্
নিরঞ্জনোঽহম্
নির্ব্বিকারোঽহম্
সচ্চিদানন্দ-স্বরূপোঽহম্।

বাবা বলিলেন, ইহাই পরমহংসদের মূলমন্ত্র। আমাদের ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব সোজা কথায় একদিন বলিয়াছিলেন, অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা' ইচ্ছা তাই কর্।

একদিন বাবা বলিয়াছিলেন,—

দাক্ষিণ্যং স্বজনে, দয়া পরজনে, শাঠ্যং সদা দুর্জ্জনে।
প্রীতিঃ সাধুজনে, নয়ো নৃপজনে, বিদ্বজ্জনেষ্বার্জ্জবম্॥
শৌর্য্যং শত্রুজনে, ক্ষমা গুরুজনে নারীজনে সৌম্যতা।
যে চৈবং পুরুষাঃ কলাসু কুশলাস্তে শৈবলোকে স্থিতাঃ॥

বাবা একদা কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, আত্মনির্ভরতা মনে শক্তি আনয়ন করে। আমি অবলা, শক্তিহীনা, এ কথা চিন্তা করিতে নাই। আমি নিত্য শুদ্ধ আত্মা, আমার মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে, এইরূপ চিন্তাই শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি যত শক্তি জাগরিত করিবে, অফুরন্ত শক্তি ততই তাহাকে বরণ করিবে। বিপদে পড়িলে ধৈর্য্য ও বিচার প্রয়োজন, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা কহিলেন,—পেশওয়ারের নিকট হাতী-মরদান নামক একস্থানে একটী সৈন্যাবাস ছিল; এখন আছে কিনা জানি না। এই সৈন্যাবাসে এক জন পাঞ্জাবী-হিন্দু সিপাহীর কাজ করিত। একা রন্ধনাদি করিতে তাহার কষ্ট হইতেছিল; গৃহে

স্ত্রীকে লিখিল, তুমি এখানে চলিয়া আসিবে, আমার ছুটি নাই—যাইতে পারিলাম না। স্ত্রী পত্রপ্রাপ্তি মাত্র পেশওয়ার অভিমুখে যাত্রা করিল। দেশ হইতে টিকিট কাটিয়া গন্তব্য ষ্টেশনে নিরাপদে আসিয়া নামিল। সে স্থান হইতে সেনাবাস ১৫।১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনে নামিয়া যুবতী একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিল। তাহার বয়স ছিল, রূপ ছিল, দেহে শক্তিও ছিল। পাঞ্জাবী রমণীরা সাধারণতঃ দুর্ব্বলা নহে। তাহারা বাল্যাবস্থায় নির্ভয়ে মহিষের বাঁটে মুখ দিয়া দুগ্ধপান করে। সে যাই হউক, যুবতী একাই হাতী-মরদানে গাড়ীতে উঠিয়া চলিল। অন্য কোন সহযাত্রী না থাকায় একাই সমস্ত ভাড়া বহন করিতে স্বীকৃত হইল; গাড়ী চলিল। চালক একজন পাঠান। গাড়ী ছাড়িয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল, মেয়েটা একা চলেছে, সঙ্গে কেহ নাই—গায়ে অনেক গহনা—বয়সও কম। চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনে কু-মতলব উপস্থিত হইল। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর সে পথ হইতে গাড়ী মাঠে নামাইল। রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী নামালে কেন?" চালক উত্তর করিল, "ঘোড়ার দানা নাই, নিকটের গ্রাম হইতে দানা লইয়া আসিতেছি, তুমি একটু অপেক্ষা কর।"

চালক প্রস্থান করিলে রমণী গাড়ীর মধ্যে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল দুইজন পাঠান মাঠের উপর দিয়া গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে; তাহাদের পশ্চাতে চালক। পাঠান দুই জন অতি বলিষ্ঠ; তাহাদের হাতে তলোয়ার। রমণী বুঝিল, তাহাদের উদ্দেশ্য ভাল নয়। সে ভীত হইলেও বুদ্ধি হারাইল না। উচ্চকণ্ঠে চালককে কহিল গাড়ী জল্‌দী চালাও, অনেক দেরী হয়ে গেল।

চালক উত্তর করিল "আমাদের গাড়ী ডাকুতে পাকড়েছে—ছেড়ে দিলেই গাড়ী চালাব।"

পাঠানদ্বয় রমণীকে আদেশ করিল, "তোমার গায়ের সব গহনা আগে খুলে দেও—তারপর অন্য কথা।"

স্ত্রীলোকটী বুঝিল, দস্যুর অবাধ্য হইলে বলপূর্ব্বক অলঙ্কার অপহৃত হইবে। তখন সে গাড়ী হইতে নামিয়া অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিতে লাগিল এবং একে একে তৎসমুদয় দস্যুর নিকট নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দস্যু কহিল "অলঙ্কার দিলেই যে তুমি পরিত্রাণ পাবে, তা' মনে করো না,—তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হ'বে।"

ঘোর সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াও রমণী বুদ্ধি হারাইল না। সে সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। যখন দেখিল, দস্যুদ্বয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অলঙ্কার-নিচয় ভূপৃষ্ঠ হইতে কুড়াইয়া লইতে ব্যস্ত, তখন সে প্রথম ব্যক্তিকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া তাহার হাত হইতে তরবারি ছিনাইয়া লইল। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ অসতর্ক ছিল; কিছু বুঝিবার পূর্ব্বে তাহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইল। রমণী প্রথম ব্যক্তিকে নিহত করিয়া বিদ্যুৎগতিতে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আক্রমণ করিল। হতভাগ্য আত্মরক্ষা করিবার পূর্ব্বেই ভূলুণ্ঠিত হইল। তৎপরে চালকের পানে ফিরিয়া কহিল, এইবার তোমার পালা।

চালক ভীত হইয়া কহিল "আমার কোন অপরাধ নাই—"

রমণী—তুমিই প্রধান অপরাধী। ছল করিয়া গ্রামে গিয়া তুমি এই দস্যুদিগকে ডাকিয়া আনিলে—তোমার নিস্তার নাই।

চালক পলায়নোদ্যত হইলে রমণী ঝটিতি তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল; সে নিরস্ত্র হইলেও তাহাকে মারিতে রমণীর কোন সঙ্কোচ হইল না। চালক ধরাশায়ী হইলে রমণী তাহার অলঙ্কারগুলি কুড়াইয়া লইল; তারপর গাড়ীখানাকে টানিয়া রাস্তার উপর উঠাইল। রক্তাক্ত তরবারিখানি সঙ্গে লইতে ভুলিল না। তখন সে নিজেই গাড়ী

চালাইতে লাগিল। পথিকের নিকট ঠিক পথ জানিয়া লইয়া অবশেষে সে সৈন্যাবাসে উপস্থিত হইল এবং সে অঞ্চলের কর্ত্তা কর্ণেল সাহেবের দর্শনপ্রার্থী হইল। তখনও সে গাড়ী হইতে নামে নাই, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎও করে নাই। অচিরে সাহেব আসিয়া দর্শন দিলেন। রমণী তখন গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিল, পরিশেষে সেই রক্তাক্ত তরবারি সাহেবের চরণসমীপে রক্ষা করিল। সাহেব সাতিশয় প্রীত হইলেন। রমণীর অসাধারণ সাহস, বুদ্ধি ও শক্তির পরিচয় পাইয়া সাহেব কহিলেন "তুমি ধর্ম্মরক্ষার্থে যা করেছ, তাহার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে এই তরবারি ও গাড়ীঘোড়া দিলাম। তোমার স্বামীর প্রতিও আমার নজর থাকিবে।" নজর যে ছিল তাহার পরিচয় সাহেব সত্বর দিয়াছিলেন ;— তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছিল।

গল্পটী বলিয়া বাবা কহিলেন, বিপদের সময় ভয় পাইলে বিপদ্ কমে না অধিকন্তু বিপদ্ বৃদ্ধি পায়। তিনি বলিলেন "ভক্তি, শ্রদ্ধা, সাহস, শক্তি আনন্দ সব চিজ অন্দর মে হ্যায়। অন্দরমে নেহি রয়নেসে কিধারসে আয়েগা ? এ সব চিজ যেৎনা বাড়ায়েগা ওৎনাই বিকাশ হোয়ে গা।"

নবম তরঙ্গ

শ্রীশ্রীসাধুবাবা একদা একটী গল্প শুনাইয়াছিলেন—মুসলমান আমলে লাহোরে সেরেস্তা খাঁ নামক এক নবাব ছিল। তাহার এক বিচক্ষণ গুরু ছিলেন তাঁহার নাম শা চরগ ফকির। নবাব সেরেস্তা খাঁ একদিন অতিশয় একটী গর্হিত কর্ম্ম করায় বিপন্ন বাদীপক্ষ, পীর সাহেব শা চরাগের শরণাপন্ন হয়। শা চরাগ ঐ বিষয় বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখিয়া

অবশেষে সেরেস্তাখাঁ নবাবের নিকট পাঞ্জাবী ভাষায় কবিতায় একখানি পত্র লিখিলেন। কবিতাটী এইরূপ—

"কহে শা চরাগ সেরেস্তা খাঁন্ নু।
কুছ্ খানা, কুছ্ পেন্না, কুছ্ দেনা রাহারহমান্ নু।
এডা কেবর না কিজিয়ে, গোরাকে মেমান্ নু।
ওড়ক পিঙ্গা টুট্না, ক্যা হোগে চড়ি আসমান্ নু॥"*

এই কবিতাটীর বাবা এইরূপ অর্থ বলিলেন—শা চরাগ ফকির সেরেস্তা খাঁ নবাবকে বলিতেছেন—কিছু খাওয়া কিছু পরিধান করা এবং শ্রীভগবানের নামে বা ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যয় করা ইহাই হইল মনুষ্য জীবনের প্রধান কার্য্য। এত বড় অত্যাচার কখনই করা উচিত নয়, যাকে এক দিন কবরের অতিথি হইতে হইবে। মনে রাখিও, দোলনা যত উর্দ্ধেই উঠুক না কেন, একদিন অবশ্যই সে ছিঁড়িয়া পড়িবে। অর্থাৎ মনুষ্য যত উর্দ্ধেই উঠুক, তাহার যতই মান, যশঃ, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা হউক না কেন, তাহার অবশ্যই একদিন মৃত্যু হইবে। রাজ্যপাট চিরদিনের নয় ইহা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করা উচিত।

উক্ত পত্র পাইয়া নবাব সেরেস্তা খাঁর বিবেক জাগ্রত হইল এবং তিনি ঐ গর্হিত কার্য্যের প্রত্যাহার করিলেন।

বাবা আর একটী হিন্দি ভাষায় দোঁহা শুনাইলেন—

"কাম ক্রোধ-মদ মোহ ত্যজ, কর ভজন নিষ্কাম।
শ্রেষ্ঠ পদার্থ ভোগ জগৎকে, অন্তে মিলে সুখধাম॥

---

*নু=কে। রাহা-রহমান=ভগবান। এডা=এত ; বেশি। কেবর=অন্যায় ও গর্হিত। না কিজিয়ে=করিও না। গোরাকো=কবরের। মেমান্=অতিথি। পিঙ্গা=দোলনা। টুট্না=ছিঁড়িয়া পড়িবে। ওড়ক=অন্তে। আসমান্-নু=আকাশে বা উর্দ্ধে।

অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, ও মোহ ত্যাগ করত নিষ্কামভাবে ভজন বা উপাসনা কর। এতদ্দ্বারা জগতে শ্রেষ্ঠ পদার্থ ও পরিণামে শ্রেষ্ঠ ধাম মিলিবে।

অপর একদিন বাবা আমাদিগকে শত্রুজিৎ রাজার উপাখ্যান বলিলেন। এই রাজা মহা বলিষ্ঠ ও বীরপুরুষ ছিলেন। তাঁহার রাজ্য-পার্শ্বে যে সকল সামন্ত রাজা ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন। এতন্নিমিত্তে তিনি সকলের নিকট "শত্রুজিৎ" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকে শত্রুজিৎ বলিয়া ডাকিলেও তাঁহার জননী কখন তাঁহাকে এ নামে অভিহিত করিতেন না। এতজ্জন্য রাজা ক্ষুদ্ধ হইয়া অভিমানভরে জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আমাকে শত্রুজিৎ বলিয়া ডাক না কেন মা?"

জননী কহিলেন, "পুত্র, বাহিরের কতিপয় শত্রুকে জয় করিতে সমর্থ হইলেই লোকে প্রকৃতপক্ষে শত্রুজিৎ হয় না। যে ব্যক্তি অন্তরের রিপু-নিচয়কে জয় করিতে সমর্থ, সেই প্রকৃতপক্ষে শত্রুজিৎ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে।"

এই কাহিনী বলিয়া বাবা আমাদিগকে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের একটি বচন শুনাইলেন—

শেতে সুখং কস্তু? সমাধিনিষ্ঠো;
জাগর্ত্তি কো বা? সদসদ্বিবেকী।
কে শত্রবঃ সন্তি? নিজেন্দ্রিয়াণি;
তান্যেব মিত্রাণি জিতানি যানি॥ (মণিরত্নমালা)

১০

অর্থাৎ

কে সুখে শয়ান রহে ?—ধ্যাননিষ্ঠ জন।
কে জাগ্রত ?—ভালমন্দ বোধপরায়ণ ॥
শত্রু কারা ?—নিজ নিজ ইন্দ্রিয়নিচয়।
মিত্রও তাহারা—যবে বশীভূত রয় ॥

বাবা বলিলেন, যেমন অশিক্ষিত অবশীভূত অশ্ব আরোহীর পক্ষে বিপজ্জনক, তেমনি সেই অশ্ব বশীভূত হইলে আরোহীর মহামিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

মিথ্যাভাষণ কতদূর ভয়ঙ্কর ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহা বাবা আমাদিগকে একটী গল্প বলিয়া বুঝাইলেন।

একদা এক তরুণ যুবক নকরীপ্রার্থী হইয়া এক ধনী শেঠের নিকট উপস্থিত হইল। শেঠ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বেতন চাও ?"

"আমি কোন বেতন চাই না ; তবে আমার একটী প্রার্থনা আছে।"

"কি প্রার্থনা বল ?

"আমি বৎসরে দুইটী মিথ্যা বলিব, সে জন্য আপনি আমাকে কোন শাস্তি দিতে পারিবেন না, তিরস্কারও করিতে পারিবেন না।"

শেঠজী চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তিনি কার্য্যব্যপদেশে বহু মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন ; লোকটা বৎসরে দুইটা মাত্র মিথ্যা বলিবে। সুতরাং ইহা বিশেষ কিছু দোষের নয়। তিনি তৎক্ষণাৎ ভৃত্যের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

শেঠজীর সন্তানাদি ছিল না ; গৃহে মাত্র পতিপরায়ণা স্ত্রী। ভৃত্য এই শেঠদম্পতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিল এবং অত্যল্পকাল মধ্যে

উভয়ের স্নেহাকর্ষণ করিল। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহারা ভৃত্যের ঐকান্তিক সেবায় মুগ্ধ হইয়া বিস্মৃত হইলেন যে, সে একজন ভৃত্যমাত্র। এইরূপে একবর্ষ কাটিয়া গেল; সেই এক বর্ষের মধ্যে ভৃত্য একটীও মিথ্যা কথা বলিল না।

দ্বিতীয় বর্ষে শেঠদম্পতি ভৃত্যের মধুময় আচরণে বিস্মৃত হইলেন, কি সর্ত্তে ভৃত্য কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল। যখন দ্বিতীয় বর্ষ শেষ-প্রায়, তখন একদিন ভৃত্য অতি বিষণ্ণবদনে শেঠনীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার বিশুষ্ক বদন দেখিয়া শেঠনীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বাবা?"

"মা, সে দুঃসংবাদ আপনার নিকট কিরূপে প্রকাশ করিব?—আমাকে ক্ষমা করুন।"

"তোমাকে বল্‌তেই হবে।"

"আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে—সে নিদারুণ সংবাদ আমি বলিতে পারিব না।"

ভৃত্য যতই কথাটা গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই শেঠনীর কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। অনেক পীড়াপীড়ির পর ভৃত্য কহিল, "মা, আমি শুনিলাম, বাবা নাকি পুনরায় বিবাহ করিতেছেন; সব স্থির হইয়া গিয়াছে। কথাটা শুনিয়া অবধি আমার মনে শান্তি নাই।"

শেঠনী প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করিলেন না। পরে বিচার করিয়া দেখিলেন, একটা মিথ্যা কথা রচনা করিয়া বলিবার বালকের কোন স্বার্থ নাই। তদ্ব্যতীত তিনি নিঃসন্তান, হয়ত পুত্রার্থে স্বামী পুনঃ দারপরিগ্রহ করিতেছেন। কথাটায় যখন তাঁহার প্রত্যয় জন্মিল, তখন তিনি রোদন আরম্ভ করিলেন।

বালক তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "মা, আপনি কাঁদিবেন না—আমি উপায় দেখিতেছি।"

"আর কি উপায় আছে বাবা ?"

"আমি নিকটে একস্থানে একটি সাধু দেখিয়াছি। তাঁহার লম্বা জটা, সর্ব্বাঙ্গে ছাই, কৌপীন মাত্র সম্বল। নিশ্চয়ই তিনি বড় গোছের সাধু হইবেন। আমি তাঁহার কাছে চলিলাম, দেখি যদি তিনি কোন উপায় করিতে পারেন।"

ভৃত্য প্রস্থান করিল। ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, শেঠনী একই স্থানে বসিয়া রোদন করিতেছেন। বালককে দেখিয়া তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল বাবা ? তিনি কোন উপায় করলেন ?"

ভৃত্য আনন্দভরে কহিল, "ঠিক হয়ে গেছে মা—আর কোন চিন্তা নাই। তিনি যে উপায় বলে দিলেন, তাহা অতি সহজ।"

"কি উপায় বাবা।"

"শেঠজীর একটী শ্মশ্রু চাই, তাহা গোপনে সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহা সংগৃহীত হইলে সাধু মন্ত্রপূত করিয়া দিবেন—আপনি সেই মন্ত্রপূত শ্মশ্রু মাদুলির ভিতর পূরিয়া বামহস্তে ধারণ করিবেন। যে মুহূর্ত্তে ধারণ করিবেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই শেঠজী আপনার একান্ত বশীভূত হইবেন এবং পুনরায় বিবাহের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবেন।"

"কিন্তু শ্মশ্রু কিরূপে সংগ্রহ করিব ?"

"ক্ষুর দ্বারা কাটিয়া লইতে হইবে ; অবশ্য শেঠজী যখন নিদ্রাভিভূত হইবেন, তখন এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।"

"ক্ষুর কোথায় পাইব ?"

"আমি আপনাকে সংগ্রহ করিয়া দিব।"

"বাবা যথার্থই তুমি আমার পুত্র।"

ভৃত্য প্রস্থান করিল এবং দোকানে গিয়া শেঠজীর সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিল। তাহার মুখ অতিশয় বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল। তদ্দৃষ্টে শেঠজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বাবা? তোমার মা কি তোমাকে তিরস্কার করেছেন?"

ভৃত্য কহিল, "না।"

"তবে তুমি এত চিন্তিত কেন?"

"সে কথা আমি বলিতে পারিব না বাবা।"

শেঠ অনেক পীড়াপীড়ি করাতে ভৃত্য অবশেষে বলিল, "শেঠনী আপনার প্রাণনাশের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন এবং অদ্য রাত্রিতেই সে কার্য্য সমাধা করিবেন।"

শেঠজী কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার স্ত্রী অতি সাধ্বী ও পতিপরায়ণা; এরূপ জঘন্য কাজ তাঁহার পত্নী দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভবপর নয়। তথাপি তাঁহার মনের ভিতর কেমন একটা সন্দেহ মাথা জাগাইয়া উঠিল। স্ত্রী-চরিত্র, শাস্ত্রে বলিয়াছে, অতীব দুর্জ্জ্ঞেয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিরূপে এ কথা জানিলে বালক?"

"আমি চক্রান্তের কথা গোপনে শুনিয়াছি।"

"তোমার অসম্ভব কথা আমার বিশ্বাস হইতেছে না।"

"আপনি নিদ্রার ভাণ করিয়া শয্যায় পড়িয়া থাকিলে আমার কথার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন।"

শেঠজী চিন্তামগ্ন হইলেন। ইত্যবসরে বালক তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং শেঠনীর পিত্রালয় অভিমুখে ছুটিল। পিত্রালয় শেঠজীর বাড়ীর

নিকটে। শেঠনীর সহোদর ভ্রাতার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে চুপিচুপি বলিল, "আমার আশঙ্কা হইতেছে অদ্য রাত্রিতে শেঠজী তাঁহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়া গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। আপনারা একটু সতর্ক থাকিবেন—গোলমাল শুনিলে ছুটিয়া আসিবেন।"

শেঠনীর ভ্রাতা এ কথা সহসা বিশ্বাস করিলেন না। ভৃত্য কহিল, "বিশ্বাস করুন বা না করুন আমার তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। তবে আজ রাত্রিটা সজাগ ও সতর্ক থাকিবেন।"

অতঃপর বালক বিদায় লইয়া শেঠজীর এক হিতৈষী প্রতিবেশীর নিকটে গমন করিল। তাঁহাকে কহিল "অদ্য রাত্রিতে শেঠজীকে প্রহার করিতে অথবা দস্যুতা করিতে দুই চারি ব্যক্তি আসিবে বলিয়া শুনিতেছি; ঠিক বলিতে পারি না। যাহা হউক, আপনারা সতর্ক থাকিবেন। যদি কোন গোলমাল শুনিতে পান তাহা হইলে ছুটিয়া যাইবেন।"

ভৃত্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। শেঠজী রাত্রি এক প্রহরে দোকান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহারাদি সমাপনান্তে শয্যায় শয়ন করিলেন। শেঠনী যথাপূর্ব্ব স্বামীর সেবা করিলেন। উভয়ের মন উদ্বেগপূর্ণ। শেঠজী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। যে চিন্তা লইয়া তিনি শয্যাশায়ী, সে চিন্তা নিদ্রাদেবীকে অনেক দূরে রাখিয়াছিল। শেঠের ছলে প্রতারিত হইয়া শেঠনী স্থির করিলেন, স্বামী নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন; তখন তিনি ভৃত্যদত্ত অস্ত্র লইয়া স্বামীর শ্মশ্রু কাটিতে উদ্যত হইলেন। শেঠজী বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া বসিয়া স্ত্রীর হস্ত ধারণ করিলেন এবং অস্ত্রখানা কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া স্ত্রীকে প্রহার করিলেন। স্ত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ও-দিকে স্ত্রীর ভ্রাতা সতর্ক ছিলেন; তিনি ভগ্নীর রোদনধ্বনি শুনিবামাত্র ভগ্নীর

রক্ষার্থে যষ্টিহস্তে তথায় ছুটিয়া আসিলেন এবং ভগ্নীপতিকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। তখন উভয়ের মধ্যে বচসা হইল; বচসা ক্রমে মারামারিতে পরিণত হইল। গোলমাল শুনিয়া শেঠজীর হিতৈষী প্রতিবেশী ছুটিয়া আসিলেন; তিনি তাঁহার বন্ধু শেঠজীর পক্ষ লইয়া দাঙ্গা আরম্ভ করিলেন। নিস্তব্ধ নিশীথে সেই গোলমাল অনেকদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইল। পাড়ার লোকেরা জাগিয়া শেঠজীর বাড়ীর দিকে ছুটিল। ভাবিল, দস্যুকর্ত্তৃক বুঝি শেঠজীর গৃহ আক্রান্ত হইয়াছে। আসিয়া দেখিল, ঘটনা অন্যরূপ। তখন তাহাদের মধ্যে কেহ শেঠজীর পক্ষ, কেহ অপরপক্ষ গ্রহণ করিল। শয্যাগৃহ ছাড়িয়া সকলে অলিন্দে আসিল; অবশেষে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঙ্গা আরম্ভ করিল। মহাকোলাহলে সহর-রক্ষীর নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি প্রহরিবৃন্দসহ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার পিছনে নগরের অর্দ্ধেক লোক আসিল।

সহর-কোটালের আগমনে যুদ্ধক্ষেত্র শান্তভাব ধারণ করিল। তখন তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। শেঠজী কহিলেন, "আমি আমার ভৃত্য-প্রমুখাৎ সংবাদ পাইয়াছিলাম, অদ্য রাত্রিতে আমার স্ত্রী আমাকে অস্ত্রসহ আক্রমণ করিবেন; আমি তাই নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া-ছিলাম। যখন তিনি আক্রমণোদ্যত, তখন আমি তাঁহাকে আক্রমণ করি।"

শেঠজীর যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা তিনি বলিলেন। শেঠজীর ভ্রাতা ও হিতৈষী প্রতিবেশী যথাযথ কহিলেন। সকলের মুখেই ভৃত্যের নাম। তখন ভৃত্যকে ধরিয়া আনা হইল। ভৃত্য কোন কথা লুকাইল না—সকল অপরাধ স্বীকার করিল। স্বীকার করিয়া সে কহিল, "আমি যে সর্ত্তে শেঠজীর নকরী গ্রহণ করিয়াছি, তাহা শেঠজীকে জিজ্ঞাসা করিতে

আজ্ঞা হউক।" শেঠজীর স্মরণ ছিল না, ভৃত্য স্মরণ করাইয়া দিল। কহিল, "আমি চাকরী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, বৎসরে দুইটি মিথ্যা কথা বলিব, এই সর্ত্ত করিয়াছিলাম। শেঠজী এই সর্ত্তে সম্মত হইয়াছিলেন কিনা, তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে আজ্ঞা হউক।"

শেঠজী সর্ত্ত স্বীকার করিলেন।

গল্পটী শেষ করিয়া বাবা কহিলেন, মিথ্যা কথা বলিবার সময় লোক চিন্তা করিয়া দেখে না তাহার ফলাফল কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে। অতএব মিথ্যাভাষণ পরিত্যজ্য।

"সচ্ বরাবর তপ্ নেহি, ঝুট বরাবর পাপ।
যাকো হৃদে সচ্ হ্যায়, তাকো হৃদে আপ॥"

অর্থাৎ,—সত্য সম নাহি তপ, মিথ্যা সম অরি।
হৃদে যার সত্য, সেথা বিরাজেন হরি॥

বাবা বলিতেছিলেন, সঙ্গ হইতেই জীবের স্বভাব গঠিত হয়। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা বলিলেন,—কোন এক রাজা শত্রু জয় করিয়া দুইটী তোতাপাখী গৃহে আনিয়াছিলেন। একটী সাধুগৃহে, অপরটী ম্লেচ্ছ-গৃহে পালিত হইয়াছিল। রাজা দুইটী স্বুবর্ণ পিঞ্জরে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া বারান্দার দুই প্রান্তে তাহা টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। একদা রাজা বারান্দায় পাদচারণা করিতে করিতে একটী পাখীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাহাকে কহিলেন, হরিনাম কর। পক্ষী তৎক্ষণাৎ হরিনাম করিতে লাগিল। তাহাকে ছাড়িয়া অপর পক্ষীর নিকট আসিয়া কহিলেন, হরি বল। পক্ষী অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়া উঠিল। রাজা মহাকুপিত হইয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, ইহাকে এখনি বধ কর। রাজার এই আদেশ শুনিয়া প্রথম পক্ষী বলিয়া উঠিল,—

অহং মুনীনাং বচনং শৃণোমি,
শৃণোতি এষ যবনস্থ বাক্যং।
ন চাস্থ দোষে ন চ মে গুণো বা
সংসর্গ জা দোষগুণা ভবন্তি।

অর্থাৎ

সাধুগৃহে শুনি আমি সাধুর বচন।
ম্লেচ্ছগৃহে অপভাষা শুনে অন্য জন॥
তা'র দোষ, মোর গুণ—কিছুই ত নয়।
সংসর্গবশতঃ যত দোষগুণ হয়॥

বাবা বলেন, ভগবানকে প্রাপ্তির চার উপায়। যথা,—সৎসঙ্গ, দান্তি (দম শম), বিচার সন্তোষ। এই চারটীর মধ্যে যদি কেহ একটিকে দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করে, তবে অপর তিনটিও সহজে আয়ত্ত হয়। যেমন খাটের এক পা শক্ত করিয়া ধরিয়া টানিলে, খাটখানি অন্য তিনটী পা সমেত চলিয়া আসে।

বাবা একদা একটী গল্প দ্বারা এই উপদেশ দিতেছিলেন, সাধুসঙ্গরূপ দুর্গমধ্যে সতত অবস্থান করিবে; যখন-তখন নিদ্রা যাইবে না—অক্ষুধায় আহার করিবে না। সাধু গোপীচন্দ্রের মনে যখন তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল, তখন তিনি গৃহত্যাগ-মানসে জননীর নিকট বিদায় লইতে গেলে, জননী বলিয়াছিলেন, "বৎস, তুমি সর্ব্বক্ষণ সুদৃঢ় কেল্লার মধ্যে বাস করিবে এবং উত্তম শয্যায় শয়ন ও পক্কান্ন ভোজন করিবে।" পুত্র গোপীচন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন, "মা, আপনার আদেশ পালনে আমি অসমর্থ। কারণ আমাকে যত্র তত্র ভ্রমণ, ভিক্ষান্ন ভোজন এবং মৃত্তিকায় শয়ন করিতে হইবে; ইহাই সাধুর নিয়ম।"

জননী কহিয়াছিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে সাধুসঙ্গরূপ দুর্গমধ্যে সতত বাস করিতে বলিতেছি; যখন তুমি নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর হইবে, তৎকালেই শয়ন করিবে এবং ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইলে তবেই আহার করিবে।"

বাবা এক দিবস বলিতেছিলেন, জীব মাত্রেই আসুরী সম্পদ্ এবং দৈবী সম্পদ্ এই দুই প্রকার সম্পদের অধীন। আসুরী সম্পদ্,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার, মিথ্যাচার, হিংসা, চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি। আর দৈবী সম্পদ্,—বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষাদি; অর্থাৎ আসুরী সম্পদের বিপরীত। সাধনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে যতই দৈবী সম্পদের বৃদ্ধি হইবে, ততই আসুরী সম্পদের ক্ষয় হইবে। আসুরী সম্পদকে হীনবল করিবার নিমিত্ত তাহার খোরাক বন্ধ করা আবশ্যক। যে বস্তুর যত অনুশীলন হয়, সে বস্তু ক্রমেই তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এবিষয়ে আমার স্বামী* একদিন গুরুমহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'কিসে নিত্যসত্ত্বস্থ হওয়া যায়?'

গুরুদেব বলিলেন—"তামসিক ও রাজসিক ভাব, সঙ্গ ও চিন্তা ত্যাগ কর; রাজসিক আহার ও বিলাস ত্যাগ কর। বিলাস-দ্রব্যের সঙ্গ হইতে বিলাসিতা ও রজোভাবের বৃদ্ধি হয়। আসুরিক সম্পদের খোরাক বা ইন্ধন দান ও চর্চ্চাদি বন্ধ কর ও দৈবী সম্পদ্ বৃদ্ধি কর। আর সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক ব্যবহার ও সাত্ত্বিক বা সত্যবাক্য এই সমুদয় অভ্যাস কর, ও সৎসঙ্গ, জপ, ধ্যান খুব অভ্যাস কর। সদা সাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইবে ও চিত্তে সাত্ত্বিক কল্যাণ ভাব পোষণ করিবে। দম, দয়া, দানের অনুশীলন কর। 'কলৌ নাম্নৈব কেবলং

* কুমার শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায় (দিঘাপতিয়া)

কলৌ দানৈব কেবলং।' নামে চিত্তের ময়লা ও রজোভাব যাইবে। তিনি বলিলেন—"দয়া ধর্ম্মকা মূল, নরককামূল অভিমান।"

বাবা বলেন, যে সকল বিপদ্ জীবের সম্মুখীন হয়, তাহা তাহারই কর্ম্মফল হইতে সূচিত। অতএব 'এইসি কাম করো যে পিছে দুঃখ নেহি কর্না হোয়!' বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যেন কখন শুভ কর্ম্ম ছাড়া অশুভ কার্য্য না করে।

বাবা বুঝাইলেন, 'সংসারমে যিত্নি আসক্তি, ওত্নিই বন্ধন। আসক্তি কম্তি কর, দুঃখ্ বি কম্তি হোগা। যিন্ যিন্ পদার্থমে আসক্তি হোতি হ্যায়, উস্ পদার্থমে বিচারসে দোষ দৃষ্টি কর্কে উন্কা ত্যাগ কর্না চাহিয়ে।'

বাবা একদিন বলিতেছিলেন, যখন কোনও রাজা মহারাজা যান-বাহনে আরোহণপূর্ব্বক কোথাও গমনাগমন করেন, তখন তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিয়া এক ভাট নানারূপে তাঁহার স্তবস্তুতি করিতে করিতে চলিতে থাকে। পশ্চাতে অপর এক ভাট থাকে, সে বলিতে বলিতে যায়,—"খবর্দ্দার! হুঁসিয়ার হোকে যানা। আপ্কা পিতা পিতামহ বড় বড় বাহাদুর যো, উভি সব্ চলা গয়া। আপ্কোভি এক রোজ যানে পড়ে গা। আগাড়িকা ভাটকো বাৎ নেহি শুন্না। এহি সংসারমে যেত্না পদার্থ সব্হি অনাত্মবস্তু হ্যায়, আপ্কো বিমোহিত কর্নেকা য়াস্তে হ্যায়। উসিমে বিমোহিত নেহি হোনা, ভুল নেহি যানা। বহু মানুসেই সব ভুল হো যাতা। অহঙ্কার মৎ কর্ণা। অহঙ্কারসে মায়ামে বদ্ধ হো যাওগে—হুঁসিয়ার হোকে রহনা। এহি যেতনা লস্কর ফৌজ আপকো কুছ সাহায্য ভি নেহি করেগা। সমুচা যেত্না পার্থিব পদার্থ সব্হি পড়া রহেগা। হামারি বাৎ হর্বখৎ ইয়াদ রাখ্না, ভুল্না নেহি।"

বাবার উপদেশ,—পৃথিবীতে তিন রত্ন আছে,—অন্ন, জল ও মিষ্ট ভাষণ। অন্তর হইতে মিষ্ট বাক্য বলা চাই—বাহিরে দেখান প্রেম, প্রেমই নয়।

বাবার অপর একটী উপদেশ,—মনের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প যতই কমিতে থাকিবে, ততই মনে শান্তি আসিবে। পার্থিব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করত যতই মনকে আত্মচিন্তনে নিয়োগ করিবে, মন ততই স্থির ও শুদ্ধ হইবে। স্নানের পর শুদ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইলে মূর্ত্তি সুন্দরই দেখায়; আবার দেহ যদি অপরিষ্কার থাকে তবে দর্পণেও ঐরূপ অপরিষ্কার মূর্ত্তি দেখা যায়। এইজন্যই চিত্তভূমি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তাহা হইলে চিত্তের নির্ম্মলতা-নিবন্ধন তাহাতে যে প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহাও সুন্দর দেখা যাইবে।

এই উপদেশটী সম্যক্ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বাবা কহিলেন, একদা এক রাজার নিকট দুইজন শিল্পী তাহাদের কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। রাজা সম্মতি দান করিলেন। উভয়ে সাম্না সাম্নি দুই দেওয়ালে অঙ্কন-কার্য্য আরম্ভ করিল। কেহ কাহারও কার্য্য দেখিতে না পায়, এই উদ্দেশে মধ্যে একটা আবরণ দেওয়া হইল। প্রথম শিল্পী বহু পরিশ্রমে দেওয়ালের গায়ে নানাবিধ ফুল লতা পাতা পক্ষী প্রজাপতি প্রভৃতির চিত্র অঙ্কন করিল। দ্বিতীয় শিল্পী প্রাণপণ যত্নে প্রাচীরগাত্র মার্জ্জনপূর্ব্বক দর্পণবৎ মসৃণ ও স্বচ্ছ করিল। তাহার উপর কোন চিত্রই অঙ্কন করিল না।

যথাসময়ে রাজসকাশে সংবাদ গেল যে, শিল্পিদ্বয়ের কার্য্য সমাধা হইয়াছে। রাজা পাত্রমিত্র লইয়া শিল্পকার্য্য দেখিতে আসিলেন। প্রথম শিল্পীর অঙ্কন দর্শনে রাজা প্রীত হইলেন; তারপর দুই দেওয়ালের মধ্যে যে আবরণ ছিল তাহা রাজাদেশে অপসারিত হইল। রাজা সেই

দর্পণবৎ স্বচ্ছ দেওয়ালের পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, প্রথম শিল্পী প্রাচীরগাত্রে যে সকল লতাপাতা অঙ্কিত করিয়াছিল, তৎসমুদয় দ্বিতীয় শিল্পীর স্বচ্ছ প্রাচীরে প্রতিবিম্বিত হইয়া আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। রাজা দ্বিতীয় শিল্পীর কার্য্যে অধিকতর প্রীত হইয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন।

বাবা একদা বলিলেন, বিষয়ের দোষ দর্শন করাও বিষয়ের সঙ্গ করা। কারণ, বিষয়ের দোষ দর্শন করিতে হইলে সে বিষয়ের চিন্তা করিতে হয়। বিষয়ের চিন্তা না করিয়া একেবারে ভুলিয়া যাওয়াই ঠিক। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটী গল্প বলিলেন,—

কোন এক রাজার ইচ্ছা হইল তিনি জ্ঞান লাভ করিবেন। সাধু ব্যক্তির নিকট জ্ঞান লাভ করিতে হয়, এই নিমিত্ত সাধুর অন্বেষণে তিনি চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। দলে দলে সাধু আসিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সে অমূল্য জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বিষয়মুগ্ধ রাজার হৃদয়ে অঙ্কপাত করিল না। তিনি বিরক্ত হইয়া সাধুসজ্জনদের কারারুদ্ধ করিলেন। অতঃপর একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। সাধুভক্তবৃন্দ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সাধুরা যেন রাজসভায় আর না আসেন।

এমন সময় এক মহাতেজস্বী সাধু রাজসভায় আসিয়া দর্শন দিলেন। ভক্তবৃন্দ নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তৎসমুদয় গ্রাহ্য না করিয়া সাধু-সজ্জনের দুঃখমোচনার্থে এবং রাজার সংশয়-ভঞ্জনার্থে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘজটামণ্ডিত মহাতেজস্বী সাধুকে দেখিবামাত্র রাজার মস্তক সম্ভ্রমে নত হইল। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাধুকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং মহার্ঘ আসন প্রদান করিলেন। দুই চারি কথার পর রাজা তাঁহার নিকট উপদেশ-প্রার্থী হইলেন। সাধু

কহিলেন "যে ব্যক্তি উপদেশ প্রদান করে, সে গুরু ; যে উপদেশ লয় সে শিষ্য। যদি তুমি আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি উপদেশ প্রদান করিতে পারি।"

রাজা শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। সাধু তখন কহিলেন, "আমি এখন তোমার গুরু, আমার আদেশ পালন কর।"

"কি আদেশ ?"

"আমার সহিত এস।"

রাজা কোন আপত্তি না করিয়া সাধুর সহিত চলিলেন। নগর বাহিরে আসিয়া উভয়ে দেখিলেন, পথিপার্শ্বে এক মৃত উষ্ট্র পড়িয়া রহিয়াছে। উট ফুলিয়া উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দুর্গন্ধ ছড়াইতেছিল। সাধু রাজাকে উটটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি ?"

রাজা,—মৃত উট।

সাধু,—ভাল করিয়া উহাকে দেখিয়া লও এবং উহার আকৃতির বিবরণ আমাকে দেও।

রাজা যেরূপ দেখিলেন, সেইরূপ বলিলেন। সাধু বলিলেন, "মৃতদেহ অশুচি, যে গৃহে শব থাকে সে গৃহে আহারাদি হয় না। তোমার অন্তরে এখন মৃতদেহের ছবি ; যতক্ষণ না এই মৃতদেহের মূর্ত্তি তোমার অন্তর হইতে দূরীভূত করিতে সমর্থ হইবে, ততক্ষণ তুমি আহার গ্রহণ করিতে পারিবে না।"

সাধু প্রস্থান করিলেন। রাজা উটের মূর্ত্তি ভুলিতে যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পুনঃ পুনঃ চিন্তনের ফলে মনের ভিতর উহা ততই বসিয়া যাইতে লাগিল। দাসদাসী আহার্য্য লইয়া রাজার আশেপাশে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু রাজা তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সেই পূতিগন্ধময় উটকে মন হইতে দূর করিতে না পারিলে, তিনি

কোন আহার্য্য গ্রহণ করিতে পারেন না—গুরুর আদেশ অবহেলা করিতে পারেন না।

কিছুকাল পরে সাধু আসিয়া দর্শন দিলেন। রাজা জিজ্ঞাসিত হইয়া স্বীকার করিলেন যে, মৃত উষ্ট্রকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সাধু তখন কহিলেন, "তবে কেন অনর্থক সাধুগণকে কারারুদ্ধ করিয়া যাতনা দিতেছ? তাঁহারা জ্ঞানী পুরুষ, তোমার মঙ্গলপ্রদ উপদেশই তোমাকে প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু তোমার চিত্ত মলিন থাকায় তুমি তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হও নাই। যতক্ষণ মনের মধ্যে রাগ, দ্বেষ, অস্মিতা, মাৎসর্য্য, অভিনিবেশ এই পাঁচটী রহিয়াছে, ততক্ষণ তুমি উপদেশ-লাভের যোগ্য নও। এ সব ছাড়িলে তবে উপদেশ হৃদয়ে ঠিক ঠিক মত বসিবে, নচেৎ নহে।"

"অস্মিতা প্রভৃতি কি বাবা?"

"অস্মিতা অর্থে সূক্ষ্ম অহঙ্কার। মাৎসর্য্য অর্থে পরশ্রীকাতরতা; অপরের সুখ-ঐশ্বর্য্যদর্শনে নিজে অসুখী হওয়া। অবিদ্যা অর্থে অজ্ঞানতা। অসত্যকে সত্য বস্তু মনে করা; নিজের স্বতন্ত্র আমি-ভাবরূপ ভ্রান্ত সংস্কারকে চিরন্তন সত্য বস্তু মনে করা। এইগুলি হইল অবিদ্যার লক্ষণ। যতদিন পর্য্যন্ত এই সকল ভ্রম দূর না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ অসম্ভব।"

তাই বাবা বলিতেছিলেন, "সতত আত্মচিন্তা কর; সকল ফাল্‌তু কর্ম্ম, ফাল্‌তু বাত্‌, ফাল্‌তু চিন্তা ও স্বার্থ-কামনাদি হইতে মনকে হটাইয়া সদা পরমাত্মায় মনকে একাগ্র ও স্থির করার অভ্যাস কর। মনের প্রবাহ তাঁর দিকে লইয়া যাও—এই উপায় দ্বারাই বিষয়-বাসনা দূর হইবে। বিষয়কে জোর করিয়া এড়াইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে আরও জোর করিবে। বাবা বলেন—

"বিষয় চিন্তন বিপরীত ফল, স্বরূপ চিন্তন সুখদায়॥"

দশম তরঙ্গ

একদা আমরা কৈলাস পাহাড়ে বসিয়া বাবার নিকট একটি গল্প শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সদানন্দ বাবা তৎক্ষণাৎ নিম্নোদ্ধৃত কাহিনীটি বলিলেন :—

একস্থানে মণিরাম নামক এক শেঠ বাস করিতেন। একদা তিনি তাঁহার বিবেকনামক কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া একটী পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বিবেককে প্রশ্ন করিলেন—"কিসের বাণিজ্য করিলে লাভবান্ হওয়া যায়?" বিবেক পরামর্শ দিলেন, "আপনি কস্তুরী, কেশর ও চন্দনের ব্যবসা করুন, তাহা হইলে খুব লাভবান্ হইবেন। ঐ দ্রব্যগুলি অতি মূল্যবান্ এবং প্রায় সকল ব্যক্তিরই আদরণীয়। ঐ পরামর্শ শুনিয়া মণিরাম শেঠ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে স্থানে ঐ সকল সামগ্রী সুলভে পাওয়া যায়, তথায় গিয়া সামগ্রীনিচয় ক্রয় করত তাঁহার জাহাজ পরিপূর্ণ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, ঐ মূল্যবান্ বস্তুগুলি দেশে আনিবেন। কিন্তু পাঁচজন ঠক সে সংবাদ অবগত হইয়া উহা অপহরণ করিবার নিমিত্ত একটি চক্রান্ত করিল। তাহারা সাধুর বেশধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধুনি প্রজ্বলিত করিয়া পথিমধ্যে বসিয়া রহিল। উহারা অধিকাংশ সময় গঞ্জিকা সেবন করিতে লাগিল এবং যে ব্যক্তি সাধু-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উহাদের নিকট আসিতে লাগিল, তাহাদিগকেও আগ্রহসহকারে গঞ্জিকা সেবন করাইতে লাগিল। তাহাতে উহাদের নাম আরও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শেঠের জাহাজগুলি আসিয়া যখন সেই দেশের বন্দরে উপনীত হইল, তখন সাধুবেশধারী পঞ্চ ঠকের খ্যাতিতে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া

উঠিয়াছে। মণিরাম শেঠ উহাদের খ্যাতি শুনিয়া সাধুদর্শন-মানসে তথায় রওনা হইলেন। সাধুগণকে উপহার দিবার জন্য তিনি কয়েক ভরি কস্তুরী, কেশর ও চন্দন সঙ্গে লইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া মণিরাম শেঠ সেই মূল্যবান্ সামগ্রীগুলি তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করত সাধুজ্ঞানে পাঁচজনকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু উহারা তৎসমুদায় তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া পরমানন্দে পূর্ব্ববৎ গঞ্জিকা-সেবনে নিরত রহিল। তদ্দর্শনে মণিরাম শেঠ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, নিশ্চয়ই এই সকল ব্যক্তি এই মহার্ঘ দ্রব্যগুলির উপযুক্ত মূল্য জানে না। তাহা জানিলে কদাচ এমন উত্তম পদ্দার্থ এরূপ অবহেলায় নষ্ট করিতে পারিত না। যখন মলিনমুখে শেঠ এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, তখন ঐ সাধু বেশধারী ঠকগণ বলিল, "তুমি এইটুকু সামান্য সামগ্রী অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইতেছ? আমরা প্রত্যহ এইরূপ কত পদার্থ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপপূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া থাকি। এ সব পদার্থের এখানে কোন মূল্যই নাই। এ সকল বস্তু এই স্থানে তৃণমূল্যে বিক্রীত হয়।" উহাদের ঐ প্রকার বাক্য শুনিয়া মণিরাম শেঠ একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কারণ, তিনি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া বিবেকের পরামর্শ মত কয়েকখানি জাহাজ পরিপূর্ণ করিয়া ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। যদি এই অল্প দিনের মধ্যে ঐ সকল সামগ্রীর মূল্য এত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে কি উপায় হইবে? তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন মনে করিয়া শোকাকুল হইলেন। কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া ঐ সাধুবেশধারীদের নিকটেই এসম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাহারা বলিল, "এই জাহাজগুলি আমাদের দিয়া দাও।" তৎপরিবর্ত্তে উহারা কি দিবে, জিজ্ঞাসা করায় উহারা বলিল, "আমাদের নিকট মূল্যবান্ সামগ্রীপূর্ণ বহু বস্তা আছে।" ইহা বলিয়া ঠকগণ স্বর্ণরৌপ্যবৎ চাকচিক্যবিশিষ্ট দুই চারটা ধাতুপূর্ণ বস্তা শেঠকে দেখাইল এবং তাঁহাকে বলিল যে, যাহা এক ব্যক্তি উঠাইতে সমর্থ হয়, সেইরূপ যে কোন সামগ্রী পরিপূর্ণ একটী বস্তা তাহারা তাঁহাকে জাহাজের পরিবর্ত্তে প্রদান করিবে। শেঠ তখন কিছু গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন আগে দেশে যাই, সেখানে গিয়া আমার বিবেক কর্ম্মচারীর সহিত এসম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হয়, তাহাই করিব। কেবল তিনি জাহাজগুলির পরিবর্ত্তে একটী দলিলে লেখা পড়া করিয়া উহাতে তাহাদের দ্বারা দস্তখত করাইয়া লইলেন। উহাতে ইহাই লেখা রহিল যে, এই জাহাজগুলির পরিবর্ত্তে শেঠ যে কোন সামগ্রীপূর্ণ বস্তা চাহিবেন, তাহাই তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দিতে হইবে। আর যদি সেই সামগ্রী উহারা না দিতে পারে, তবে জাহাজগুলি ত তিনি ফিরিয়া পাইবেনই, এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক জাহাজেই উহাদের শাস্তি স্বরূপ যে কোন দ্রব্য পূর্ণ একটী বস্তা তুলিয়া দিতে হইবে। ঠকগণ এইরূপে বন্দোবস্তে সন্তোষের সহিত সম্মত হইয়া গেল। তখন মণিরাম শেঠ বিষাদিতচিত্তে, মলিনমুখে, রিক্তহস্তে স্বদেশাভিমুখে রওনা হইলেন। এদিকে প্রভু গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন সংবাদ পাইয়া বিবেক কর্ম্মচারী তাঁহার অভ্যর্থনার্থে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত প্রভুকে গৃহে আনয়ন করিবার নিমিত্ত কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। পথে বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় মণিরাম শেঠ তাঁহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভু রাগান্বিত হইয়া-

ছেন দেখিয়া বিবেক বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি যখন প্রভু, তখন আপনি পিতামাতার তুল্য। সুতরাং আমাকে ভর্ৎসনা করিতে পারেন, কিন্তু আমার কি অপরাধ তাহা আমাকে অগ্রে বলুন।" মণিরাম শেঠ তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বিবেককে বলিলেন যে, "তোমার বাক্য শুনিবার ফলেই আমি সর্ব্বস্ব হারাইলাম।" বিবেক প্রভুর কথা শুনিয়া ঘটনাটী বেশ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং প্রভুকে বলিলেন, "উহারা দুষ্ট বঞ্চক ব্যক্তি, আপনাকে প্রতারিত করিয়া আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। এখানে ঐ বস্তুগুলির মূল্য আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।" বিবেকের বাক্যশ্রবণে মণিরাম শেঠ হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং কি উপায়ে পুনর্ব্বার সমগ্রীগুলির উদ্ধার সাধন হইতে পারে, তাহা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিবেক তখন পরামর্শ দিলেন, 'যে স্থানে ঐ মন্দ ব্যক্তিদের গুরু রহিয়াছে, আপনি সেই স্থানে গিয়া পাগল সাজিয়া পড়িয়া থাকুন। কারণ নিশ্চয়ই উহারা এখন গুরুর নিকট যাইবে। তথায় উহাদের যাহা পরামর্শ হয়, আপনি গিয়া শ্রবণ করুন। উহারা আপনাকে যতই তাড়াইবার চেষ্টা করুক না কেন, আপনি কোনমতে ঐ স্থান হইতে উঠিবেন না। উহাদের পরামর্শ শুনিয়া তৎপরে যুক্তি স্থির করিলেই হইবে।'

বিবেকের পরামর্শানুসারে মণিরাম শেঠ দীনভাবে পাগলের বেশে ঠকদের গুরুর স্থানে গমন করত একপার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিলেন। সেখানে ঠকগণ উপস্থিত হইয়া প্রথমেই পাগলকে তাড়াইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সে যখন তথা হইতে কিছুতেই উঠিল না, তখন উহাকে বাস্তবিকই পাগল মনে করিয়া, উহারা গুরুর নিকট গিয়া উপবেশন করিল। উহারা শেঠকে কিরূপ ভীষণ ফাঁকি দিয়াছে, তাহা গুরুর

নিকট সমস্তই সবিস্তারে বলিল। গুরু যখন সেই সামগ্রীর অংশ চাহিল, তখন ঠকগণ তাহাতে সম্মত হইল না। তাহারা বলিল "আমরা বুদ্ধি-বলে উহা সংগ্রহ করিয়াছি, আপনাকে তাহার অংশ দিব কেন?" গুরু বলিল, "যদি তোমরা আমাকে অংশ না দাও, তবে আমি শেঠকে জাহাজগুলি ফিরাইয়া লইতে শিখাইয়া দিব।" তাহা শুনিয়া একজন ঠক বলিয়া উঠিল, "আপনি তাহা পারিবেন না, কারণ আমরা পূর্ব্বেই একসঙ্গে দলিলে উত্তমরূপে লেখাপড়া করিয়া লইয়াছি। ঐ জাহাজ-গুলির পরিবর্ত্তে একজন লোক বহিতে পারে, এইরূপ কোন সামগ্রী-পূর্ণ বস্তা শেঠকে দিয়া দিলেই চলিবে। ঠকগণের গুরু বলিল, "আমি শেঠকে এই কথা শিখাইয়া দিব যে, তুমি মশার হাড়ের একটী বস্তা চাহিও। অবশ্যই তাহা তোমরা দিতে পারিবে না; তাহা হইলেই শেঠ পুনরায় পূর্ব্ব সর্ত্ত অনুসারে তাহার জাহাজগুলি তোমাদের নিকট হইতে ফেরত লইয়া যাইবে।"

এদিকে পাগলের বেশ ধারণপূর্ব্বক মণিরাম শেঠ সকল কথাই শুনিতেছিলেন। তিনি ঐ কথা শুনিয়া উঠিয়া গেলেন। পরে সাধুবেশধারী ঠকগণের নিকট ভদ্রবেশ ধারণপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহাদের নিকট কয়েকটী বস্তা চাহিলেন। উহারা প্রতিশ্রুতি অনুসারে বস্তা দিতে সম্মতই আছে জানাইলে, শেঠ বলিলেন, —তাঁহার পিতার বড় কঠিন পীড়া হইয়াছে। তাঁহার রোগ-নিবারণের নিমিত্ত কবিরাজ নিযুক্ত করা হইয়াছে। কবিরাজ ব্যবস্থা দিয়াছেন, কয়েক বস্তা মশার হাড় প্রয়োজন, সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে উহাই তিনি লইতে আসিয়াছেন। মশার হাড়ের বস্তা উহারা দিতে অসমর্থ হওয়ায় দলিলের সর্ত্ত-মত কস্তুরী, কেশর ও চন্দন পরিপূর্ণ জাহাজগুলি শেঠ ফেরত পাইলেন; তা ছাড়া প্রত্যেক জাহাজে উহারা

শাস্তি স্বরূপ নিজেদের এক একটী বস্তা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইল। জাহাজগুলি ফেরত পাওয়ায় শেঠ মহা আনন্দিতচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিবেক কর্ম্মচারী পূর্ব্বে ঐ সংবাদ পাইয়া প্রভুর সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিসহ প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন।

এই কাহিনীটী বলিয়া সাধুবাবা ইহার অর্থ আমাদিগকে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মণিরাম অর্থাৎ মণি শব্দের অর্থ মানব মন। এই মনই হইল প্রভু এবং বিবেক হইল তাহার মন্ত্রী। মন যখন বিবেককে প্রশ্ন করিল 'কিসের বাণিজ্য করিলে লাভবান্ হওয়া যায়?' তদুত্তরে বিবেক পরামর্শ দিলেন 'কস্তুরী কেশর এবং চন্দন' এই দ্রব্যত্রয়ের বাণিজ্য করুন। 'কস্তুরী' অর্থে 'ভগবানে ভক্তি', 'কেশর' অর্থে 'বৈরাগ্য' এবং 'চন্দন' অর্থে 'মনের সন্তোষ',—অর্থাৎ, সর্ব্বাবস্থায় চিত্তের প্রসন্নতা। বৈরাগ্য অর্থে ভোগ ঐশ্বর্য্যাদি যাবতীয় রাজসিক বাসনাশূন্যতা। কিন্তু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও অহঙ্কার রূপী পঞ্চ প্রতারক উহাদের বিনাশ-সাধনার্থ বদ্ধপরিকর হইল। অর্থাৎ মন যাহাতে ঐ ভাল সামগ্রীগুলি গ্রহণ না করে এই নিমিত্ত মনকে উহা হইতে নিবৃত্ত করাইয়া তাহাকে ভুলাইবার উদ্দেশ্যে উহারা সাধু সাজিয়া বসিয়া রহিল। মন উহাদের প্রকৃত পরিচয় না জানিয়া সাধুজ্ঞানে যখন কিছু ভক্তি, বৈরাগ্য এবং সন্তোষ উপহার প্রদান করিল, তখন দুষ্টগণ ঐ সব মূল্যবান্ পদার্থ সানন্দে অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক ভস্ম করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে মন দুঃখিত হইল। তখন উহারা সাধুভাবে হিতোপদেশ দেওয়ার ছলে বলিল যে, ঐ সকল দ্রব্য উহারা প্রত্যহই এইরূপ ধুনি মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ভস্ম করে। অর্থাৎ ভক্তি, বৈরাগ্য ও চিত্তপ্রসন্নতা ইহ সংসারে এই ভাবেই নিত্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া

থাকে। সংসারে ঐ সকল দ্রব্যের কোন মূল্যই নাই, ঐ সকল দ্রব্য এস্থানে তৃণমূল্যে বিকায়। উহাদের ঐরূপ বাক্যে মন ভাবিল, তবে বুঝি বাস্তবিকই এই সকল দ্রব্য অল্পমূল্যের। ইহা মনে হওয়ায় সে ভয়ানক ঠকিয়াছে ভাবিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। বিবেকের বুদ্ধিতেই ত এই সকল দ্রব্য মূল্যবান্ মনে হওয়ায় ঠকিতে হইয়াছে, এই নিমিত্ত প্রথমে বিবেককে মন খুব ভৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। পরে যখন বিবেক উত্তমরূপে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন, অর্থাৎ মন স্থির হইলে যখন সমস্ত কথা হৃদয়ঙ্গম হইল,তখন আবার ভক্তি,বৈরাগ্য ও সন্তোষের নিমিত্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন বিবেক বুদ্ধি দিল, "তুমি পাগল সাজ"—অর্থাৎ, দীন হীন কাঙ্গালভাবে নিরভিমান হইয়া পড়িয়া থাক। বিবেকের পরামর্শানুসারে ঐরূপ পড়িয়া থাকিতে থাকিতে মনে উদয় হইল যে, বিষয় হইতে ক্ষণস্থায়ী সাময়িক কিছু সুখলাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু উহাতে কখনই আত্মানন্দ-লাভ হয় না! তাই মন বলিতেছে, "আমি মশার হাড়ের বস্তা চাই"—অর্থাৎ, মশার হাড়রূপ যে দুষ্প্রাপ্য আত্মানন্দ তাহাই লাভ করিতে চাই। পঞ্চ রিপুর প্রেরণায় চলিলে বিষয়ানন্দরূপ অকিঞ্চিকর সুখ মিলিতে পারে বটে, কিন্তু আত্মানন্দ লাভ করিতে হইলে ভক্তি, বৈরাগ্য, তিতিক্ষার সাহায্যে এবং আত্মধ্যান দ্বারাই তাহা লাভ করিতে পারা যায়। দীনহীন কাঙ্গালভাবে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে যখন এই কথাগুলি বেশ পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন মন বিশেষভাবে আত্মানন্দের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। কাম, ক্রোধ আদি পঞ্চ রিপু হইতে তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া এবং কস্তুরী, কেশর ও চন্দন যে প্রকৃতপক্ষে তৃণমূল্য নয় তাহা উপলব্ধি করিয়া রিপুগণের সেবা পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে মন ভক্তি, বৈরাগ্য ও সন্তোষরূপ অমূল্য সম্পদ্গুলিই

গ্রহণ করিল। তাই সাধুবাবা বলিতেছেন যে, মণিরাম শেঠ কস্তুরী, কেশর এবং চন্দনের জাহাজগুলি পুনর্ব্বার ফিরিয়া পাইলেন ও তাহার সাহায্যে অবশেষে যে আত্মানন্দরূপ দুষ্প্রাপ্য সম্পদ্ তাহাও লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। আরও বলিতেছেন বিবেক যে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত অগ্রসর হইয়া প্রভুকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন, ইহার অর্থ, যখন মনে ভক্তি, বৈরাগ্য ও সন্তোষের আবির্ভাব হইল, তখন আপনা হইতেই তথায় করুণা, মৈত্রী, মুদিতা, উপেক্ষা এবং বস্তু-বিচার আদি স্বভাবতঃই উদয় হইল। এইভাবে গল্পটির মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া সাধুবাবা বলিয়াছিলেন, ভক্তি বিশ্বাসই হইল সকলের মূল। ভক্তিধন সঙ্গে লইয়া বিবেকের সাহায্যে জীব চলিলেই ক্রমে ক্রমে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ আমাদিগকে একদা একটী উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "বোধ ও মোক্ষলাভের নিমিত্ত নানা উপায় রহিয়াছে সত্য, কিন্তু যেরূপ বিনা অগ্নিতে পাক সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ জ্ঞান বিনা মোক্ষলাভ হয় না।" তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, "যেরূপ পুষ্পের মধ্যে সূক্ষ্ম অবস্থায় ফল থাকে, সেইরূপ জ্ঞানও ভক্তির মধ্যে গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে। যদি জ্ঞানই না থাকিবে, তবে ভক্তি আসিবে কোথা হইতে?" হায় জ্ঞান, হায় ভক্তি, কি করিলে তোমাদের সন্ধান পাইব? শরণাগতকে কি দয়া করিবে না?

সাধুবাবা যেরূপ উপদেশপূর্ণ সুন্দর সুন্দর কাহিনী বলিয়া শুনান, তেমনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিজের ভাষায় বেশ চমৎকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোঁহা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। সবগুলি সকল সময় সম্পূর্ণরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও বাবার অভ্যস্ত মধুর কণ্ঠে সেগুলি শুনিতে বড়ই মিষ্ট বোধ হয়। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন—

"করুণা মৈত্রী মুদিতা ঔর উপেক্ষা জান।
চার বহিন্ হাম জীবকি সদা করে মহল্‌ান ॥"

অর্থাৎ করুণা, মৈত্রী, মুদিতা এবং উপেক্ষা এই চারটি জীবের ভগ্নী-স্বরূপা। [ইহারা সর্ব্বকাল জীবের কল্যাণ সাধন করে।] ইহাদিগকে সঙ্গী করিতে পারিলে জীবের মনের ময়লা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মোহকে নাশ করিবার ইহাই উপায়। সাধুবাবা আর একটি দোঁহা বলিয়াছিলেন—

"জাগ জাগ নর জাগতুঃ তব ন স্বপনকসং।
শুদ্ধ সনাতন রূপ্‌মে চড়ে ন দুজো রং ॥
য্যায়সা নিদ্রা দোষকর স্বপন পুরুষ বহুভান্।
ভোক্তা ভোগ্যাকার সো জাগে দ্বৈত ন শান্ ॥"

অর্থাৎ হে নর! তুমি জাগরিত হও, তোমার মায়ারূপ স্বপনের সঙ্গ শোভা পায় না। একই শুদ্ধ সনাতন রূপ, তাহাতে আর কোনও দ্বিতীয় রূপ নাই। অর্থাৎ হে মনুষ্যগণ! তোমরা মায়ামুক্ত হও, তোমরা মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া উঠ। এই যে সংসার ও চতুর্দ্দিকের যাবতীয় পদার্থ দর্শন করিতেছ ইহা অলীক স্বপ্ন। লোকে যেরূপ নিদ্রার সময় বহুবিধ স্বপ্ন দর্শন করে, সেইরূপ এই যে ভোক্তা ভোগ্য ইত্যাদি প্রতীতি হইতেছে ইহা মিথ্যা। যেরূপ নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্বপ্ন মিথ্যা বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ জ্ঞান লাভ হইলে ভোক্তা ভোগ্য এই দ্বৈত ভাবের নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। মোহ-নিদ্রা হইতে জীব উত্থিত হইলে, তখন এক চৈতন্যই যে সর্ব্বব্যাপী, এ জ্ঞান স্থির নিশ্চয় হইয়া যাইবে।

"আর ঘুমা'ও না মন!
মায়া-ঘোরে কত দিন র'বে অচেতন?
কে তুমি?—কি হেতু এলে?—আপনারে ভুলে গেলে—
চাহ রে নয়ন মেলে, ছাড় কুস্বপন;—
র'য়েছ অনিত্য ধ্যানে,—নিত্যানন্দে হের প্রাণে,
তমঃ পরিহরি, হের তরুণ তপন!"

সাধুবাবা একদা একটী বেশ সুন্দর গল্প বলিয়া শুনাইয়াছিলেন। যতটুকু স্মরণ আছে সাধ্যমত লিখিতেছি। গল্পটী এইরূপ:—

ঈশ্বরের সহধর্ম্মিণী মায়া এবং মায়ার পুত্র মন। মনের দুই স্ত্রী প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির পুত্র মোহ অর্থাৎ মমত্ববুদ্ধি বা আসুরী সম্পত্তি। নিবৃত্তির পুত্র বিবেক অর্থাৎ দৈবী সম্পত্তি, বিচারবুদ্ধি। বিবেকের দুই স্ত্রী—সুবুদ্ধি ও শ্রুতি। বিবেক সুবুদ্ধির সহিত বিচার পূর্ব্বক বুঝিলেন, দুষ্ট মোহ নিজ পিতা যে ভগবান্ তাহাকে একেবারে অধীন করিয়া ফেলিয়াছে। অর্থাৎ ভগবান্ যে মায়াদ্বারা জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মোহ তাহাতে রাজা হইয়া বসিয়াছে। এই মোহের হস্ত হইতে জগৎপ্রপঞ্চ উদ্ধার করা প্রয়োজন। এই মোহই সংসাররূপী চক্র ঘুরাইতেছে। মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানতাকে বোধশক্তির দ্বারা ধ্বংস করিয়া যেরূপেই হউক জীবের মনে পরমজ্ঞানের সঞ্চার করিতে হইবে। মোহের নাশ হইলেই সংসার-বন্ধন নাশ হইয়া যায়। বিবেক এইরূপ বহুচিন্তা করিয়া শ্রুতির * সহিত একত্র হইয়া যাহাতে বোধরূপী পুত্র উৎপন্ন হয় এবং মোহের বিনাশ সাধিত হয়, তজ্জন্য সবিশেষ চেষ্টায় রত হইলেন। পরমাত্মার প্রতি যে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা—তাহার পুত্রী শান্তি।

* শ্রুতি অর্থাৎ বেদ। উপনিষদ্ শব্দে বেদান্ত শাস্ত্রকে বুঝায়।

প্রবোধ বা পরমজ্ঞানের সাহায্যে শান্তিলাভ হইবে। উপনিষদ্ হইল ব্রহ্মবিদ্যা। মোহ রাজা যখন এই সকল পরামর্শ জানিতে পারিল, তখন সে তাহার স্ত্রী ও মন্ত্রী কুবুদ্ধির সহিত পরামর্শ করিতে বসিয়া গেল। যাহাতে শান্তিলাভ না ঘটে, পথেই যাহাতে শান্তির বিনাশ সাধিত হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য সে সচেষ্ট রহিল। মোহ নিজ মন্ত্রী কুবুদ্ধিকে প্রথমে ডাকিয়া পাঠাইলেন; সে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার প্রতি কি আদেশ হয়?" তখন মোহ কুবুদ্ধিকে আদ্যন্ত বিষয় জানাইয়া বলিল, "কি উপায়ে শান্তিকে নাশ করিতে পারা যায় বলত? ইহার উপায় তোমাকে যে প্রকারেই হউক করিতেই হইবে।" কুবুদ্ধি বলিল, "ইহার উপায় আমি এখনই করিতেছি। আমাদের সেনাপতি ক্রোধ, তাহাকে আপনি একবার জিজ্ঞাসা করুন—তাহার কিরূপ পরাক্রম।" তখনই সেনাপতি ক্রোধকে 'তলব' দেওয়া হইল। ক্রোধ উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতি কি আদেশ জানিতে চাহিলে,—মোহ তাহাকে বলিল, "তোমার কিরূপ ক্ষমতা আছে প্রকাশ করিয়া বল।" তদুত্তরে ক্রোধ বলিল, "আমার সমস্ত প্রতাপ আমি নিজ মুখে বলিতে সমর্থ হইব না। তবে আমি সামান্য পরিচয় দিতেছি;—যাহার উপর আমি আবির্ভূত হই, সে ব্যক্তির কিরূপ অবস্থা হয় তাহা একবার শ্রবণ করুন। যাহার উপর আমার আবির্ভাব হয়, তাহার মুখমণ্ডল তৎক্ষণাৎ বিকৃত আকার ধারণ করে। যে বিদ্বান্ তাহার বিদ্যা সে সময় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, যে চক্ষুষ্মান্ তাহাকে আমি অন্ধ করিয়া দিই। যাহার শ্রবণশক্তি আছে আমার আবির্ভাব হইলে সে তৎক্ষণাৎ বধির হইয়া যায়। যে বুদ্ধিমান্ চতুর—তাহার বুদ্ধিনাশ হইয়া যায়। ধৈর্য্যশীল ব্যক্তির ধৈর্য্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যখন আমার আগমন হয়, তখন সে কোন হিতকারী ব্যক্তির বাক্য গ্রহণ

করে না, সুতরাং যাহার সর্ব্বরূপে এইরূপ বিকৃতাবস্থা ঘটে তাহার শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? সাধুবাবা এই সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে কয়েক ছত্র গুজরাটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন। যথা—

"অন্ধ করু দৃকবন্তন কো, শ্রুতবন্তনকো বধীর করে ডারু।

ধৃতবন্তন কো অধীর করু, পুন চাতরকি মতি দূর নিবারু"—ইত্যাদি।

ক্রোধের এই প্রকার উৎসাহপূর্ণ বাক্যশ্রবণে মোহ বলিল—"সাবাস্, তবে তুমি সত্বর রওনা হও। অবিলম্বে যুদ্ধ বাধাইয়া শান্তিকে ধ্বংস কর।"

এদিকে বিবেক এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং কি উপায়ে শান্তিকে রক্ষা করা যায় তাহা সুবুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সুবুদ্ধিকে বলিলেন যে, "মোহ দুষ্ট ক্রোধকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া শান্তিকে বিনাশ করিবে স্থির করিয়াছে। এখন তুমি ইহার প্রতিবিধানের উপায় বল।" সুবুদ্ধি শুনিয়া বলিলেন, "আমাদের পক্ষে এমন একজন আছেন, যিনি ক্রোধকে দমন করিতে পারেন,—তিনি ক্ষমা"। তখন ক্ষমাকে সংবাদ দেওয়া হইল। ক্ষমা আসিয়া বিবেককে প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে বলিলেন, "মহারাজ! আমার প্রতি কি আদেশ করিতেছেন?" বিবেক ক্ষমার নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন "শান্তি কিরূপে রক্ষা পায় তাহার উপায় বিধান কর।" তাহা শুনিয়া ক্ষমা বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই ক্রোধকে দমন করিতে পারিব।" ক্ষমার বাক্য শুনিয়া বিবেক মহারাজ ক্ষমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্রোধকে বিনাশ করিবার কিরূপ অস্ত্র তোমার নিকট আছে তাহা আমাকে বল।" তদুত্তরে ক্ষমা বলিলেন, "যখন, যে নর ক্রোধ করে তব

মৌন্ রহিয়ে, যদি গালি বকে তাঁ প্রতি কোমল বাক্ ভনিজে। যদি ধিক্কার করে তেঁ পাও পড়ে, আর যদি ও মারনে লাগে তো মে কৃত পূর্ব্ব পাপ ভনিজে, এই মনে করিতে হইবে।” অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি ক্রোধ করিয়া অপরকে খুব গালাগালি দিবে, তখন প্রথমে মৌন থাকিতে হইবে। তাহাতে যদি ঐ ব্যক্তির ক্রোধ না যায়, তবে তাহার প্রতি কোমল বাক্য অর্থাৎ মধুর নম্র বাক্য বলিতে হইবে। উহাতেও যদি ক্রোধের উপশম না হয়, তবে তাহার পা ধরিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিতে হইবে। যদি উহাতেও সে ব্যক্তির ক্রোধ-নিবৃত্তি না হওয়ায় সে প্রহার করিতে আরম্ভ করে, তবে মনে করিতে হইবে যে, নিজেরই পূর্ব্ব-জন্মকৃত কোন পাপ-নাশ হইতেছে। ক্রোধী ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া ঐরূপ নম্র ব্যবহার করিতে হইবে এবং ঈশ্বরের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে যে, ‘হে প্রভো! উহার দুষ্ট চণ্ডালরূপী ক্রোধকে শান্ত করিয়া দাও।’ এইরূপ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই অপরের চিত্ত হইতে ক্রোধ দূর হইয়া যাইবে এবং তাহার প্রাণে শান্তির উদয় হইবে। সাধুবাবা বলেন, “একমাত্র ধৈর্য্য এবং ক্ষমার দ্বারাই ক্রোধকে ধ্বংস করিতে পারা যায়।” এইরূপ সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা থাকিলেই চিত্তেও শান্তির সঞ্চার হয়। এইরূপ বস্তু-বিচার ও বৈরাগ্য দ্বারা কাম, সন্তোষ দ্বারা লোভ, প্রেমের দ্বারা দ্বেষ হিংসা জয় করিতে হইবে। তৎপর সাধনা ও ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে প্রবোধ বা পরমজ্ঞান লাভ হইলেই অজ্ঞানতারূপ মোহের নাশ হইবে ও জ্ঞানের দ্বারাই শান্তিলাভ হইবে।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ গীতা ৪।৩৯

সাধুবাবাকে একদিন প্রশ্ন করা হইয়াছিল, ‘নাম’ করিতে করিতে

কি ক্রোধ কমিয়া যায়? তদুত্তরে সাধুবাবা বলিয়াছিলেন, 'নাম' করিলে ক্রোধ কমে না, বরং অগ্নির সহিত সংযোগ হওয়ায় তেজ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেইজন্য ক্ষমা এবং সন্তোষ বা সন্তোষের সহিত সহিষ্ণুতা দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া ক্রোধকে বিনাশ করিতে হয়। **সন্তোষ বড় সুন্দর সামগ্রী—উহা সাধকের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ইচ্ছাত্যাগ হইলে তবে ক্রোধ-জয় হয় ও সন্তোষলাভ হয়।** সাধক ব্যক্তির মনে দৃঢ়রূপ সঙ্কল্প করিতে হইবে যে, আমি কিছুতেই মনে অসন্তোষ আসিতে দিব না। মনে কোন সদিচ্ছা জাগরিত হইলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে ভগবানই সহায়তা করিয়া থাকেন। মলিন ইচ্ছা ত্যাগ সর্ব্বদা করিতে হইবে।

সাধুবাবা একদিন সম্মুখস্থ দিগ্রিয়া পাহাড় দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ঐ পাহাড়ের নাম 'দেবগিরি' পাহাড়। দেওগিরিকে এখন লোকে দিগ্রিয়া বলে। এক সময় এ অঞ্চলে বহু সাধু মহাত্মা বাস করিতেন। এই 'দেবগিরি', ঐ 'ত্রিকূট', ওধারে 'তপোবন', এ সবই এক সময় সাধনক্ষেত্র ছিল—কালে পুনরায় সেই প্রকার হইবে। সাধুবাবা যখন হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক চতুষ্পার্শ্বের পাহাড়গুলি দেখাইয়া ঐ কথাগুলি বলিতেছিলেন, তখন বাবার বাক্য শ্রবণ করিয়া বড় আনন্দানুভব হইতেছিল।

সাধুবাবাকে 'তপস্যা' কথাটির অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন মন ও ইন্দ্রিয় দমন। বস্তু-বিচার ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন করিতে হয়। নতুবা যে শুধু অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার সম্মুখে বসা উহা তমোগুণের লক্ষণ।

'শিব' কথাটীর অর্থ জিজ্ঞাসা করায় বাবা বলিয়াছিলেন "শিব অর্থে কল্যাণ স্বরূপ আত্মা।"

একাদশ তরঙ্গ

১৩৩৫ সালের বিজয়া দশমীর পর দিবস প্রাতে আমরা সাধুবাবাকে প্রণাম করিবার জন্য কৈলাস পাহাড়ে রওনা হইলাম। যখন আমরা পৌঁছিলাম, তখন বোধ হয় বাবা দুই একজন রোগীকে ঔষধ বিতরণ করিতেছিলেন ; কারণ তাঁহাকে নীচের একটা ঘরে দেখিতে পাইলাম। আমরা বাবাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, কয়দিন বাবার নিকট আসিতে পারি নাই। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমিও তাহা মনে করিতেছিলাম, কিন্তু ভাবিলাম মায়ীরা বোধ হয় অন্যদিকে গিয়াছেন।" আমি বলিলাম, "এ কয়দিন আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজের নিকট গিয়াছিলাম। বাস্তবিক, পূজার এই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে প্রত্যহ আশ্রমে গিয়া জগজ্জননীর পূজার আয়োজন-উৎসব-দর্শনে এবং শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজের অমৃতোপম বহু উপদেশ-বাক্য-শ্রবণে প্রাণ একেবারে আনন্দে পূর্ণ রহিয়াছে।" সাধুবাবা উপরে গিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে মৃগচর্ম্মাসনে* বসিলে আমরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাঁহার নিকটে বসিলাম। দুই একটি কথার পর আমার স্বামী সাধুবাবাকে প্রশ্ন করিলেন, "সন্তোষলাভ কিসে হয় ? মন কি বাসনাহীন হইলেই মনে সন্তোষের উদয় হয় ?" বাবা বলিলেন :—"জন্ম জন্মান্তর হইতে মানবের মনের প্রবাহ একদিকে যাইতেছে অর্থাৎ বিষয়াভিমুখেই স্বভাবতঃ জীবের চিত্তের গতি প্রবাহিত হইয়া থাকে। নদীর প্রবাহ যে দিকে গমন করে, তাহাকে যদি অন্য দিকে প্রবাহিত করিতে ইচ্ছা করা যায় তাহা হইলে শুধু বাঁধ বাঁধিয়া দিলেই যথেষ্ট হয় না ; তাহাকে অন্যদিকে প্রবাহিত করিবার জন্য নূতন একটী

* তখন বাবা মৃগচর্ম্মে বসিতেন। এখন বৃহৎ ব্যাঘ্র চর্ম্মে উপবেশন করেন।

খাত প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়, তবে সেই নদীর জল-প্রবাহ নূতন খাতের পথে প্রবাহিত হয়, নচেৎ খাত কাটিবার পূর্ব্বে যেমন বাঁধ দিলে জলরাশি চতুর্দ্দিকে উছলিয়া পড়ে, তেমনি মনোরূপী নদে নির্ব্বাসনারূপ বাঁধ দিতে যাওয়াই যথেষ্ট নয়। মনের প্রবাহ অন্যদিকে বহাইবার জন্য নূতন খাত কাটিতে হইবে। অর্থাৎ ভগবৎ উদ্দেশে ইহার গতি ফিরাইতে হইলে প্রথমেই উহার একটী নূতন আশ্রয় চাই। কারণ, একটী কোন আশ্রয় না পাইলে বিনা আশ্রয়ে মন কখনই থাকিতে পারে না, এই নূতন খাতই মনের আশ্রয় হইবে। তাই সাধুবাবা বলিলেন, "একঠো খাত বানানে হোগা তব্ মনকো ঘুমানে সেকেগা।" তিনি বলেন, মনকে অন্তর্মুখী করিয়া পরমাত্মায় স্থাপনপূর্ব্বক ব্রহ্ম অভ্যাস বা আত্মধ্যান অভ্যাস করিয়া এই খাত বানাইতে হইবে, তবে মনের প্রবাহ ভগবন্মুখী হইবে এবং ইহার অভ্যাসের ফলে মন ক্রমে তাঁহাতে স্থির ও অচঞ্চল হইবে।

আর একটি কথা সাধুবাবা বলিলেন, মন চঞ্চল হইলে সুখ বা শান্তিলাভ হয় না, এবং বিক্ষেপযুক্ত মনের দ্বারা কোন বিষয়েই ভালরূপ উপলব্ধি বা রসাস্বাদন হয় না। মন সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ হইলে তাহাতে শান্তি ও প্রকৃত সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন—"আত্মা চন্দ্রমা স্বরূপ, আর মন জল স্বরূপ। তৃষ্ণা বায়ুতুল্য সতত মনকে চঞ্চল করিতেছে। চঞ্চল চিত্তে কখনই প্রকৃত সুখের উপলব্ধি হইতে পারে না। যখন সর্ব্ববিধ তৃষ্ণা দূর করিয়া ভগবানে মনকে একাগ্র করিয়া সম্পূর্ণ স্থির ও নিস্তরঙ্গ করা যাইবে, তখনই মনে প্রকৃত শান্তি অনুভূত হইবে ও নিস্তরঙ্গ চিত্তে আত্মরূপ চন্দ্রমার প্রকাশ হওয়ায় সকল অজ্ঞানতা রূপ অন্ধকার বিনষ্ট হইয়া যাইবে। মনকে যে প্রকারেই হউক পরমাত্মায় একাগ্র ও অচঞ্চল করিতে হইবে। ইহাই সাধনা, ইহারই অভ্যাস

করিতে হইবে, এই জন্য তৃষ্ণা ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক সতত আত্মধ্যান অভ্যাসপরায়ণ হওয়া প্রয়োজন।

বাবা বলেন—

সতত ব্রহ্ম অভ্যাসসে মল বিক্ষেপকো নাশ।
জ্ঞান দৃঢ় নির্ব্বাসনা জীবন্মুক্তি প্রতিভাস॥

অর্থাৎ সর্ব্বকাল ব্রহ্মধ্যান অভ্যাস দ্বারা, মনের যাবতীয় মল নাশ পাইলে, মন নির্বাসন হইবে ও দৃঢ় জ্ঞানলাভ হইয়া জীবন্মুক্তি অবস্থার উপলব্ধি হইবে।

অভ্যাস করিলে ত হয় বুঝিলাম, কিন্তু অভ্যাস করিব কিরূপে? বাবার নির্দ্দেশ, সর্ব্বকাল ব্রহ্মধ্যানের অভ্যাস; তাহাত আমাদের মত সংসারী জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। যাহারা এক হাতে মালা জপ করে, অপর হাতে বিড়াল তাড়ায় তাহারা কিরূপে সর্ব্বকাল ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন থাকিবে? বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মচিন্তার অভ্যাস এক দিনে বা এক বছরে হয় না,—ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে থাকিলে, একদিন দেখিবে তোমার সকল কাজের মধ্যে তুমি চিন্তা করিতেছ তাঁহারই। তোমার সন্তান পীড়িত হইয়া পড়িলে তুমি ভাবিবে প্রভু এই রোগ দিয়াছেন; তোমার ধনসম্পত্তি নষ্ট হইলে তুমি চিন্তা করিবে প্রভুর ইচ্ছায় তুমি দরিদ্র হইয়াছ। বিদ্রোহীর ভাব মনে লইয়া তাঁহার চিন্তা করিলে মনে সুখশান্তি পাইবে না। কোন সাধু সর্পদষ্ট হইলে তিনি যে ভাব হৃদয়ে লইয়া অশ্রু বিগলিত নয়নে বলিয়াছিলেন, 'দয়াল হামকো স্মরণ কিয়া, প্রভুকা বহুৎ কৃপা,' এই ভাব হৃদয়ে লইয়া সুখে-দুঃখে তাঁহাকে স্মরণ করিবে। এই স্মরণ মনন হইতে যে অভ্যাস সৃষ্ট হইবে, সেই অভ্যাসই ব্রহ্মলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার অভ্যাস কিরূপে সৃষ্ট হইল ?

বাবা উত্তর করিলেন, গুরুগৃহে, ধীরে ধীরে।

গুরুগৃহে কিরূপে অভ্যাস সৃষ্ট হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে বাবা বলিয়াছিলেন, যখন বালক ছিলাম, তখন মহাত্মা অনুভব দেবের নিকট কিছু শিখিয়াছিলাম। তৎপরে কালাসিং নামে এক পণ্ডিত সাধুর নিকট কিছু শিক্ষা করি। তাঁহার নিকট কয়েক বৎসর ছিলাম। তাঁহার শতাধিক শিষ্য ছিল। তিনি যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। তিনি ভৈষজ্যবিত্থায় পারদর্শী ছিলেন। শাস্ত্রের সঙ্গে তাহাও আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন। কালাসিং সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, মধুর ও উদার প্রকৃতির সাধু ছিলেন। তিনি রাত্রি তৃতীয় প্রহরে শয্যাত্যাগ করিয়া ধ্যান-ধারণায় এক প্রহরকাল অতিবাহিত করিতেন। সূর্য্যোদয়ে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা পাঠ করিতেন; তৎপরে প্রায় এক প্রহর কাল শিষ্যদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। আহারান্তে স্বল্পকাল বিশ্রাম করিয়া আবার শিক্ষা দিতেন। তিনি একাহারী ছিলেন, তাঁহার নিকট আমরা একাহার শিখিয়াছিলাম। সহপাঠীদের সহিত অপরাহ্নে ব্যায়াম করিতাম। সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্যরক্ষা প্রয়োজন। ব্যায়াম, দেহরক্ষা ও ইন্দ্রিয়সংযমের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

কালাসিংহের নিকট কয়েক বৎসর শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া মহাত্মা অবধূত হীরানন্দের নিকট বাবা ধ্যান-ধারণা শিক্ষা করেন। এই মহাপুরুষ সিদ্ধ অবধূত ছিলেন। তাঁহার নিকট বাবা যতদিন ছিলেন, ততদিন বাবাকে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সহিত বাবা তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; কখন অনাহারে, কখন বা স্বল্পাহারে বৃক্ষতলে দিবাযামিনী অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। এইরূপে এই কঠোরতার মধ্য দিয়া বাবাকে ব্রহ্ম অভ্যাস করিতে

হইয়াছে। আমরা সংসারী জীব ভোগপুষ্ট দেহ লইয়া তাহা পারিব কিরূপে? তবে কি আমাদের আশা নাই? হে নারায়ণ, আমাদের কি আশা নাই? এ পথে ভগবৎ কৃপার সাহায্যেই মানব অগ্রসর হইতে পারে। তাঁর কৃপাই এ পথের প্রধান সম্বল।

দ্বাদশ তরঙ্গ

কে স্বাধীন, আর কে পরাধীন; কে প্রকৃত সম্রাট্, আর কে প্রকৃত প্রজা তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটি গল্প বলিলেন,—

একদা এক প্রদেশের মহারাজ নিকটস্থ অরণ্যমধ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। ঐ অরণ্যে বৃক্ষতলে এক মহাত্মা উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ সাধুকে দর্শন করিয়া মহারাজ বলিলেন, "তুমি কে?" সাধুও তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কে?" মহারাজ উত্তর করিলেন, "আমি বাদশাহ"। তৎশ্রবণে সাধু বলিলেন, "আমি শাহনশাহ"। মহারাজ বলিলেন, "তুমি কেমন করিয়া শাহনশাহ হইবে? তুমি যদি শাহনশাহ হইতে, তবে তোমার নিকট কত লোক লস্কর ফৌজ আদি থাকিত। তোমার দেহে কোনরূপ উৎকৃষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ নাই এবং তোমার নিকট কিছু অর্থাদি আছে বলিয়া মনে হইতেছে না, সুতরাং তুমি কি প্রকারে শাহনশাহ হইলে?" তদুত্তরে মহাত্মা বলিলেন, "শত্রু-দমনার্থেই লস্কর ফৌজ আদির প্রয়োজন হইয়া থাকে, আমার কেহই শত্রু নাই। লোকের সখের জন্যই উত্তম উত্তম পোষাক পরিচ্ছদাদির প্রয়োজন হয়, আমার কোন সখ্ বা ইচ্ছা নাই। আর আমার অর্থেরই বা কি প্রয়োজন? আমার কোন খরচ নাই, কিম্বা

কোন প্রকার সামগ্রীর প্রয়োজন বোধও নাই বা অভাববোধ নাই।” মহাত্মার এইরূপ বাক্য-শ্রবণে মহারাজ বলিলেন, “যাঁহার কোন শত্রু নাই, যাঁহার কোন সখ্ নাই, যাঁহার কোন প্রকার খরচ নাই, তিনি প্রকৃত শাহনশাহই বটে।” বাবা বলেন—

“চা গেয়ি, চিন্তা গেয়ি, মন্‌মে নেহি প্রবাহ।
যিস্ মন্‌মে সন্তোষ হ্যায় ও শাহন্‌শাহ॥”

সেদিন সাধুবাবা আর একটি গল্প আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—একদা নিশীথে দুইজন চোরের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উভয় উভয়ের পরিচয় লইলে প্রথম চোর, দ্বিতীয় চোরকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি সাধারণতঃ কি প্রকার দ্রব্য চুরি করিয়া থাক?” তদুত্তরে সে বলিল, “কৃষকগণ দিবসে জমীতে কাজ করিতে আসিয়া ভুলক্রমে যে সকল দ্রব্যাদি মাঠে ফেলিয়া যায়, আমি সেই সকল দ্রব্য চুরি করিয়া থাকি।” এরূপ সামান্য দ্রব্য অপহরণের কথা শুনিয়া প্রথম চোর বলিল, “তুমি ত দেখিতেছি খুব মূর্খ। ঐ অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যে তোমার এত আসক্তি? চল, তোমাকে সঙ্গে লইয়া রাজবাড়ী যাই। তথায় বহু মূল্যবান্ অপূর্ব্ব পদার্থ রহিয়াছে দেখিবে। সে সকল বস্তু তুমি একবার দেখিলে আর ঐরূপ অকিঞ্চিৎকর পদার্থে তোমার স্পৃহা থাকিবে না।” আজ এই উভয় চোরের কথোপকথন লিখিতে বসিয়া মনে পড়িতেছে শ্রীগুরুদেব একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, “যে প্রত্যহ রসগোল্লা খাইতে পায়, সে কি কখনও চিটা গুড় খাইবার আকাঙ্ক্ষা করে?” অর্থাৎ যে একবার ভগবৎ-চিন্তনের আস্বাদ লাভ করিয়াছে তাহার নিকট বিষয়ানন্দ তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়। এখন সে কথা যাক্। দ্বিতীয় চোর প্রথম চোরের ঐ প্রস্তাব শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং তাহার সহিত রাজ-ভবনাভি-

মুখে গমন করিল। ক্রমে তাহারা রাজবাড়ীর সম্মুখে উপনীত হইয়া কৌশলে উভয়ে তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। রাজবাড়ীর কোন বিশেষ স্থানের দিকে অগ্রসর হইতেই তাহারা সম্মুখে পয়সার বৃহৎ স্তূপ দেখিতে পাইল। তদ্দর্শনে দ্বিতীয় চোর কাপড় বিছাইয়া উহা উঠাইবার জন্য বসিয়া গেল। তখন প্রথম চোর অপরকে বলিল, "আরে ছি ছি, উহা কি লইবার মত পদার্থ নাকি? উহা ত অতি সামান্য তাম্রখণ্ড মাত্র। উঠ ভাই, আমার সহিত আরও অগ্রসর হও।" তাহারা উভয়ে কিয়দ্দূর গমন করিলে সম্মুখে টাকার একটী স্তূপ দৃষ্টিগোচর হইল। দ্বিতীয় চোর উহা দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিল ও ব্যগ্র হইয়া উহা সংগ্রহের নিমিত্ত অঞ্চলে উঠাইতে গেল। প্রথম চোর উহা দেখিয়া তাহাকে বলিল, "এগুলি সামান্য রূপার চাকতি মাত্র, উহা উঠাইতে গিয়া বৃথা কেন সময় নষ্ট কর ভাই! চল, আমার সহিত আরও অগ্রসর হও, আরও যথেষ্ট সুন্দর বস্তুর সন্ধান পাইবে।" প্রথম চোরের বাক্যানুসারে সে উহা উঠাইতে বিরত হইয়া তাহার সহিত অগ্রসর হইয়া চলিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই সম্মুখে যখন মোহরের স্তূপ দৃষ্ট হইল, তখন দ্বিতীয় চোর কোন ক্রমে আর লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। সে মহোল্লাসে তথায় বসিয়া কাপড় বিছাইয়া উহার সংগ্রহে মনোযোগী হইল। এগুলিও যে অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ, ইহা হইতেও যে বহু মনোহর মূল্যবান্ পদার্থ রহিয়াছে, প্রথম চোর পুনঃপুনঃ তাহা বলিলেও ঐ ব্যক্তি সেস্থান ত্যাগ করিয়া কোনক্রমে উঠিল না; আর অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না। প্রথম ব্যক্তি তখন অগত্যা তাহাকে তথায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রাজঅন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিল। রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজার কণ্ঠের মহামূল্য অপূর্ব্ব মণিরত্নখচিত হার

গ্রহণ পূর্ব্বক পকেটে রাখিয়া অতি সহজ ভাবে সে রাজ-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

এদিকে রাজবাড়ীতে দুষ্ট ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছে এসংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন প্রহরীদের মধ্যে বিলক্ষণ সাড়া পড়িয়া গেল। যিনি উহাদের মধ্যে প্রধান, তিনি ভেরী বাজাইতেই সকল প্রহরী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদের মধ্যে যাহারা উপযুক্ত তাহাদের আদেশ দিলেন, "এখনই দুষ্ট ব্যক্তিকে ধরিয়া আনা হউক"। তৎক্ষণাৎ তস্কর-অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে সিপাহী সৈন্য ধাবিত হইল। সুবর্ণের ভারে ভারাক্রান্ত প্রকাণ্ড মোট সহিত দ্বিতীয় চোর অচিরে পথিমধ্যে ধৃত হইল। তাহারা উহাকে পাইয়া প্রথমে বিস্তর প্রহার করিল। অবশেষে বন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে রাজসমীপে উপস্থিত করিল। রাজার আদেশে ঐ ব্যক্তিকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা হইল। আর যে ব্যক্তি পকেটের মধ্যে রাজকণ্ঠের মণি-রত্ন-খচিত মূল্যবান্ হার লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল, সে ধরা পড়িল না।

এই উভয় চোরের কাহিনী বলিয়া সাধুবাবা উপদেশ দিলেন যে, সুবর্ণের মোট অর্থে সোনা, রূপা, ঐশ্বর্য্য, বৈভব, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী পুত্র, কুটুম্বাদি অনাত্মবস্তুসমূহ যাহা সংসারী-ব্যক্তি অতি শ্রেষ্ঠ বস্তু মনে করে এবং যাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত একান্ত অভিলাষ করে; উহা জীবের কেবল বন্ধনের হেতু। ঐ সকল দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া নানা কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার ফলে জীব পুনঃ পুনঃ ইহসংসার-রূপ কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করে ও বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি রাজকণ্ঠের অমূল্য রত্নহার সংগ্রহ করিয়া নিজ পকেটে পূরিয়া স্বচ্ছন্দে পলায়ন করিল, সেই অমূল্য রত্ন হইতেছে পরমজ্ঞান। উহা লাভ করিতে পারিলে তাহাতে বন্ধন হয় না, উহার ফল মুক্তি। ঐশ্বর্য্য বৈভবাদি

ও আত্মীয়বর্গতে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া না পড়িলে তবে জীবের পরাজ্ঞান-লাভের জন্য লালায়িত হওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু জীব প্রথমে উহা না বুঝিতে পারিয়া সম্মুখে মায়িক সামগ্রীর মনোহর চাক্‌চিক্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বন্ধন-দশাই বরণ করিয়া লয়।

বাবা ঠিক এই প্রকারের আর একটি গল্প বলিয়াছিলেন। গল্পটির নাম, "আগে বাড়" অর্থাৎ অগ্রসর হও। গল্পটি এই,—এক ব্যক্তি প্রত্যহ জঙ্গলে গিয়া কাঠ কাটিয়া আনিত এবং উহা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইত, তাহা দ্বারা কোন প্রকারে দিনাতিপাত করিত। একদা এক মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি বলিলেন, "বাচ্চা! আগে বাড়।" অর্থাৎ তুমি সম্মুখে আরও অগ্রসর হইয়া যাও। সেই মহাত্মার বাক্যানুসারে সে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই চন্দন বৃক্ষের অরণ্য দেখিতে পাইল। তথা হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ব্বক বাজারে বিক্রয় করায় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক মূল্য পাইতে লাগিল। আয়বৃদ্ধি হওয়ায় কিছুদিন তাহার বেশ চলিল। তৎপরে সে চিন্তা করিয়া দেখিল, ঐ মহাত্মা আমাকে বলিয়াছেন "আগে বাড়।" সুতরাং ঐ অবস্থায় সে সন্তুষ্ট না থাকিয়া আরও সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাতে সে অকস্মাৎ একটী তাম্র-খনির সন্ধান পাইল। উহা হইতে তাহার প্রচুর লাভ হওয়ায় প্রথমে সে সন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু তৎপর সেই মহাত্মার বাক্য স্মরণ হওয়ায় আরও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিল। তখন একটী রূপার খনি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। তাহা হইতে ঐ ব্যক্তির অতিশয় লাভ হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু তাহাতে সে আসক্ত বা আবদ্ধ হইল না। 'আগে বাড়' কথাটী বিস্মরণ না হওয়ার ফলে সে আরও অগ্রসর হইতে থাকিল। তাহাতে সে ক্রমে ক্রমে সোনার খনি এবং তৎপর মণি-মাণিক্য ইত্যাদি বহুমূল্যবান্ পদার্থ-লাভে সমর্থ হইল।

তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইলেও মহাত্মার 'আগে বাড়' কথাটী সে ভুলিল না। মহাত্মার বাক্যানুসারে সে বরাবরই সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিল। তাহার ফলে অবশেষে সে 'অখণ্ডে' মিশ্রিত হইতে সমর্থ হইল। তাই সাধুবাবা আমাদিগকে বলিতেছিলেন যে, সাধন-মার্গেও এই প্রকার নিয়ম। পথে অগ্রসর হইবার কালে কিছু লাভ হইলে তাহাতে আসক্ত বা আবদ্ধ না হইয়া এগিয়ে গেলে ক্রমে অধিক উন্নতি হয় ও শেষে ব্রহ্মলাভও হয়। সাধনে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই ক্রমে ক্রমে অধিক আনন্দ পাওয়া যাইবে। পরে একেবারে জলের তরঙ্গ ও জল এক হইয়া মিশিয়া যাইবে। আসক্তি থাকিলেই বন্ধন হয়, আমরা সামান্য মায়িক বস্তুর সুখে বিমোহিত ও আসক্ত না হইয়া সম্মুখে যতই অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই ক্রমে ক্রমে অধিক আনন্দ পাইতে থাকিব। বাবা বলিতেছিলেন, অখণ্ড অর্থাৎ খণ্ডরহিত সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, 'অক্ষয়' অর্থাৎ যাহা ক্ষয়রহিত অর্থাৎ ব্রহ্ম। মায়িক পদার্থে বিমুগ্ধচিত্ত মানবের পক্ষে সেই বস্তুর সন্ধান পাওয়া অতীব কঠিন কথা। কিন্তু জাগতিক ক্ষণিক সুখদায়ক পদার্থের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যিনি দৃঢ় চেষ্টায় তাঁহার পথে অগ্রসর হইয়া চলিবেন, তিনিই তাঁহার সন্ধান প্রাপ্ত হইবেন।

লোভ ও মিথ্যা কল্পনারূপ আকাশ-কুসুমের পরিণাম কি বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা আমাদের নিকট সেখ চিল্লি নামক এক নির্ব্বোধ ফকিরের গল্প বলিয়াছিলেন। সে গল্পটী এইরূপ :—

একদা সেখ চিল্লি নামক একজন ফকির বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক একটী ডালে বসিয়া সেই ডালটাই কাটিতেছিল। ঐ সময় সেই স্থান দিয়া এক পথিক গমন করিতেছিল। সে ঐ ব্যাপার দেখিতে পাইয়া বলিল, "তুমি ও কি করিতেছ? এখনই যে বৃক্ষ হইতে নিম্নে পতিত হইবে।

তদুত্তরে ফকির বলিল, "আমাকে শিক্ষা দিবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।" সে ব্যক্তি চলিয়া গেলে ফকির পূর্ব্ববৎ স্বীয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। অল্পক্ষণ পরই বৃক্ষ-শাখার সহিত ফকির ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। ইহাতে সে অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিল; ভাবিল সে যে বৃক্ষশাখার সহিত অল্পক্ষণ পরই পড়িয়া যাইবে একথা পথিক কিরূপে পূর্ব্বে জানিতে পারিল? সে মনে করিল, ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই দৈবজ্ঞ হইবে। ইহা মনে করিয়া ফকির ছুটিয়া গিয়া পথিককে ধরিল এবং বলিল, "আমার কোন দিবস মৃত্যু হইবে তাহা আমায় বল ত?" পথিক ভাবিল এ ব্যক্তিটী যেরূপ নির্ব্বোধ দেখিতেছি তাহাতে ইহার কথার যদি আমি উত্তর না দিই, তবে লোকটা ক্রুদ্ধ হইয়া এখনি আমাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিবে। তাহা হইতে বরং একটা কিছু বলিয়া দিই, এই চিন্তা করিয়া সে বলিল, "আট দিবস পরে তোমার মৃত্যু হইবে।" ঐ কথায় চিল্লির দৃঢ় বিশ্বাস হইল। সে তখন দৌড়িয়া মাতার নিকট গেল এবং তাঁহাকে বলিল, "আমাকে অমুক তারিখের প্রাতে একখানি খুব বড় ও পুরু রুটি তৈয়ার করিয়া দিতে হইবে।" মাতা ভাবিলেন, আমার পুত্রটীর বোধ হয় একখানি পুরু রুটি খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি তাই পুত্রের বাক্যে সন্তোষের সহিত সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিলেন। চিল্লি কিন্তু পুরু রুটি এই নিমিত্ত প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিল যে, অষ্টাহ পরে যখন তাহার মৃত্যু হইবে, তখন সে তো কবরের মধ্যে রহিবে, সুতরাং ক্ষুধা পাইলে তথায় আহার্য্য মিলিবে কোথা হইতে? এই জন্য কবরের মধ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে ঐ মোটা রুটিখানি মুখের সহিত সে বাঁধিয়া লইবে ইহা স্থির করিয়াছিল। চিল্লি ভাবিল, যখন বেশী ক্ষুধা পাইবে, তখন মুখ নীচু করিয়া কামড়

দিয়া রুটিখানি খাইলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে। যখন এ বিষয়টী স্থির হইয়া গেল, তখন সে কিয়দ্দূর গমন করত একটী বৃক্ষতলে নিজের নিমিত্ত কবর খুঁড়িতে আরম্ভ করিল। সপ্তাহ গত হইলে অষ্টম দিবসের প্রাতঃকালে সে মাতার নিকট হইতে তাঁহার তৈয়ারি রুটিখানি লইয়া আসিয়া উহা উত্তমরূপে মুখের সহিত বাঁধিয়া লইল। পরে নিজেই কবরের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেহের উপর মৃত্তিকা চাপাইয়া দিতে লাগিল। সে কেবল মাত্র মুখখানি বাহিরে রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গ মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত করিল।

সেই দিবস একজন সওদাগর ঘৃত বিক্রয় করিবার নিমিত্ত ঐ পথ দিয়া গমন করিতেছিল, সওদাগরের ঘৃতের ভাণ্ডটী যে ব্যক্তি বহন করিতেছিল, সে হঠাৎ পথিমধ্যে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। সওদাগর ইহাতে বিশেষ মুস্কিল বোধ করিতেছিল। যে বৃক্ষতলে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে চিল্লি কবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার অদূরে সওদাগর ঘৃতভাণ্ডটী নামাইয়া রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছিল ও আপন মনে বলিতেছিল, "এখন যদি এই ঘৃতভাণ্ডটী বহন করিবার নিমিত্ত একটী লোক পাই, তবে আমি তাহাকে এক টাকা পুরস্কার দিই।" অদূরে কবরে শায়িত চিল্লি ঐ বাক্য শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, "আমিই তোমার ঘৃতভাণ্ডটী বহন করিতে পারিতাম, কিন্তু কি করিব, আমি যে মরিয়া গিয়াছি।" তাহার কথা শুনিয়া সওদাগর বলিল, "মৃত্যু হইলে কি লোকে কথা বলিতে পারে?" তদুত্তরে চিল্লি বলিল, "আমার কেবল অল্পক্ষণ হইল মৃত্যু হইয়াছে।" ঐরূপ বাক্য-শ্রবণে সওদাগর ভাবিল, এ ব্যক্তি বোধ হইতেছে পাগল বা নির্ব্বোধ; যাই হউক, যদি এ ব্যক্তি ঘৃতভাণ্ডটী বহন করিতে সম্মত হয়, তবে আমার পক্ষে বিশেষ সুবিধা। এই চিন্তা করিয়া সওদাগর উহার নিকটে গিয়া

উহার দেহের উপর হইতে মৃত্তিকা সরাইয়া চিল্লিকে বাহির করিল এবং ঘৃতভাণ্ডটী তাহার মস্তকোপরি তুলিয়া দিল। সওদাগর চিল্লিকে বলিল, "তুমি যদি নির্দ্দিষ্ট স্থানে ভাণ্ডটী বহন করিয়া লইয়া যাইতে পার, তবে তোমাকে এক টাকা পুরস্কার প্রদান করা হইবে।" চিল্লি এক টাকা পুরস্কার পাইবে শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হইল। সে ঘৃতভাণ্ডটী মস্তকে লইয়া যাইতে যাইতে মনোরাজ্যে কল্পনায় আকাশ-কুসুম রচিতে লাগিল। চিল্লি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, আজ যে টাকা পাইব, ইহা দিয়া আমি কি করিব ? প্রথম একজোড়া মুরগী ক্রয় করিব। তাহা হইতে যখন ২১টী ডিম হইবে এবং ডিমগুলি যখন ফুটিবে, তখন আমার ২৩টী মুরগী হইবে। আবার তাহাদের যখন ডিম ও বাচ্চা হইতে আরম্ভ হইবে, তখন আমার বহুসংখ্যক মুরগী হইবে। সেগুলি বড় হইয়া তাহাদের যখন আবার ডিম বাচ্চা ইত্যাদি হইতে থাকিবে তখন ত কথাই নাই। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া যখন আমার এক হাজার মুরগী হইবে, তখন সবগুলি বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় আমি একটী বক্‌রী (ছাগলী) ক্রয় করিব। কালে সে যখন তিনটী বাচ্চা প্রসব করিবে, তখন আমার চারটী বক্‌রী হইবে। তাহাদের যখন বাচ্চা হইতে থাকিবে, তখন কি আনন্দের বিষয়ই না হইবে। ঐ বাচ্চাগুলির আবার যখন বাচ্চা হইতে থাকিবে,তখন ক্রমেই বক্‌রীর পাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে অবশেষে আমার হাজার বক্‌রী হইবে। আমি তখন সেগুলি বিক্রয় করিয়া একটী ঘোড়া কিনিব। এইরূপে দিন দিন যতই আমার ধনবৃদ্ধি হইতে থাকিবে, আমি তাহা দ্বারা ঘর বাড়ী বাগান ইত্যাদি প্রস্তুত করিব। ক্রমে বিবাহ করিয়া পুত্র কন্যা জন্মিলে আমি ঝি চাকর রাখিয়া দিব। ঘৃতভাণ্ডটী মস্তকে লইয়া যাইতে যাইতে সে এইরূপে বহু কল্পনা করিতে লাগিল। অবশেষে সে

কল্পনা করিতেছিল যে, এই প্রকারে সে বড়লোক হইলে একদিন আরামে বসিয়া যখন তামাকু সেবন করিতে থাকিবে, তখন তাহার ভৃত্য আসিয়া খবর দিবে যে, "আপনি আহার করিতে চলুন, আপনার ভোজ্য প্রস্তুত।" সে তখন বিরক্তিসহকারে বলিয়া উঠিবে, "আভি নেই খায়েগা।" এইরূপ চিন্তার ফলে কৃত্রিম কোপপ্রকাশপূর্ব্বক যেমন সে সজোরে মস্তক সঞ্চালন করিয়াছে, অমনি তাহার মস্তকস্থিত ঘৃতভাণ্ডটী ঊর্দ্ধ হইতে ভূতলে পতিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ডটী ভাঙ্গিয়া সমস্ত ঘৃত নষ্ট হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে সওদাগর মহা রাগান্বিত হইয়া যখন চিল্লিকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল, তখন সে বলিল, "আপনার ত মাত্র এক ভাণ্ড ঘৃত নষ্ট হইল, আমার যে কত ক্ষতি হইল! আমার মুরগী, বক্রী, ঘোড়া, বাড়ীঘর, স্ত্রী পুত্র, ঝি চাকর ইত্যাদি একদম সমস্তই নষ্ট হইয়া গেল।"

গল্পটী বলিয়া সাধুবাবা আমাদের বলিলেন, ফকির চিল্লি যেরূপ একটী টাকা পাইবে শুনিয়াই আনন্দে মনোরাজ্যে অযথা সৃষ্টি রচনা করিতেছিল, তদ্রূপ মানবও মনের সঙ্কল্প ও কল্পনা দ্বারা এই প্রপঞ্চ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের অজ্ঞানতাবশতঃ এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ জগৎ সত্য বোধ হইলেও জ্ঞানীদের নিকট ইহা আকাশ-কুসুমবৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা। যেরূপ কেহ নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখে, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে সে সমস্তই মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ ইঁহাদের মতে জগতে আমাদের যাহা কিছু নেত্রগোচর হইতেছে, ইহা চিল্লির ঘর বাড়ী, স্ত্রী পুত্রাদির মত অলীক। সকলই আমাদের পূর্ব্ব সংস্কার হেতু মনের কল্পনা মাত্র। বাবা তাই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "বস্তু ত কুছ নেই থা, মন্‌কা সঙ্কল্প মাত্র হায়।" তিনি আরও বলিলেন—

"এ সংসার হ্যায় মনকো তামাসা।
জীবকে ভয়া হ্যায় গলেকা ফাঁসা॥
যোঁ বাজিকর রাজি রচত-হ্যায়।
সৎপনেকি নেহি তেঁ আশা॥"

অর্থাৎ এই সংসার মনেরি তামাসা, ইহা মিথ্যা বা কল্পনা রচিত। জীব ইহাকে সত্য মনে করিয়া গলায় ফাঁস বা বন্ধন পরিয়াছে। যেরূপ যাদুকর যাদুবিদ্যার দ্বারা অনেক কিছু রচনা করে, কিন্তু তাহার মধ্যে সত্য বস্তুর আশা করা যায় না।

বাবা বলিলেন—অজ্ঞানিগণ ইঁহা সত্য বস্তু মনে করে বটে, কিন্তু জ্ঞানিগণ জানে ইহা মনেরই খেলা।

বাবার কথা শুনিয়া মনে পড়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শান্তি-গীতায় অর্জ্জুনের পুত্রশোক-নিবারণ জন্য উপদেশ করিয়াছিলেন :—

"দৃষ্ট্বা তু শুক্তিরজতং লোভাদ্ গ্রহিতুমুদ্যতঃ।
প্রাক্ চ বোধোদয়াৎ দ্রষ্টা স্থানান্তরং গতস্ততঃ॥ ১৫
পুনরাগত্য তত্রৈব রজতং স প্রপশ্যতি।
পূর্ব্বদৃষ্টং মন্যমানো রজতং হর্ষমোদিতঃ।
বুদ্ধেঃ প্রত্যয়সংস্কারাৎ নাস্তি রূপ্যং ত্রিকালকে॥ ১৬
দেহো ভার্য্যা ধনং পুত্রস্তরুরাজির্নিকেতনম্।
শুক্তিরজতবৎ সর্ব্বং ন কিঞ্চিৎ সত্যমস্তি তৎ॥ ১৭॥

অর্থাৎ হে মহাবাহো, ভ্রান্তিবশতঃ যেরূপ শুক্তিকে প্রতীতিকাল মাত্রস্থায়ী মিথ্যা রজতজ্ঞান হইয়া থাকে, এই সমস্ত জগৎও সেইরূপ

শুক্তি-রজতের ন্যায় প্রাতিভাসিক মিথ্যা, কেবল বুদ্ধির প্রত্যয়ে পূর্ব্বদৃষ্ট সংস্কারবশে প্রতীত হয় মাত্র। যেরূপ শুক্তিতে আরোপিত রজত দর্শন করিয়া বিভ্রান্ত ব্যক্তি লোভাভিভূত হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে উদ্যত হয় এবং সেই ভ্রান্তিনাশের পূর্ব্বে, দ্রষ্টা যদ্যপি কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করে, পরে সেই স্থানে পুনরাগত হইয়া যদিও ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালেই শুক্তিতে রজতসত্তার সম্পূর্ণ অভাব, তথাপি তাহার ভ্রান্তজ্ঞানের নাশ হয় নাই বলিয়া, বুদ্ধিতে সত্য রজতজ্ঞান থাকাতে সে রজতই দর্শন করে এবং সেই পূর্ব্বদৃষ্ট রজত, ইহা মনে করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত শুক্তিতত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হওয়া যায়, ততকাল রজতভ্রম কিছুতেই নিবারিত হয় না, সুতরাং বুদ্ধির সংস্কারবশতঃ যেমন বারংবার রজতই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ এই যে দেহ, ভার্য্যা, ধন, পুত্র, তরুরাজি নিকেতন ইত্যাদি এ সকলই শুক্তি-রজতের ন্যায় কল্পিত, মিথ্যা ; ইহারা বাস্তবিক পক্ষে সত্য নহে। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য বা নিত্যবস্তু, মায়া দ্বারা জীব-জগতের রূপ ধারণ করিয়া লীলা করিতেছেন মাত্র। এই মায়িক জগতের সাময়িক প্রাতিভাসিক সত্তা আছে বটে, কিন্তু নিত্য সত্তা নাই।

বাবা বলেন—

ভেদ ভরম্ কর্ত্তৃত্ব ভরম্ পুনঃ ভরম্ সঙ্গ বিকার।
ব্রহ্ম ইতর* জগ সত্য ভরম্ পাঁচো ভরম্ সংসার॥

অন্য একদিন বাবা আমাদিগকে একটী উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। তাহা এইরূপ,—এক গোবরে পোকার সহিত একটী ভ্রমরের বন্ধুত্ব

* ইতর শব্দের অর্থ ভিন্ন।

হইয়াছিল ; একদা ভ্রমর তাহার নূতন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিল। গোবরে পোকা মনে করিল, বন্ধু যদি আমাকে ভাল আহার্য্য না দিতে পারে, তাই সে নিমন্ত্রণে আসিবার সময় একগুলি গোবর মুখে করিয়া আনিল। ভ্রমর বন্ধুকে আসিতে দেখিয়া যত্নপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিল এবং রাজ-উদ্যানের যে সকল সুগন্ধি পুষ্পে মধু পান করত সে নিজে পরম তৃপ্তি পায়, সেই উদ্যানে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। উভয়ে বহুক্ষণ পুষ্পে উপবেশন করত মধু পান করিবার পর ভ্রমর বন্ধুকে প্রশ্ন করিল, "বন্ধু ! কেমন স্বাদ পাইতেছ ?" তদুত্তরে গোবরে পোকা বলিল—'কৈ, এ সকল পুষ্পে কোন স্বাদই ত নাই ?' ভ্রমর মনে করিল, ইহা হইতেও উৎকৃষ্ট বস্তু বোধ হয় বন্ধু নিত্য আহার করিয়া থাকে, তাই সে বন্ধুর প্রীতি-বিধানার্থে তাহাকে লইয়া রাজোদ্যানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানে গেল। এবং বন্ধুর পরিতোষের নিমিত্ত তাহাকে অতি শ্রেষ্ঠ পুষ্পে বসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে সে পুনরায় বন্ধুকে প্রশ্ন করিল, "কেমন ভাই, এখন কেমন লাগিতেছে ?" তখনও গোবরে পোকা বলিল—"কৈ ইহাতেও কোন বিশেষ স্বাদ নাই।" এ উত্তরে ভ্রমর অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং দেখিতে পাইল তখন পর্য্যন্ত বন্ধুর মুখে কিছু গোবর লাগিয়া রহিয়াছে। এই নিমিত্তই শ্রেষ্ঠ পুষ্পের পরিমলও বন্ধু উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ইহা বুঝিয়া সে নিকটস্থ এক কমল-সরোবরে বন্ধুকে লইয়া গিয়া প্রথম তাহার মুখ উত্তমরূপে ধৌত করাইয়া দিল। তৎপর তাহাকে একটী শ্রেষ্ঠ কমলে বসাইয়া ভ্রমর চলিয়া গেল। নব বিকশিত কমলের অপূর্ব্ব গন্ধে ও মধুপানে তখন গোবরে পোকা তন্ময় হইয়া কমলমধ্যে বসিয়া রহিল। সন্ধ্যাকালে আপনা হইতেই কমলটী মুদিত হইয়া গেল ; গোবরে পোকা উহার মধ্যেই সে দিন রহিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নিকটস্থ শঙ্কর-মন্দিরের পূজারি মহাদেবের পূজার জন্য অন্যান্য পুষ্পের সহিত ঐ কমলটীও তুলিয়া লইয়া গেল এবং পূজাকালে ঐ কমলটী মহাদেবের মস্তকে প্রদান করিল। তৎপর অন্য এক ভক্ত শঙ্করের পূজার নিমিত্ত আসিয়া এক কলসী গঙ্গাজল শঙ্করের মাথায় চড়াইল। ঐ জলস্রোতে ভাসিয়া কমলটী নিকটস্থ নালা দিয়া অদূরে গঙ্গায় যাইয়া পড়িল ও গঙ্গাধারায় মৃদুমন্দ গতিতে ভাসিয়া চলিল। ক্রমে সূর্য্য উদিত হইলেন; কমলটি পুনর্ব্বার প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত গোবরে পোকাটি কমল-মধুতে এত মুগ্ধ, এমন মাতোয়ারা যে ঐ কমল পরিত্যাগ করত উড়িয়া যাইবার প্রবৃত্তিই তাহার ছিল না।

এদিকে ভ্রমর তাহার বন্ধুকে যথাস্থানে না পাইয়া নানাস্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল। প্রথমে কমল-সরোবরে বন্ধুকে না পাইয়া সে মনে করিল, শঙ্করজীর পূজার ফুল এই স্থান হইতে সংগ্রহ করা হয়, সুতরাং মন্দিরে গিয়া একবার বন্ধুর অনুসন্ধান করি। তথায় গিয়া বন্ধুর সন্ধান না পাওয়ায় নালা দিয়া জলস্রোতের সহিত অনেক পুষ্প গঙ্গায় গিয়া পড়িতেছে দেখিয়া ঐ সকল পুষ্পমধ্যে বন্ধুকে তল্লাস করিতে করিতে অবশেষে পূর্ব্বোক্ত পদ্মমধ্যে বন্ধুর সন্ধান মিলিল। বন্ধুকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করায় গোবরে পোকা ভ্রমরকে বলিল—

"সৎসঙ্গতসে তর গেয়ি চড়ে ঈশকে শিব্।
ভ্রমরা মুঝ্‌কো জানে দে জল ধারাকে বিচ্॥"

অর্থাৎ সৎসঙ্গ দ্বারা তরিয়া গিয়া আমি শঙ্করের মস্তকোপরি স্থান পাইয়াছিলাম। হে বন্ধু ভ্রমর! তুমি আমাকে ছাড়িয়া দেও, আমি গঙ্গা-ধারা দিয়াই চলিয়া যাইতে চাই।

বাবার গল্পের এই মর্ম্মার্থ যে, যদ্রূপ গোবরে পোকা বন্ধুর নিমন্ত্রণে আসিবার সময়ও মুখে গোবর লইয়া আসায় অতি সুগন্ধি পুষ্পেরও মধুর স্বাদ প্রাপ্ত হইতেছিল না, তদ্রূপ বিষয়াসক্ত বদ্ধ জীব যদি অন্তরে বিষয়-চিন্তা লইয়া সাধু পুরুষের নিকট আসে, তবে সেও তাঁহার উপদেশের প্রকৃত মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ সাধু পুরুষের প্রতি সে প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করত যদি বাসনা অভিমানাদিরূপ গোবর বিধৌত করিয়া তাঁহার উপদেশ-প্রার্থী হয়, তবে ঐ সৎসঙ্গ দ্বারা মহান্ ফললাভ হয়। এমন কি সে গঙ্গারূপী প্রেমনদীতে অবগাহন এবং শ্রীভগবানের স্পর্শসুখের সৌভাগ্যও লাভ করিতে পারে। বাবা বলিলেন—"কিঞ্চিৎ বিষয়-গন্ধ অন্তরে রহিলেও প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায় না।"

কৈলাসপতি

চতুর্থ খণ্ড

১৩৩৬

প্রয়াগে কুম্ভমেলা

কৈলাসপতি

প্রথম তরঙ্গ

প্রয়াগধামে পূর্ণ কুম্ভ। বাবা মেলার বহুপূর্ব্বে ঝুঁসিতে মুন্সি-বাগের নীচে গঙ্গার চড়ায় ছাউনি করিয়াছিলেন। ছাউনি করিয়া আমাদিগকে তথায় আহ্বান করিলেন। আমরা পূর্ব্ব হইতেই যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; ব্যাকুল অন্তরে আমরা প্রয়াগে ছুটিলাম; এবং সহরপ্রান্তে 'বুল্‌বুল্‌বাগ' নামক বাড়ীতে উঠিলাম।

মেলাক্ষেত্র পানে, চাহিয়া বিস্মিত হইলাম। কেবল নরমুণ্ড। দেখিয়া মনে হইল সমগ্র হিন্দু-ভারতবর্ষ যেন এইখানেই একত্র হইয়াছে। কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই মেলা চলিয়া আসিতেছে তাহা কেহ আজও নির্ণয় করিতে পারেন নাই। আমাদের পূর্ব্বে কত কোটি কোটি হিন্দু এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কূলে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, এই কি সেই ত্রিবেণী যেখানে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরাম-চন্দ্র জানকীসহ ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন? এই কি সেই ত্রিবেণী যাহার কূলে বসিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, মহাভক্ত শ্রীরূপ গোস্বামীকে দীক্ষা ও শিক্ষা দান করিয়াছিলেন? এই কি সেই ত্রিবেণী, যাহার কূলে ত্রেতাযুগে বেণীমাধব চতুর্ভুজ ধারণ করত ভীত-জনকে অভয়দান করিয়াছিলেন? আমি স্তব্ধচিত্তে দাঁড়াইলাম। অতীতের স্মৃতি মনের ভিতর একে একে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শ্বেততরঙ্গা জাহ্নবী দেখিলাম, নীলবসনা যমুনা দেখিলাম। কিন্তু রক্তাম্বরা সরস্বতী কই? তুমি ত ছিলে মা, যখন শ্রীরামচন্দ্র তোমার ভক্তিবিগলিত

সলিলে চরণ ধৌত করিয়াছিলেন, শ্রীরূপ গোস্বামী নবজীবন লাভ করিয়া তোমার সলিলে অবগাহন করিয়াছিলেন। এখন লুকাইলে কেন মা? আমরা জ্ঞানহীন বলিয়া কি? কিন্তু মা, জ্ঞান বিলাইতে আজও ত কত শত পুণ্যশ্লোক সাধু মহাত্মা এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিতে আসিতে-ছেন, সেদিনও আসিয়াছিলেন, মহাত্মা দয়ালদাস, ভোলানন্দ গিরি, কাঠিয়া বাবা, করণদাস, গম্ভীরনাথ, অর্জ্জুন দাস, জটীয়া বাবা প্রভৃতি মহাজ্ঞানী ও প্রেমিকগণ। আজও ত আসিতেছেন সন্তদাস, হংসদেব, প্রণবানন্দ প্রভৃতি জ্ঞানী মহাপুরুষ। তবে তোমার দেখা পাই না কেন মা?

কূলে নয়ন ফিরাইয়া দেখিলাম, বিশাল দুর্গ। হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজদের কীর্ত্তি বুকে ধরিয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমে এই বিশাল দুর্গ কত বর্ষ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দুর্গ-প্রাচীর ইসলামের বিগত গৌরব ঘোষণা করিতেছে, দুর্গাভ্যন্তরে হিন্দুর অক্ষয়বট ও অশোকস্তম্ভ আজও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, দুর্গশিখরে বৃটিশ-কেতন সগর্ব্বে উড়িতেছে।

গঙ্গার চড়ার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম; দেখিলাম, তথায় শুধু সন্ন্যাসী। কেহ আকাশতল, কেহ ছত্র, কেহ কুটীর, কেহবা বস্ত্রাবাস আশ্রয়ে বাস করিতেছেন। কাহারও পরিধানে কৌপীন, কাহারও বা গৈরিক বস্ত্র। কাহারও ভূষণ মালা তিলক, কাহারও বা বিভূতি জটা, কাহারও সম্পত্তি দণ্ড, কাহারও বা করঙ্ক। এইরূপ শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী দেখিলাম।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

প্রয়াগে পৌঁছিয়া তৎ পর দিবসে ২৯শে অগ্রহায়ণ অপরাহ্নে আমরা সাধুবাবাকে প্রণাম করিতে চলিলাম। যদিও তিনি তাঁহার নিকট পৌঁছার উপায় বিশেষরূপে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু জল-পথে নৌকা-যোগে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইবে বিবেচনায় আমরা মোটরে স্থলপথে রওনা হইয়াছিলাম। এলাহাবাদ সহরে সুপ্রশস্ত রাস্তাগুলি পার হইয়া যমুনার উপর লোহার পিপের সেতুর উপর দিয়া আমরা বেশ আনন্দে চলিলাম, কিন্তু ঐ পারে অনির্দ্দিষ্ট পথ যখন প্রান্তরে মিশাইয়া গেল, তখন আমরা চিন্তিত হইলাম। পরে অনেক ঘুরিয়া বহুদূরে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে দেখিতে পাইয়া আমরা মোটার হইতে নামিয়া পড়িলাম। সেখান হইতে আমরা একটী পথ-প্রদর্শক সঙ্গে করিয়া অনেক ঘুরিয়া ঝুঁসির মুন্সি-বাগের নিম্নস্থ চড়ায় সাধুবাবার ছাউনিতে সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎপূর্ব্বে উপনীত হইলাম। বাবার ছাউনির মধ্যস্থলে একটী অষ্টকোণ গৃহের উপর গৈরিক বর্ণের পতাকা উড়িতেছিল। তৎসন্নিধানে গঙ্গার চরের বালির উপর উন্মুক্ত স্থানে সাধুবাবা কতিপয় সন্ন্যাসী পার্ষদসহ উপবিষ্ট ছিলেন। বহু আয়াসে বাবার দর্শন-লাভে সমর্থ হইয়া আমরা সকলে আনন্দে সমবেত কণ্ঠে 'কৈলাসপতিকী জয়', ও 'হরিহর' শব্দ উচ্চারণ করত তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলাম। বলা বাহুল্য হঠাৎ আমাদিগকে দেখিয়া তিনিও বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং নিকটস্থ এক খানি চৌকিতে আমাদিগকে বসাইয়া কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিলেন। কিছুকাল কথোপকথনের পর আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাবা তাঁর শয়ন-তাম্বু,

সভামণ্ডপ, অন্নপূর্ণা-ভাণ্ডার, পাকশালা প্রভৃতি ঘুরিয়া দেখাইলেন। বাবার বহু সাধু ও গৃহস্থ অতিথিদের থাকিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কুশ-নির্ম্মিত কুটীর তৈয়ারী করাইতেছেন, তাহাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদিগকে দেখাইলেন। পরদিবস ১লা পৌষ পূর্ণিমা তিথি। ঐ পূর্ণিমা উপলক্ষে সাধুবাবা প্রায় দেড় হাজার সাধুকে মালপোয়া খাওয়াইবেন, তাহাই প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতেছেন দেখিলাম। পরদিবস মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য বাবা আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বাবার পাকাদি কার্য্য যাহাতে ঠিক সময় আরম্ভ হয় ও প্রস্তুত শেষ হয় তজ্জন্য বাবার পাকশালায় একটী ঘড়ী রহিয়াছে দেখিলাম। সে দিন সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আমরা বাবাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

১লা পৌষ পূর্ণিমা, সোমবার প্রাতে আমরা সাধু-ভোজন দর্শন করিতে বাবার ছাউনিতে রওনা হইলাম। প্রথমে মোটরে উঠিয়া বাঁধ পার হইয়া প্রায় দেড় মাইল যাইয়া ফোর্টের নিকট যমুনার ঘাটে একখানি নৌকায় উঠিলাম। কিয়দ্দূর যমুনার নীল জলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে ত্রিবেণী-সঙ্গমে আসিয়া গঙ্গার ধূসরবর্ণ জলরাশি দৃষ্টি-গোচর হইল। উভয় নদীর সঙ্গম-স্থানের রেখাটী সুন্দররূপে বহুদূর পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। সঙ্গমের সেই তরঙ্গ-ভঙ্গ মধ্য দিয়া যাইতে আমাদের বিশেষ আনন্দ অনুভব হইতেছিল। সঙ্গমস্থল ছাড়িয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা যাওয়ার পর বেলা সাড়ে দশটার সময় সাধুবাবার ছাউনীতে উপনীত হইলাম। পূর্ব্ব-দৃষ্ট সেই অষ্টকোণ গৃহের উপর গৈরিক বর্ণের পতাকাখানা সেদিনও তেমনি বায়ুভরে উড়িতেছিল। ঐ গৃহটি বাবার ধর্ম্মসভামণ্ডপ। ঐ গৃহে বসিয়া বাবা আগন্তুক সাধু মহান্তগণের ও দর্শনার্থিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সভাগৃহে স্বরূপানন্দ স্বামিজী নামক এক পণ্ডিত সাধু প্রত্যহ প্রাতে ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত পুরাণ

পাঠ ও অপরাহ্নে ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিয়া থাকেন। আমরা যে সময় ঐ স্থানে আসিলাম, সে সময় বাবা ঐ সভাগৃহে উপস্থিত ছিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যে আহারীয় সামগ্রীর প্রস্তুত সংবাদ পাইয়া বাবা প্রশ্ন করিলেন, "গঙ্গামায়ীর ভোগ লাগান হইয়াছে ত?" অনুকূল উত্তর পাইয়া বাবা উঠিলেন। ঐ সময় গঙ্গার উভয় দিক হইতে গৈরিক-পরিহিত অসংখ্য সাধু শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বাবার ছাউনীর দিকে আসিতে-ছিলেন। সমাগত কয়েকজন সাধু গঙ্গার মধ্যে নামিয়া স্নানাদি সমাপন করিলেন, কেহ বা হস্ত-মুখ-প্রক্ষালনপূর্ব্বক কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল ভরিয়া রন্ধনশালাভিমুখে গমন করিলেন। আমরাও বাবার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। দেখিলাম, আহার্য্য-বিতরণ-স্থানটী বেশ সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে। রন্ধনশালার অঙ্গনটী বিস্থার বেড়া দিয়া ঘেরা, উহার উত্তর-পশ্চিম কোণটীর দুইদিকে দুইটী উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। তদুপরি দুই ব্যক্তি বসিয়া আছেন, আর নীচে রন্ধনশালা হইতে কয়েক ব্যক্তি মালপোয়া এবং আলু-কপির ব্যঞ্জন তাঁহাদের হস্তে তুলিয়া দিতেছেন। মঞ্চোপরি উপবিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের সাধুবৃন্দকে আহ্বানটীও আমাদের নিকট বেশ লাগিতেছিল। তাঁহারা মালপোয়ার গোচ্ছা হস্তে ধারণ করত সাদরে সাধুগণকে এই আহ্বান করিতেছিলেন, "দীননাথ আও" "ভগবান আও" "দীনদয়াল আও" "আও মেরা আত্মা" "আও মেরা স্বামী" ইত্যাদি।

আর একদিকে অগণিত শ্রেণীবদ্ধ সাধু অগ্রসর হইয়া হস্তোত্তোলন-পূর্ব্বক মালপোয়া এবং তাঁহাদের হস্তস্থিত ভিক্ষাপাত্রটীতে ব্যঞ্জন-গ্রহণানন্তর ঐ স্থান ত্যাগ করিতেছিলেন, কোন কোন সাধু অদূরে গঙ্গা-তীরে বসিয়া উহা খাইতেছিলেন। আবার কেহ বা দণ্ডায়মান অবস্থায়

সানন্দে উহার সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন। সাধুবাবা ঐ উভয় মঞ্চের সন্নিকটে তাঁহার সুবৃহৎ ফতেজঙ্গ নামক দণ্ডখানি হস্তে ধারণপূর্ব্বক স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া এই সুবৃহৎ যজ্ঞকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সাধু মহাত্মগণ খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্তিমাত্রেই যখন ঐ স্থান হইতে সরিয়া যাইতেছিলেন, তখন সেই স্থান আবার অন্য সাধুদ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। উঁহাদের মধ্যে একটী কৌপীন-পরিহিত নগ্নকায় বৃহদাকার মৌনী সাধুকে দেখিয়া বাবা বলিলেন "ইনি অবধূত।" এই সব সাধুর মধ্যে অনেকে যে বেশ উচ্চাবস্থার সাধু আছেন—তাহা বলিয়া বাবা বলিলেন—তিনিও এক সময় ইঁহাদের মত নানা ছত্র হইতে আহার্য্য গ্রহণ করত ভক্ষণ করিতেন।

আহার্য্য-বিতরণ-অন্তে সাধুবাবা স্বয়ং অন্তরঙ্গ সাধুদের সহিত সুপবিত্র গঙ্গার বালির উপর উপবেশন করত আহার করিলেন। ঐ সঙ্গে আমাদিগকেও তিনি বসাইয়াছিলেন। আহারান্তে আমরা আবার ধর্ম্মসভায় গিয়া বসিলাম। আমাদের সহিত সেদিনও বাবার ২।৪টী সৎকথা হইয়াছিল। জনৈক আর্ত্ত ভক্ত বাবার নিকট ঔষধপ্রার্থী হইলে বাবা তাঁহাকে বলিলেন,—"মায়ি, কি ঔষধ চাই? শরীরের না মনের?" বাবার কথা শুনিয়া আমিও হাসিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, আমার গুরুমহারাজ বলেন বটে যে, মানবের 'আধি' এবং 'ব্যাধি' দুই প্রকার—শারীরিক যে ব্যাধি তাহা ডাক্তার বৈদ্যের ঔষধ ব্যবহার করিলে আরোগ্যের সম্ভাবনা; কিন্তু মানসিক যে ব্যাধি, উহা কেবল সাধনা ও সৎসঙ্গ দ্বারাই নিবারিত হয়।

আমার স্বামী, পণ্ডিত সাধু শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ স্বামিজীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ ত' উপাধি হইতে? এই উপাধি কিসে যায়? বৈরাগ্য অভ্যাস অবলম্বনে কি ইহা যায়?

শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দজী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"আগে কাপড় সাদা ও শুদ্ধ করিয়া তৎপর রাঙ্গাইলে রং ফুটিয়া উঠে। পূর্ব্বে বৈরাগ্য অবলম্বনের চেষ্টা করিলে মনে বৈরাগ্য ফুটিয়া উঠিবে না। প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন চাই ; অর্থাৎ যাহা কিছু করিবে, তাহা অনাসক্তভাবে ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে করিবে। আসক্তি হইলেই আবদ্ধ হইবে। (১) নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, (২) ভক্তিপূর্ব্বক নাম সাধন (৩) সৎসঙ্গ ও স্বাধ্যায় (৪) ও সদা ধৈর্য্যের সহিত বিচার পূর্ব্বক চলিলে, তাহার ফলে তবে চিত্ত-ভূমি কামনা-শূন্য হওয়ায় নির্ম্মল হইবে, এবং তখন মনে প্রকৃত বৈরাগ্য ফুটিয়া উঠিবে।"

তিনি আরও বলিয়াছিলেন—"চিত্ত নদী-স্বরূপ। তাহাতে দুই প্রকার স্রোত বহে। এক বাসনার স্রোত, দ্বিতীয় কল্যাণের স্রোত। প্রকৃত বৈরাগ্যের বাঁধ বাঁধিয়া বাসনার স্রোত নিরোধ কর, এবং সদা নামসাধন ও উপাসনা ধ্যানের দ্বারা নূতন খাল বানাইয়া চিত্ত-নদীকে ভগবৎ ভক্তির দিকে বা কল্যাণের দিকে সতত প্রবাহিত কর। এ জন্য 'করুণা', 'মৈত্রী', 'মুদিতা' ও 'উপেক্ষা' এই চার ধ্যানেরও অভ্যাস করা প্রয়োজন। ইহাতেই চিত্তের উপাধি মালিন্য ছুটিয়া যাইবে।"

তৃতীয় তরঙ্গ

আমরা 'বুলবুলবাগ' হইতে মাঝে মাঝে সাধুবাবার ছাউনীতে বেড়াইতে যাইতাম। তথায় যখন দেখিলাম, ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিক মনুষ্য-সমাগমহেতু পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তখন আমাদেরও ঐ চড়ায় যাইয়া কয়েক দিন বাস করিবার ইচ্ছা হইল। সাধুবাবা পূর্ব্বেই তাঁহার ছাউনীর মধ্যে দুই তিনখানি কুশের ঘর উঠাইয়া এবং একখানি ছোট তাঁবু খাটাইয়া দিয়া, চতুর্দ্দিকে খানিকটা স্থান বেড়া দ্বারা ঘিরিয়া দিয়া ঐ স্থানে বাসের নিমিত্ত আমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন।

২৫শে পৌষ আমরা তথায় রওনা হইলাম। যখন বাবার নিকট পৌছিলাম তখন বেলা ২টা। আমরা তথায় পৌছিতেই বাবা স্বয়ং আমাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। তিনি পূর্ব্বেই আমাদের শয়ন-ঘর দুইটীতে পুরু করিয়া বিচালী বিছাইয়া তদুপরি চাটাই দিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের সঙ্গে লোক থাকিলেও বাবা তাঁহার নিজের লোক দ্বারা আমাদিগের দ্রব্যাদি বহন করাইয়া দিলেন এবং আঙ্গিনা মধ্যস্থিত চৌকীখানি সরাইয়া গৃহের ছায়ায় রাখিয়া তদুপরি আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। ঐ সময় প্রবল বায়ুতে গঙ্গার চরের বালি উড়িতে থাকায় কলসী কলসী গঙ্গাবারি আনাইয়া আঙ্গিনার বালি ভিজাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। আমরা বাড়ী হইতে আহার করিয়া গেলেও বাবার সস্নেহ অনুরোধে পুনরায় প্রায় সকলকেই প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইল। যদিও বাবার সুমিষ্ট বাক্য এবং সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার আমাদের পক্ষে নূতন নয়; কিন্তু ঐকালে তাঁহার ছাউনীর মধ্যে বহু সাধু ও গৃহী অতিথির সতত তত্ত্বাবধান করা, প্রত্যহ

হাজার হাজার সাধুকে অকুণ্ঠিতভাবে আহার্য্য-প্রদান এবং ঐ কার্য্যের নিমিত্ত সকল সময় অনলসভাবে বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও সকলের প্রতি সব সময় তাঁহার অনুত্তেজিত কোমল মধুর ব্যবহার দৃষ্টে আমরা একেবারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতাম।

বাবার সহিত নৌকাযোগে ত্রিবেণীর চড়ায় আসিয়া লক্ষ লক্ষ সাধুর শোভাযাত্রা-দর্শন, চন্দ্রকরোজ্জল ঝুঁসির সুবিস্তীর্ণ চড়ায় নক্ষত্র-খচিত উন্মুক্ত গগনতলে ভ্রমণ ও তথা হইতে ত্রিবেণীর চরের বৈদ্যুতিক আলোক-শোভিত দৃশ্য-দর্শন প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ 'কুম্ভমেলা ও সাধুসঙ্গ' নামক গ্রন্থেই পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে বাবার ভাণ্ডারা দেওয়ার কথা স্মরণপথে উদিত হইলে আজও মনে বড় আনন্দ হয়। প্রথম পূর্ণিমা তিথিতে ভাণ্ডারা দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম, বাবা বুঝি কোন বিশেষ দিন বলিয়া আজ ভাণ্ডারা দিতেছেন, কিন্তু পরে জানিলাম বাবা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে এইরূপ ভাণ্ডারা প্রত্যহ দিতেছেন। ১৯শে মাঘ সরস্বতী পূজার দিন পর্য্যন্ত এই বৃহৎ যজ্ঞ কার্য্য তিনি সানন্দে অকুণ্ঠিত চিত্তে চালাইয়াছিলেন। মাঘ মাসে কুম্ভমেলা পূর্ণমাত্রায় চলায় সাধুর সংখ্যা আরও প্রায় ১৫০০ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। শুনিলাম, ইহার ছয় বৎসর পূর্ব্বে প্রয়াগের অর্দ্ধ কুম্ভের সময় বাবা ইহা হইতেও অধিক সাধুদের ভাণ্ডারা দিয়াছিলেন। কারণ তখন এতগুলি স্থানে স্থানে ভাণ্ডারার বন্দোবস্ত ছিল না। সেবারেও প্রায় তিন মাস কাল প্রত্যহই তিনি এইরূপ ভাণ্ডারা চালাইয়াছিলেন।

ঝুঁসির চড়ায় বাবা যে ভাণ্ডারা দিয়াছিলেন, তাহা একটা দেখিবার জিনিষ। শত শত সহস্র সহস্র ব্যক্তি তথায় দিনের পর দিন প্রত্যহ আসিতেছেন, আহার্য্য লইতেছেন, ভোজন করিতেছেন, কিন্তু সমস্ত

কার্য্যে নীরবে শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতেছে। কোথাও একটু গোলমাল নাই, ক্রোধের ঝঙ্কার নাই, অভিমানের গর্জ্জন নাই। যিনি ভোজন করিতেছেন, তিনি জানেন ঈশ্বর যাহা আমাকে দিয়াছেন তাহাই আমি ভোজন করিতেছি; আর যিনি ভোজন করাইতেছেন, সেই নিরভিমান মহাপুরুষ বলিতেছেন,—

সাঁঞি সবকো দেত্ হ্যায় পোখত্ হ্যায় দিন রয়েন্।
লোক নাম মের কহে তা'তে নীচে নয়েন॥

অর্থাৎ ভগবানই সকলকে দান করিতেছেন এবং পোষণ করিতেছেন; লোকে রটাইতেছে আমি দান করিতেছি, এইজন্য আমি লজ্জায় চক্ষু নত করিয়া আছি।

বাবার কয়েকটি দোঁহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(১) বহুতি বীতি, থোড়ি রহি, ক্ষীণ ক্ষীণ আউৎ বিহায়।
থোড়ি দিনকে কারণে, মৎকলঙ্ক লাগ্ যায়॥

অর্থাৎ বহু সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, অল্প সময় বাকি আছে, ক্ষণে ক্ষণে আয়ু ক্ষয় হইতেছে, আর অল্প সময়ের নিমিত্ত কেন কলঙ্ক অর্জ্জন কর ?

(২) কবিয়া বৈসে পাতালমে চন্দ্রমা বৈসে আকাশ।
যো যাঁকে হৃদে বৈসে, সো তাহুঁকো পাশ॥

অর্থাৎ কুমুদিনী, চন্দ্রমা হইতে বহু নিম্নে জলে বাস করে এবং চন্দ্রমা বহু উর্দ্ধে গগনমণ্ডলে বাস করে; কিন্তু যখন গগনে চন্দ্রমার প্রকাশ হয়, তখন বহু নিম্নে জলে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। তাই বাবা বলিতেছিলেন এই হেতু বাহ্য দূরত্ব কিছুই নয়। কারণ যে যাহার হৃদয়ে বাস করে,অর্থাৎ যে যাহাকে ভালবাসে,সে তাহার অতি নিকট।

(৩) বিনা ভাগ্‌সে জগ সুখ কাঁহা মোক্ষ নয় হোয়।
ভোগ মোক্ষ যো নর চাহে পুণ্য কামাবে সোয়॥

অর্থাৎ ভাগ্য ব্যতীত কেহ জগতে সুখভোগে সমর্থ হয় না, সুতরাং মোক্ষ ত দূরের কথা। যে ব্যক্তি ইহলোকের সুখভোগ বা মোক্ষ কামনা করে, সে ব্যক্তির পুণ্য কর্ম্ম করা প্রয়োজন, কারণ পুণ্য ব্যতীত কদাচ সুখলাভ হয় না।

(৪) চা গেয়ি, চিন্তা গেয়ি, মন্‌মে নেহি প্রবাহ।
যিস্ মন্‌মে সন্তোষ হ্যায় ওহি শাহনশাহ॥

'চা' অর্থাৎ ইচ্ছা। যাহার মন হইতে ইচ্ছা লোপ পাইয়াছে, তাহার মনে কোনরূপ চিন্তাও নাই। যাহার মনে চিন্তার প্রবাহ বহে না, সেই সন্তোষ লাভ করে। যাহার মনে সন্তোষ বিরাজ করে, সেই শাহনশাহ (অর্থাৎ বাদসাহ) তুল্য।

(৫) ফিকির সব কো খা লিয়া ফিকির জগৎকা পীর।
যো ফিকির কো ফাঁকা করে উস্‌কো নাম ফকীর॥

অর্থাৎ চিন্তা মানুষকে নষ্ট করে, চিন্তাই সকলের গুরুস্বরূপ। যে ব্যক্তি এই অনর্থকারী চিন্তাকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ফকির বা সাধু।

(৬) জীব ঈশকো ভেক্ ধর সবসে বর্ত্তে আপ্।
ম্যায় এক দুস্‌রা ঈশতু এহি দ্বৈত সন্তাপ॥

অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ নয়। কারণ এক পরমাত্মাই সর্ব্বপ্রপঞ্চে অখণ্ড ব্যাপক রহিয়াছেন। আমি এক এবং ঈশ্বর স্বতন্ত্র এই যে দ্বৈতভাব, ইহাই সন্তাপের কারণ।

(৭) "আত্ম ব্রহ্ম স্বরূপ হ্যায়, নেহি ভেদকা গন্ধ।
রাগ দ্বেষ মতিকা ধরম তাঁমে মানৎ অন্ধ॥"

অর্থাৎ আত্মা ব্রহ্মেরই স্বরূপ। উহাতে ভেদের গন্ধ মাত্র নাই। অনুরাগ বা দ্বেষ হইল মনের ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐ সকল দোষ গুণগুলি আত্মার ধর্ম্ম মনে করে, সে ব্যক্তি অন্ধ বা অজ্ঞানী।

(৮) রাম মায়া সদ্‌গুরু দয়া সাধুসঙ্গ যব হোয়।
তব্ প্রাণী জানে কুছ, রহে বিষয় রস ভোয়॥

অর্থাৎ রামের কৃপা, সদ্‌গুরুর কৃপা ও জীবের সাধুসঙ্গ যখন ঘটে, তখন তাহার ফলে জীব বুঝিতে সমর্থ হয় যে—'আমি কি বা আমার কর্ত্তব্য কি।' নতুবা সে বিষয়-রসে মগ্ন হইয়া দিন বৃথা নষ্ট করে।

(৯) আত্মা পরমাত্মা জুদা রহে বহুকাল।
সুন্দর মিলা কর দিয়া সদ্‌গুরু মিলে দালাল॥

অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মা বহুকাল অবধি পৃথক্ রহে,—যতদিন সদ্‌গুরু-রূপ দালাল উভয়কে মিলন করাইয়া না দেন। অর্থাৎ সৎগুরুর কৃপাতেই জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে সমর্থ হয়।

(১০) শান্তিতুল্যং তপোনাস্তি ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্।
ন তৃষ্ণায়াঃ পরোর্ব্যাধি ন চ ধর্ম্মো দয়াসমঃ॥

অর্থাৎ শান্তির তুল্য তপ নাই, সন্তোষের অপেক্ষা সুখ নাই, তৃষ্ণার অপেক্ষা ব্যাধি নাই এবং দয়ার সমান ধর্ম্ম নাই।

(১১) যদ্যপি অবলম্বন বিনা মন মূষা মুরছায়।
বিষয়াবলম্বন বিপরীত ফল, স্বরূপাবলম্বন সুখদায়॥

অর্থাৎ কোন অবলম্বন ব্যতীত মন রহিতে পারে না; স্বভাবতঃই মনরূপ মূষিক নুয়াইয়া পড়ে। মনকে যদি বিষয় অবলম্বন দেওয়া যায়,

তবে বিপরীত ফল হয়, কারণ উহাতে মন নিম্নগামী হয়। স্বরূপ বা নিজ আত্মরূপ অবলম্বন মনকে দিয়া রাখিলেই মনের মলিনতা দূর হয় ও ত'ার ফল সুখদায়ক হয়।

(১২) যো পরকাশে সর্ব্বকুঁ, তাকো লখেন কৈ।
দীপক ঘটেহি প্রকাশে, ঘটে দীপ নেই যৈ॥

অর্থাৎ যিনি সমস্ত প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাকে কেহ লক্ষ্য করে না। দীপক যেমন ঘট্‌কে প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু ঘট দীপককে প্রকাশ করিতে অপারগ। যেমন ব্রহ্মচৈতন্য ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রামদ্বারা ব্রহ্মচৈতন্য প্রকাশিত হয় না।

(১৩) চা চুরি, চা চামারি, চা নীচন্‌কি নীচ।
চা না হতি বিচ্‌মে তো সাক্ষাৎ থে ঈশ॥

অর্থাৎ ইচ্ছা বা বাসনা মেথরাণী ও চণ্ডালিনীর ন্যায় অতিশয় নীচ। যাহার অন্তর হইতে ইচ্ছা ত্যাগ হইয়া গিয়াছে, সে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ।

(১৪) কর্ত্তা ভোক্তা দেঁহ এই জীবকা স্বরূপ।
যব কর্ত্তা আপে নেহি তব শিবস্বরূপ॥

অর্থাৎ আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, এই দেহ আমার—এই জীব ভাব। যখন এই ভাব বা এই বুদ্ধি সম্পূর্ণ ত্যাগ হইয়া যায় তখন সে শিবস্বরূপ।

(১৫) এ জগৎ হরিকারূপ হ্যায়, হরিরূপ নজরি আয়ে।
যো দ্বিতীয়াকো মনমে ধরে, ভয় তাঁকু বেদ ফুকারে॥

অর্থাৎ এ জগতের যাবতীয় পদার্থ শ্রীভগবানের রূপ। যিনি হরি ছাড়া নিজের অস্তিত্বকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করেন—দ্বৈতভাব যিনি মনে পোষণ করেন, বেদ বলিতেছেন তাঁহারই ভয়।

(১৬) অন্তর্ম্মুখ বৃত্তিবিনা হয়না অন্তর্স্মুখ।
বাহ্যবৃত্তিসে যাতনো নেহি অন্তর মনকা ছুখ॥

অর্থাৎ অন্তর্ম্মুখ বৃত্তি না হইলে (আত্মার) অন্তরস্থ সুখের অনুভূতি হয় না। বাহ্যবৃত্তির চর্চ্চার ফলে (অর্থাৎ বিষয় ভোগাদি দ্বারা) পরিণামে জীবের দুঃখই উৎপন্ন হয়, অন্তরের দুঃখ দূর হয় না।

(১৭) ফল কারণ ফুলি বন্ রয়, ফল আয়োত ফুল বিলয়।
জ্ঞান কারণ কর্ম্ম অভ্যাস, জ্ঞান আয়ো ত কর্ম্ম নাশ॥

অর্থাৎ বৃক্ষে যে ফুল হয় তাহা ফলের জন্যই হয়। যখন বৃক্ষে ফল জন্মে, তখন ফুলটী নষ্ট হইয়া যায়। সেইরূপ জ্ঞানলাভের জন্যই কর্ম্ম ও উপাসনা অভ্যাস। হৃদয়ে যখন জ্ঞানরূপ ফল বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আর কর্ম্মের প্রয়োজন না থাকায় নিজ হইতেই কর্ম্মত্যাগ হইয়া যায়।

(১৮) এতো গতি হয় অট্পটি ঝট্পট্ লখে ন কোয়।
যো মনকে খট্পট্ মিঠে তো ঝট্পট্ দর্শন হোয়॥

অর্থাৎ জীবের মনের গতি সহজে পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হয় না। তাহার প্রধান কারণ মন নানারূপ বাসনায় সতত চঞ্চল রহিয়াছে। ইহারই নাম 'অট্পটি।' যখন মনের সর্ব্ববিধ আসক্তি বাসনা প্রভৃতি দূর হইয়া যাইবে, অর্থাৎ চিত্ত সম্পূর্ণভাবে বাসনাশূন্য নিস্তরঙ্গ হইবে, তখন উহা শুদ্ধ পবিত্র হইয়া যাওয়ায় 'ঝট্পট্' ভগবৎ-দর্শন-লাভ হইবে।

(১৯) সতত ব্রহ্ম অভ্যাস্‌সে মল বিক্ষেপ কো নাশ।
জ্ঞানদৃঢ় নির্ব্বাসনা জীবন্মুক্তি প্রতিভাস॥

অর্থাৎ নিয়ত ব্রহ্ম ধ্যান দ্বারা মনের মল বিক্ষেপাদি নষ্ট হয়। চিত্তে পরাজ্ঞানের উদয় হয়। সতত ব্রহ্মধ্যান হইতে মনের মলিন বাসনার নাশ হওয়ায় মন সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইয়া যায়। তখন ক্রমে ক্রমে এই জীবনেই জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ হয়।

(২০) কো কহে সুখ সংসারমে কো কহে দুখ দরিয়া।
মৃগতৃষ্ণাকে নীরমে নেহি কটু মধুর সুয়াদ (স্বাদ)॥

অর্থাৎ কেহ বলে, এই সংসারে অনেক প্রকার সুখ, আবার কেহ বলে যে সংসার দুঃখের সমুদ্রতুল্য। মরুভূমিতে মৃগগণ বালির উপর রৌদ্র পতিত হওয়ায় জল আছে মনে করিয়া ঐস্থানে দৌড়াইয়া যায়; বাস্তবিক তাহা যেমন তাহাদের ভ্রম মাত্র, সেইরূপ এ জগতে সুখ কিংবা দুঃখ বলিয়া কোন বস্তুই নাই—উহা মনের ভ্রম মাত্র।

(২১) ভোগ্ আশ্ মরুভূমিবৎ তৃপ্তি কেন্নুহুঁ না পায়।
শান্তি সুখ গমায়কে ভবমে ফিরে ভমায়॥

অর্থাৎ ভোগের আশা মরুভূমি তুল্য। ভোগের দ্বারা জীব কখনও তৃপ্তি পায় না। কেবল যে পথে প্রকৃত শান্তি সুখ, তাহা পরিত্যাগ করত পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ জনম মরণরূপ গমনাগমন করিয়া থাকে।

(২২) কাঁহা ঈশতা জীবতা পূরণ্ চিদঘন্ ভান্।
ছোটি মোটি লহর জল সন্তত বন্‌তে আন্॥

অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন নয়। সবই পূর্ণব্রহ্ম। যেমন নদীর জলতরঙ্গ নদী হইতে ভিন্ন নয়। তরঙ্গ হইতেছে জীব, আর নদী ঈশ্বর।

(২৩) মনপক্ষী তব্ লগ্ উড়ে বিষয় বাসনামায়।
জ্ঞান বাজ্ কি ঝাপট্‌মে জব্ লগ্ আওত নায়॥

অর্থাৎ মনরূপী পক্ষী বিষয় বাসনারূপী বনে ততক্ষণ পর্য্যন্ত উড়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানরূপী বাজপক্ষী তাহাকে আক্রমণ না করে। (পূর্ণ-জ্ঞান লাভ হইলেই বাসনার ক্ষয় হইয়া যায়)।

(২৪) ব্রহ্মজ্ঞানী সদা নির্লেপ।
যৈ সে জল্‌মে কমল অলেপ্॥

অর্থাৎ সলিলমধ্যে স্থিত পদ্ম যেমন সলিল স্পর্শ করে না, তেমনি যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ, তিনি সংসারের মধ্যে বাস করিয়াও উহাতে লিপ্ত না হইয়া নির্লেপ অবস্থায় থাকেন।

(২৫) নেহি জ্ঞান্‌কা গাঁঠরী নেহি চাতুরকো চোয।
মন্‌কি কল্পনা মেট্‌নি এহি অনুভবকা ওজ॥

অর্থাৎ জ্ঞানের কোন মোট অর্থাৎ পোট্‌লা নাই। আবার বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যেরূপ অভিনয় করিয়া দেখায় উহা সেরূপ অভিনয় করিয়া দেখাইবারও বস্তু নয়। যখন মন হইতে সর্ব্বপ্রকার কল্পনা বিদূরিত হইয়া যাইবে তখনই জ্ঞানের উপলব্ধি হইবে।

বাবা একদিন ভক্ত কবীরের একটী দোঁহা আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন ভক্ত কবীর যেখানে তাঁর ক্ষুদ্র কুটীরে

বাস করিতেন তাহার অদূরে কসাইখানা ছিল। তথায় প্রত্যহ অনেক প্রাণী বিনষ্ট হইত। ইহাতে তিনি অন্তরে ব্যথা পাইতেন। একদিন কবীর মনকে এইভাবে বুঝাইলেন—

(২৬) কবীরা তেরা ঝোপ্‌রা গল্‌কাটেওকে পাশ।
যো করেগা সো ভরেগা তুঁ কেঁউ ভয় উদাস॥

অর্থাৎ যে যেমন কর্ম্ম করিবে সে সেই প্রকার ফলভোগ করিবে হে মন, তুমি কেন উহার নিমিত্ত বৃথা দুঃখভোগ কর।

সৎসঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করত কথা প্রসঙ্গে একদা বাবা বলিলেন—

(২৭) "সৎসঙ্গতসে পাইয়ে পরমব্রহ্ম সুখধাম।
মহিমা শেষ না কহে সকে, কাঁহা কহে মূখ-শ্যাম॥"

অর্থাৎ এক সৎসঙ্গ হইতে সুখস্বরূপ পরব্রহ্ম পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ যে সাধুসঙ্গ বা সৎসঙ্গের মহিমা, উহা শেষ নাগ সহস্র মুখে গাহিয়া শেষ করিতে পারে না। মূর্খ শ্যাম কবি কিরূপে ঐ মহিমা বলিতে সমর্থ হইবে।

(২৮) যাঁকো রাখে সাঁঈয়া মার্‌না সকে কৈ।
বাল্ না বাঁকা কর্ সকে যো জগ বৈরী হৈ॥

অর্থাৎ যাহাকে শ্রীভগবান রক্ষা করেন, জগতের লোক শত্রু হইলেও তাহার চুল পর্য্যন্ত বাঁকা করিতে পারে না।

(২৯) রাজা, যোগী, আগুন, জল উল্‌টি ইন্‌কি রীত।
ডর্‌তে রহিয়ে পরশুরাম থোরি পালিয়ে প্রীত॥

অর্থাৎ রাজা, যোগী, আগুন এবং জল ইহারা কখনো কাহারও বশীভূত হয় না। সুতরাং ইহাদের সহিত অধিক প্রীতি ভাল নয়। কারণ ইহারা আবার অল্প কারণেই বিগ্‌ড়াইয়া যায়।

বাবা একদা সাধু পণ্ডিত শ্যাম নামক কবির এই দোঁহাগুলি শুনাইয়াছিলেন।

(৩০) "মিল চাহে পরব্রহ্মসে রহে সন্তসে দূর।
শ্যাম নয়ন নিমিলকে দেখো চাহেত সূর॥"

অর্থাৎ যে পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষা করে সে যদি সাধু সন্ত হইতে দূরে থাকে তবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সূর্য্যদর্শনের প্রয়াস করিবার মত হয়।

(৩১) "শ্যাম সমাহিত সন্ত কো, এক বচন অমূল্।
শুনে শাস্ত্র শত বর্ষ লো, তুলে না তাঁকো তুল॥"

শ্যাম কবি বলিতেছেন—সমাহিত অর্থাৎ যাঁহার বৃত্তি একাগ্র, সেই অনুভবি সাধুর একটী উপদেশই অতি অমূল্য। যদি শত বর্ষ উপদেশ শ্রবণ করা যায়, তবুও ঐ উপদেশের তুল্য হয় না।

(৩২) "শ্যাম সো আত্মারাম ভব এ তাবৎ উপদেশ।
যা বিন্ কোটি উপদেশ কর্ মিটেনা কর্ম্মক্লেশ॥"

শ্যাম কবি বলেন—তুমি আত্মারাম হইয়া যাও, ইহাই আমার সমস্ত উপদেশ। ইহা ব্যতীত তুমি কোটি উপায় সাধন কর, তাহাতে কর্ম্মক্লেশ যাইবার নয়।

(৩৩) "শ্যাম সদা সম ভাব ভজ্র, যা সম ভজন না আন্।"
বিখন ভাব বিপরীত ফল, ভাখে নিগম পুরাণ ॥"

অর্থাৎ শ্যাম কবি বলিতেছেন—জগতের সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি বা আত্মদৃষ্টি কর। ইহা অপেক্ষা আর বড় বা শ্রেষ্ঠ ভজন নাই। 'বিখন' অর্থাৎ ভেদ ভাবে বিপরীত ফল, এই কথা বেদ ও পুরাণও বলিতেছে।

বাবা বলিতেছিলেন—

(৩৪) "বাহা বাহা নে ঘর গলে,
হুসিয়ার হো দেখ্ বলি।
কিন্ কিন্ খারাপি না করি,
যো আয় এস্ গলি ॥"

অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রশংসার দ্বারা অনেক ঘর নষ্ট হইয়া যায়। হে মনরূপী বলি, তুমি সতত সতর্ক থাক। কারণ যে ব্যক্তি বাহবা পাইবার রাস্তায় চলে, সে অনেক সময়ই সমাধা হইয়া যায়। হয় ত গৃহে সঞ্চিত অর্থ নাই, কিন্তু সে প্রশংসার লোভে পড়িয়া ঋণ পূর্ব্বকও ব্যয় করে। প্রশংসায় মাথা গরম হইয়া, অনেকে অন্যায় কাজ করে।

বাবা বলিতেছিলেন—মান প্রতিষ্ঠাও এক প্রকার খোরাক। এই খোরাক অনেকেই আকাঙ্ক্ষা করে। অবহেলা জীব মাত্রেই সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু খ্যাতির বাসনা ও প্রতিষ্ঠা সাধক মাত্রেরই ত্যাগ করা উচিত।

বাবা ভক্ত তুলসী দাসের এই দোঁহাটী শুনাইলেন—

(৩৫) "পহেলি বনে প্রারব্ধ পিছে বনে শরীর।
তুলসী ইয়ে আশ্চর্য্য হায় মন নেহি বাঁধে ধীর ॥"

অর্থাৎ প্রথমে প্রারব্ধ তৈয়ারি হইলে পরে শরীর ধারণ হয়। তুলসী দাস বলিতেছেন, ইহা খুবই বিস্ময়ের বিষয় যে লোক অকারণ অধৈর্য্য হয়। খাইতে পরিতে পাইব কিনা এ চিন্তা করা ভুল। কারণ যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়া আছে।

(৩৬) নারায়ণ ইয়ে জগৎমে দুঃখি রহে হরিসন্ত।
অন্তে লভেঙ্গে পরমপদ পায়ঙ্গে ভগবন্ত॥

অর্থাৎ নারায়ণ মুনি বলিতেছেন, এই জগতে হরিভক্তগণ অনেক সময় দরিদ্র হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা পরমপদ বা উর্দ্ধ গতি লাভ করে। হরিভক্তগণই হরিকে প্রাপ্ত হয়েন।

কৈলাসপতি

পঞ্চম খণ্ড

১৩৩৭—৩৮

ভ্রমণ—উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে

কৈলাসপতি

প্রথম তরঙ্গ

ভক্তেরা চায় বাবাকে তাহাদের গৃহে; কিন্তু পায় না। অবশেষে বাবা তাঁহাদের প্রার্থনায় বঙ্গদেশে যাইতে সম্মত হইলেন। ১৩৩৭ সালের শেষভাগে ফাল্গুনের প্রথমে বাবা কৈলাস পরিত্যাগ করত যাত্রা করিলেন।

কলিকাতা বাবা পছন্দ করেন না। বলেন, কলিকাতা বহু প্রবৃত্তির স্থান। অতএব কলিকাতার সন্নিকটে লিলুয়াতে বাবার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বাবার ভক্ত স্যার হুকুমচাঁদ স্বরূপচাঁদ মাড়োয়ারির প্রাসাদোপম গৃহে বাবা আসিয়া উঠিলেন।

বাবা আসিতে না আসিতে কলিকাতা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ভক্তবৃন্দ ছুটিয়া আসিলেন। সেখানেও বাবার অবসর নাই, অবিরাম জনস্রোতঃ। বাবা কয়েক দিন মাত্র তথায় অবস্থান করিয়া ত্রিপুরায় গমন করিলেন। ত্রিপুরা রাজ-পরিবারের সহিত বাবার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, পূর্ব্ব বৎসর কুম্ভমেলার সময় ঝুসির চরে—বাবার ছাউনীতে। তার কিছুকাল পরে বাবাকে দর্শন করিতে কৈলাসে আসিয়াছিলেন রাজ-পরিবারের অনেকেই। কয়েক দিন যশিডিতে থাকিয়া বাবাকে ত্রিপুরায় যাইবার জন্য তাঁহারা বিশেষরূপে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পরে মহারাজ, বাবাকে পত্র লিখিয়া তাঁহার যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে সুসজ্জিত কক্ষনিচয় বাবার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বাবা সে সমস্ত ত্যাগ করিয়া চা বাগানের মধ্যে এক ক্ষুদ্র বাংলায় আশ্রয় লইয়াছিলেন।

ত্রিপুরা হইতে ফিরিয়া বাবা সুসঙ্গ গিয়াছিলেন। সুসঙ্গ মৈমনসিং জেলার অন্তর্গত। অতি প্রাচীন রাজ্য—গারো পাহাড় এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; এক্ষণে এই সব পাহাড় ও জঙ্গল বৃটিশ অধিকারে। রাজ্যেশ্বর পাইয়াছেন বংশানুক্রমে মহারাজ উপাধি—যে উপাধি একদিন মহারাজ মানসিংহকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই মহারাজের ভ্রাতা সস্ত্রীক সাধুবাবার মন্ত্রশিষ্য। বাবা তাঁহাদের আহ্বানে সুসঙ্গে পদার্পণ করিলেন। তিনি রাজবাটীতে থাকিতে চাহিলেন না,—কিছু দূরে আম্রকাননের পার্শ্বে, উন্মুক্ত প্রান্তরে তাম্বু খাটাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে একমাত্র সহচর শ্রীহুজুরানন্দ অবধূত ছিলেন। ইনি বাবার প্রেমে বদ্ধ। অনেক সময়ই ইনি বাবার নিকট কৈলাসে থাকেন ও কখন কখন একত্র দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন। কৈলাস হইতে তিনি তৃতীয় ব্যক্তি লইয়া যাত্রা করেন নাই।

বাবা এই উন্মুক্ত স্থানে অতি অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য মধ্যে থাকিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। দূরে শৈলমালা, নিকটে স্রোতস্বতী, চরণতলে সেবারতা ভক্তিমতী সপুত্রা রাণী সুরমা দেবী।

বাবা প্রায় এক পক্ষ কালের বেশী কোথাও অবস্থান করেন না। সুসঙ্গে তিনি এক পক্ষ কাল থাকিয়া রাজসাহী অভিমুখে রওনা হইলেন। বাবার সংবাদ, পত্রে ও তারে আদান প্রদান হইত। আমাদের আকুল প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া বাবা যে আমাদের গৃহে রাজসাহীতে আসিতেছেন, ইহা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল।

বাবা আসিলেন, ৪ঠা বৈশাখ প্রাতে। পদ্মা নদীতে স্নান করিয়া আসিয়া বাবা বেলা ১২টার পূর্ব্বে আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। শ্রীহুজুরানন্দজী বেলা ১২টার পর আহারাদি করেন না। বৈকালে বাবা আমাদের নিকট ত্রিপুরা ও সুসঙ্গের অনেক গল্প করিলেন। সুসঙ্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য ত্রিপুরার চেয়েও নাকি অনেক ভাল। স্থানটিও বেশ ঠাণ্ডা; নদীতে প্রচুর মৎস্য, ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য, জঙ্গলে বহু হরিণ।

অপরাহ্নে বাবাকে লইয়া আমরা পদ্মার ধারে বেড়াইতে গেলাম। নিকটে এক বৃদ্ধা একাকী এক কুটীরে বাস করিতেন। মধ্যে মধ্যে আমরা তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। আজও বাবাকে লইয়া তথায় গেলাম। বাবাকে দেখিয়া বৃদ্ধার মহানন্দ; কহিলেন, "আজ পরমহংস বাবা এসেছেন।" বাবা কহিলেন, "সীতারাম কহো।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "শ্রীরাম বলতে পারি, কিন্তু সীতা বল্‌ব কেন? সীতায় ও আমাতে প্রভেদ কি?"

বাবা হাসিলেন। বৃদ্ধা আমাদের সকলের হস্তে এমনকি বাবাকে দুইখানি করিয়া বাতাসা দিলেন। বাবা তাহা গ্রহণ করিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পর যখন আমরা বাবার চরণতলে সভা করিয়া বসিয়াছি, তখন বাবা আমাদিগকে অনেক অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন। বাবা বলিয়াছিলেন,—তপস্যা হইতেছে মনের ব্যাপার। মন ও প্রবৃত্তির গতি রোধ করিবার নামই তপস্যা। তপস্যার অর্থ দমন। মনের অশুভ সঙ্কল্প, প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়াদি দমন পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির জন্য যে প্রযত্ন, তাহাকেই বলে তপস্যা। ইহার জন্য মনের প্রতি সদাসর্ব্বদা সতর্ক প্রহরা রাখা প্রয়োজন। যদি কোন অশুদ্ধ ভাব মনে উদয় হয়, তবে তৎক্ষণাৎ উহা তাড়ান বিধেয়। মনের স্বভাবই এই যে, সে একসঙ্গে দুইটী বিষয় লইয়া থাকিতে পারে না। এই জন্য মনকে

সৎসঙ্গে নিযুক্ত করিতে পারিলে আপনা হইতেই মনের কুভাব চলিয়া যায়।

মনকে দমন করিবার দুইটী উপায় বাবা নির্দ্দেশ করিলেন,—এক 'হটসে', দোস্‌রা 'প্রেমসে', অর্থাৎ মনকে বুঝাইয়া। এই দ্বিতীয় উপায় দ্বারাই ফল ভাল হয়; কারণ বিচারপূর্ব্বক যাহা করা যায় তাহারই ফল স্থায়ী হয়। খেয়ালের মাথায় একটী কার্য্য করিলে উহার ফল স্থায়ী হয় না।

বাবা বলেন, "কার্য্যকে আগ্‌ বিচার ভালি।" মনে কোন সংকল্প বা প্রেরণার উদয় হইলে তাহার পরিণাম-ফল কি হইবে তাহা পূর্ব্বে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বিচারে যদি দোষ দেখা যায়, তাহা হইলে গোড়াতেই উহা ত্যাগ করা উচিত। নতুবা পরে উহা হটান আরও কঠিন হয়।

বাবা ইহা পুনঃ পুনঃ আমাদের বলিয়াছেন, প্রবৃত্তি বা তৃষ্ণার ফল দুঃখ, নিবৃত্তি ও সন্তোষের ফল শান্তি। নিবৃত্তি হইতে সন্তোষ, আর সন্তোষ হইতে শান্তি। বৈরাগ্য হইতেই নিবৃত্তি; বাসনার উচ্ছেদ না ঘটিলে সন্তোষ সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি সন্তোষরূপ সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া যায়, সেই ব্যক্তিই পূর্ণ সুখলাভে সমর্থ হয়। যে সাধু কোন বস্তু গাঁটরি করিয়া বাঁধিয়া রাখে না, ভগবান্ যখন যাহা দেন, তাহাই সন্তোষের সহিত আহার করে, সেই সাধুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভগবান্ ফিরেন। সে সাধুকে ক্ষুধায় কখন কষ্ট ভোগ করিতে হয় না, তাহার কোন অভাব থাকে না। বাবা বলেন—

গিটে গাট নেই বাঁন্ধতে যব মিলে তব খায়।
গোবিন্দ তাঁকু পিছে ফিরে মৎ ভুকে রহে যায়॥

একদিন অপরাহ্নে বাবাকে দর্শন করিতে তথাকার 'ষ্টুডেণ্টস্ হোম' হইতে কয়েকটী ছাত্র আসিয়াছিলেন। বাবা তাঁহাদিগকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। বাবা বলিয়াছিলেন, মানুষের ও জন্তুদের মধ্যে প্রভেদ কি? মানুষ আহার করে, সন্তানকে পালন করে; জন্তুরাও তাই করে। উভয়ের বৃত্তি একই। প্রভেদ এই, মানুষ পরমাত্মার চিন্তা করিতে পারে, তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারে। জন্তুরা তাহা পারে না। যখন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ফলে এবার মনুষ্যযোনিতে জন্ম লইয়াছ, তখন মনুষ্য-জীবনের যাহা সুবর্ণ সুযোগ, তাহা ত্যাগ করা উচিত নয়। মনুষ্যমাত্রেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত, মোক্ষলাভ। মোক্ষলাভ সম্বন্ধে মহর্ষি অষ্টাবক্র রাজর্ষি জনককে বলিয়াছিলেন,—

মুক্তিমিচ্ছসি চেৎ তাত বিষয়ান বিষবৎ ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবৎ ভজ॥

অর্থাৎ হে তাত, যদি মুক্তিলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে বিষয়কে বিষবৎ ত্যাগ কর; ক্ষমা, আর্জ্জব, দয়া, সন্তোষ, সত্যকে অমৃতবৎ ভজনা কর।

সত্যের যে কত বড় শক্তি তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটী গল্প বলিলেন,—

এক তস্করের ইচ্ছা হইল, সে এক মহাত্মার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে। মহাত্মার চরণে প্রণাম করিয়া সে তাঁহার বাসনা জানাইল এবং তাহার চরিত্রে যত দোষ আছে তাহাও নিবেদন করিল। মহাত্মা তাহার সারল্যে তুষ্ট হইয়া তাহাকে দীক্ষা দিয়া অনুজ্ঞা করিলেন, তুমি আজ হইতে মিথ্যাবাক্য বলিবে না। তস্কর প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় লইল।

একদা ঐ তস্কর রাজার আস্তাবল হইতে তাঁহার প্রিয় ঘোড়াটি চুরি করিল। যখন সে ঘোটকপৃষ্ঠে উঠিয়া পলায়ন করিতেছিল, তখন তাহাকে এক প্রহরী ধরিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে ?" তস্কর উত্তর করিল, "আমি চোর।" প্রহরী ভাবিল, যে চোর সে কখন নিজেকে চোর বলিয়া পরিচয় দেয় না—এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই রাজার কোন অতিথি বা বন্ধু হইবে। তামাসা করিয়া এইরূপ বলিতেছে।

প্রহরী পথ ছাড়িয়া দিল; তস্কর অশ্ব ছুটাইয়া পলায়ন করিল। পথিমধ্যে তাহার গুরুর আশ্রম। আশ্রমের বাহিরে ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে ভিতরে গেল। ইত্যবসরে রাজ-আস্তাবলে চুরির ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং চোরকে ধরিতে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। অশ্বপদ চিহ্ন ধরিয়া এক দল প্রহরী, মহাত্মার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, বাহিরে একটী অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে। কিন্তু রাজার ঘোড়ার বর্ণ কালো, আর সম্মুখে যে ঘোড়া, তাহার বর্ণ সাদা।

এ দিকে তস্কর গুরুপ্রণাম করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, কয়েক জন প্রহরী অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া শুভ্রকায় অশ্বটীকে লক্ষ্য করিতেছে। অশ্বের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তস্করও বিস্মিত হইল। সে হাসিয়া প্রহরীদের কহিল, "কি দেখিতেছ ?"

জনৈক প্রহরী উত্তর করিল, "রাজার প্রিয় ঘোড়াটি চুরি হইয়াছে, এই ঘোড়াটি সেইটাই কিনা তাই দেখিতেছিলাম। তুমি কিছু জান ?"

তস্কর উত্তর করিল, "এইটাই রাজার ঘোড়া, আমি চুরি করেছি।"

প্রহরীরা ইহা তামাসা মনে করিয়া প্রস্থান করিল এবং রাজার নিকট গিয়া যথাযথ নিবেদন করিল।

কিছু দিন পরে নগরপাল কোন চৌর্য্য অপরাধে তস্করকে সন্দেহ করিয়া রাজার নিকট ধরিয়া আনিল। তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ ছিল না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চুরি করিয়াছ ?"

তস্কর স্বীকার করিল।

রাজা,—"কিরূপে চুরি করিলে ?"

তস্কর অকপটে তাহা বলিল। রাজা তাহার সত্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হইলেন। তাহাকে রাজসরকারে একটী চাকরি দিয়া ঘৃণ্য চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। তস্কর চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ করিল এবং ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি-প্রভাবে উন্নতি করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার স্বভাবের সকল দোষ বিদূরিত হইল। একমাত্র সত্যনিষ্ঠার প্রভাবে সে মন্ত্রিপদ লাভ করিল। এবং মহাত্মার উপযুক্ত শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

গল্প বলিয়া বাবা পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কিছু কাল ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় বাবা যখন গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, তখন চারিদিক্ হইতে আমরা ছুটিলাম বাবার পদধৌত করিয়া দিতে। সকলের কি আগ্রহ! কেহ জল ঢালিতেছে, কেহ পা রগড়াইতেছে, কেহ মুছিয়া দিতেছে। ছয়জনে দু'খানি চরণ লইয়া পড়িল। তার পর কেহ বাতাস করিতেছে, আর যে কিছুই করিবার পাইতেছে না, সে বাবার লাঠিটি ধুইয়া মুছিতে লাগিল। বাবা কাহাকেও বাধা দিয়া মনঃক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা করেন না। যতক্ষণ সেবা চলিতেছিল, ততক্ষণ তিনি ধীরভাবে মৃদুস্বরে বলিয়া যাইতেছিলেন, শিবোঽহম্, শুদ্ধোঽহম্, নিরঞ্জনোঽহম্, নির্ব্বিকারোঽহম্, সচ্চিদানন্দস্বরূপোঽহম্। বাবা তখন চিন্তা করিতেছিলেন কি, তাহা ভক্ত পাঠক অনুমান করিতে পারেন।

অতঃপর আমরা যখন সকলে বাবার চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট থাকিয়া

তাঁহার উপদেশ শুনিতেছিলাম, তখন কোন ক্রোধীব্যক্তির কথা উঠিয়াছিল। তদুপলক্ষে বাবা একটি গল্প বলিলেন,—

এক ধর্ম্মশীল অতিথিপরায়ণ ব্যক্তির অতি কোপনস্বভাবা স্ত্রী ছিল। স্বামী তন্নিমিত্ত অতিশয় দুঃখিত ছিলেন বটে, কিন্তু কোনপ্রকারেই স্ত্রীর স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যদিও তিনি নিজের ইচ্ছানুরূপ অতিথিসেবা করিতে পারিতেন না, তথাপি তিনি সেবাকার্য্যে বিরত ছিলেন না।

একদা এক প্রকৃত সাধু, গৃহীর গৃহে পদার্পণ করিলেন। গৃহস্বামী তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং স্ত্রীকে ভোজনের আয়োজন করিতে বলিলেন। গৃহস্বামীকে বিশেষ কার্য্যে তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরে যাইতে হইল। যাইবার পূর্ব্বে তিনি অতিথিকে স্ত্রীর স্বভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া গেলেন।

অতিথি সত্বরই বুঝিলেন, স্ত্রীর পরিচয় দিতে স্বামী কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেন নাই। আহার্য্য পাক করিতে আরম্ভ করিয়াই মায়ী গালাগালি সুরু করিলেন, গৃহের একপার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া সাধু সমস্ত শুনিয়া যাইতে লাগিলেন ; কিন্তু তিনি নির্ব্বাক্, নির্ব্বিকার। গালাগালির মাত্রা ক্রমেই চড়িতে লাগিল। পাক শেষ হইলে মায়ী রূঢ়স্বরে অবজ্ঞাভরে অতিথিকে ভোজন করিতে আহ্বান করিলেন। সাধু বিনাবাক্যব্যয়ে আহারে বসিলেন। তিনি যতক্ষণ আহার করিতে লাগিলেন, মায়ী ততক্ষণ অবিরাম গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সাধু মৌনী, কিছুমাত্র ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। তাঁহাকে নীরব নিরুত্তর দেখিয়া মায়ীর ক্রোধ আরও বাড়িয়া উঠিল ; অবশেষে তিনি ভয়ঙ্কর ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া চুলি হইতে জ্বলন্ত কাষ্ঠ আনিয়া ভোজনরত সাধুর শ্মশ্রুতে লাগাইয়া দিলেন। প্রশান্তবদন ক্রোধশূন্য

সাধু একটুও বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া বামহস্তে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তে আহার চালাইতে লাগিলেন। মায়ী পরাস্ত হইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সাধুর নিরভিমান স্বভাব ক্ষমা ও ধৈর্য্য-দর্শনে মায়ী চমৎকৃত হইলেন। তিনি মুগ্ধ ও অনুতপ্তচিত্তে সাধুর চরণের উপর পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। অবশেষে সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব স্বভাব ত্যাগ করিলেন।

বাবা বলিলেন, ক্রোধ জয় হয় ক্ষমা ও ধৈর্য্য দ্বারা, ক্রোধের সময় যদি কেহ বাদপ্রতিবাদ করে, তাহা হইলে ক্রোধ কেবল বাড়িয়াই চলে—ক্রোধের নিবৃত্তি হয় না। ধৈর্য্যের অনুশীলন হইতে ক্ষমা ভাব বৃদ্ধি পায়, আবার ক্ষমার অনুশীলন হইতে ধৈর্য্য বৃদ্ধি পায়।

ঘরের ভিতর বড় গরম, বাবা তাই বারান্দায় শয়ন করিলেন। আমরা বলিলাম, রাত্রিতে যদি কোন প্রয়োজন হয়—তাহা হইলে ভৃত্যকে ডাকিবেন। বাবা উত্তর করিলেন, আমার ত কোন প্রয়োজন নাই, মায়ী। বলিয়া তিনি তাঁহার জীবনের একটি ঘটনা বলিলেন।

এক সময়ে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন পুলিস কর্ম্মচারীর সহিত বাবার পরিচয় হয়। কর্ম্মচারী আকৃষ্ট হইয়া বাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাবার যেখানে সেখানে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান দেখিয়া তিনি একটী তাম্বু বাবার ব্যবহারার্থে প্রদান করেন। বাবা তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি জংলী লোক, কোথায় কখন থাকি তা'র ঠিক নেই, তোমার তাম্বু পাহারা দেবে কে? যদি কেউ চুরি করে নিয়ে যায়, তোমাকে তখন সরকারের নিকট জবাবদিহি করিতে হ'বে।" বাবার এই কথা সঙ্গত বুঝিয়া কর্ম্মচারী এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন তাম্বুটী পাহারা দিতে।

বাবা ত কাহাকেও তাঁহার শয়ন-কক্ষে লয়েন না—একাকীই রাত্রি-কালে শয়ন করেন। তাম্বুতে একটী মাত্র ঘর, সুতরাং ঐ ব্যক্তি বড়ই মুস্কিলে পড়িল। বাবাকে বলিল, সে একাকী এই জঙ্গলের মধ্যে শুইয়া থাকিতে পারিবে না—বাঘের ভয়, সাপের ভয়, ভূতের ভয় ইত্যাদি। বাবা তাহাকে অভয় দিয়া তাম্বুর ভিতর ডাকিলেন এবং নিজে তাম্বুর বাহিরে বৃক্ষতলে নির্ভয়ে রাত্রি যাপন করিলেন।

বাবার কথা শুনিয়া আমরা সকলে হাসিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, কয় রাত্রি বাবা এই ভাবে কাটাইয়াছিলেন ?

বাবা উত্তর করিলেন, দুই তিন রাত্রি এই ভাবে কাটাইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছিলাম। পুলিস কর্ম্মচারী কিছুই জানিতে পারেন নাই।

পরদিন প্রভাতে দেখিলাম, বাবা "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নামক নাটক-খানির কোন শ্লোকের অর্থ আমার স্বামীকে বুঝাইয়া দিতেছেন। সকল শ্লোক বা তাহাদের অর্থ আমার স্মরণ নাই। এক স্থানের অর্থ এইরূপ বলিতেছিলেন,—

ক্ষমা আসিয়া বিবেক মহারাজকে বলিতেছিলেন, 'হে দেব, শ্রবণ করুন ; নর যদি ক্রোধ করে তখন মৌনব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। যদি সে গালি দিতে আরম্ভ করে, তবে তা'র প্রতি কোমল বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহাতেও যদি ঐ ব্যক্তির ক্রোধ নিবৃত্ত না হইয়া সে ধিক্কার দিতে থাকে, তবে তাহার পায়ে ধরিয়া অনুনয় করিয়া বুঝাইতে হইবে এবং তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়া ভগবানের নিকট তাহার চণ্ডালরূপী ক্রোধ নিবৃত্ত হউক প্রার্থনা করিতে হইবে। আর ক্রোধী ব্যক্তি যদি মারিতে আরম্ভ করে, তথাপি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া ইহার দ্বারা আমার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম বা পাপ নষ্ট হইতেছে মনে করিতে

হইবে। আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের জন্যই অপরের নিকট হইতে পীড়ন বা লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকি। বুঝিতে হইবে মনুষ্য উপলক্ষ্য মাত্র।'

বাবা বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে গুহক চণ্ডালের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ; সেই সময় গুহক লক্ষ্মণকে কহিয়াছিলেন, "এস বন্ধু, তুমি ও আমি একত্র হইয়া ভরতকে সংহার করত শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্য প্রদান করি।"

তদুত্তরে লক্ষ্মণ গুহককে কহিয়াছিলেন,—

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহম্ করোমীতি বৃথাভিমানঃ
স্বকর্ম্মসূত্রে গ্রথিতা হি লোকাঃ॥

অর্থাৎ—সুখ দুঃখ কেহ কা'রে নাহি করে দান ;
পরদত্ত মনে করে—কুবুদ্ধি যে জন।
আমি করি—হেন চিন্তা বৃথা অভিমান,—
নিজ কর্ম্মসূত্রে জীব বদ্ধ অনুক্ষণ॥

তারপর বাবা বলিলেন, মলিন অহঙ্কার ত্যাগ করা চাই। অহঙ্কারের সঙ্গে মায়া আসে। অকর্ত্তা বুদ্ধিতে থাকিতে হইবে—অভিনেতা বা ম্যানেজারি বুদ্ধিতে সব কাজ করিয়া যাইবে। তাহা হইলে মলিন অহঙ্কার নষ্ট হইবে। বাবা বলেন, অহঙ্কার দুই প্রকার শুদ্ধ ও মলিন। শুদ্ধ অহঙ্কার—যথা আমি শুদ্ধ আত্মা—এরূপ ভাব দোষের নয়—বরং মুক্তির হেতু। আমি রাজা, আমি মানী, আমি বড় পণ্ডিত, আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আমার বহু ক্ষমতা বা বহু দাসদাসী রহিয়াছে, এই ভাব মলিন অহঙ্কার—ইহাই পরিত্যাজ্য। এইরূপ অহঙ্কার হইতে জীব সহজে পরিত্রাণ পায় না। বাবা নারদ ঋষির একটী উপাখ্যান বলিলেন।

একদা দেবর্ষি নারদ তাঁহার বীণাযন্ত্রসহ হরিনাম করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সহসা এক শোকাতুরা বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন ? বৃদ্ধা উত্তর করিল, আমি পুত্র হারাইয়াছি ; বলিয়া সে বিলাপ করিতে লাগিল। নারদ তাহার দুঃখে ব্যথিত না হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এ মায়ার কার্য্য। আমি মায়া-রহিত পুরুষ, মায়া আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আর এই মায়ী অজ্ঞানতা ও মায়াতে আবদ্ধ।" নারদের এই অহঙ্কারই তাঁহার পতন সূচিত করিল।

কিছুকাল পরে এক সময়ে নারদ কোন জলাশয়-কূলে তাঁহার বস্ত্রাদি ও বীণা রক্ষা করত স্নানার্থে জলে নামিলেন। ডুব দিয়া উঠিতেই তিনি স্ত্রী শরীর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি যে নারদ ছিলেন ইহাও তিনি বিস্মৃত হইলেন। অতঃপর তাঁহার বিবাহ হইল এবং তিনি ক্রমে ক্রমে একশত একটী সন্তানের জননী হইলেন। তখন ভগবান্ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার মানসে বৃদ্ধ সাধুর রূপে দর্শন দিয়া কহিলেন "মায়ি, আমি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি, নিজে নিজের কাজ করিতে পারি না। তোমার অনেকগুলি পুত্র আছে, একটি পুত্র যদি আমার সেবার জন্যে দেও, তবে আমার বিশেষ উপকার হয়।"

মায়ী ইহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আমি একটীও পুত্র তোমাকে দিতে পারিব না, পুত্র আমার প্রাণ। তুমি দূর হও।"

ইহার কিছুদিন পরে মায়ীর একটি পুত্র অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মায়ী শোকে অধীর হইলেন, তাঁহার একশত পুত্র আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইল, কিন্তু মায়ী কিছুতেই শান্তি লাভ করিলেন না—অবিরাম বিলাপ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনীরা আসিয়া অনেক প্রবোধ দিল, কিন্তু তাহা বৃথা হইল। অবশেষে তাঁহাকে ধরিয়া

স্নান করাইতে জলাশয়ে লইয়া গেল। স্নান করিয়া উঠিতেই নারদ তাঁহার পূর্ব্ব শরীর লাভ করিলেন ; সম্মুখে তাঁহার পরিত্যক্ত বস্ত্র ও বীণা দেখিতে পাইয়া তাহা তিনি গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব কথা সকলই তাঁহার স্মরণ হইল, তখন তিনি সবিশেষ লজ্জিত হইলেন। অতঃপর তিনি গোলোকপতিকে প্রণাম করিতে স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীহরি একটু হাসিলেন, নারদ তদ্দৃষ্টে লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "প্রভু, তোমার মায়া দূরতিক্রমণীয়।"

চিত্তশুদ্ধির উপায় বাবা বলিলেন,—

"উঠত বৈঠত শোয়ত নাম,
হাত্‌মে কাম মন্‌মে রাম,
ভক্ত জনাকে মন বিশ্রাম।"

উঠিতে, বসিতে, শুইতে—অনুক্ষণ নাম জপ করিবে। হাতে কাজ করিবে, কিন্তু মনে নিরন্তর ভগবানের নাম স্মরণ করিবে। তাহাতেই চিত্তশুদ্ধি হইবে। মন দিয়া নাম করা চাই ; মন একাগ্র হইলে ফল বেশী পাওয়া যায়। মন যত সূক্ষ্ম হইবে, সূক্ষ্ম বস্তুকে ততই উপলব্ধি করা যাইবে। মন স্থূল হয়—বিষয়স্পর্শে। যে বস্তুতে মন ও ইন্দ্রিয় যুক্ত হয়, সেই বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়। মন না দিলে জ্ঞানলাভ হয় না, রসও উপলব্ধি হয় না।

পরদিবস আমার স্বামী বাবাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "আর্জ্জব অর্থে ত সরলতা ?" বাবা উত্তর করিলেন, আর্জ্জব অর্থে বহিঃশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি। বহিঃশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন জল, মাটি, সাবান। সর্ব্বদা দেহ, বস্ত্র, শয্যা সুপরিষ্কৃত রাখা উচিত, উহাতে মনও পবিত্র থাকে। আর অন্তঃশুদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্ব প্রকার কুবৃত্তি ও কুসঙ্গ ত্যাগ করা

প্রয়োজন। মনের মলিনতা, কাপট্য ও মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করার নামই আর্জ্জব।

বুঝিলাম, অভিধানের মোটামুটি অর্থ এখানে চলিবে না।

কিছু পরে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাবাকে দর্শন করিতে আসিলেন; রায় বাহাদুর কুঞ্জমোহন মৈত্র কিছু উপদেশ শুনিতে চাওয়ায় বাবা বলিলেন, "মনুষ্য সাধারণতঃ চারি প্রকার,—পামর, বিষয়ী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। যাহারা বিষয়ী, তাহারা চায় পৃথিবীর ভোগ, জীবনান্তে স্বর্গভোগ। স্বর্গভোগ কামনায় তাহারা পৃথিবীতে অবস্থানকালে বহু পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। তাহারা চায় শুধু ভোগ সুখ—ইহলোকে ও পরলোকে, তবে সঙ্গত উপায়ে; মোক্ষ-প্রাপ্তির বাসনা তাহাদের প্রাণে জাগে না।

যাহারা পামর, তাহারা চায় শুধু ভোগ—ন্যায় অন্যায় যে কোন উপায়েই হউক ভোগ সুখ চাই। ভোগের লালসায় বহুবিধ পাপা-চরণে মত্ত থাকে। তাহারা চায় না ধর্ম্ম, চায় না মোক্ষ—চায় শুধু আত্মসুখ। বিষয়ী বা পামর সাধারণতঃ সাধুদ্বেষী। তবে বিষয়ী ধর্ম্মপথে থাকিতে ইচ্ছা করেন। মোক্ষপ্রাপ্তির বাসনা তাঁহাদের চিত্তে জাগে না। আর যিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু, তাহার অন্তরে ইহলোকের ভোগবাসনা অথবা স্বর্গলোকের ভোগেচ্ছা বড় একটা থাকে না। ভোগেচ্ছা প্রচ্ছন্নভাবে কাহারও অন্তরে থাকিতে পারে, কিন্তু স্বভাবতঃ তাঁহারা নিষ্কামধর্ম্মী, মোক্ষেচ্ছু ও মোক্ষপথ-জিজ্ঞাসু। এই নিমিত্তই তাঁহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আর যিনি জ্ঞানী, তিনি নিত্য সিদ্ধ তাঁহার বাসনা জীবের হিতসাধন—জীবকে মোক্ষপথ প্রদর্শন।

মোক্ষলাভ লক্ষ্য থাকিলে চারিটি অবলম্বন ধরিয়া থাকিতে হয়;

যথা,—সৎসঙ্গতি, দান্তি (শমদম), বিচার এবং সন্তোষ। সৎসঙ্গ সম্বন্ধে বাবা একটি গল্প বলিলেন,—

কোন এক বড় জহুরী, তাহার স্ত্রী ও পুত্রকে মৃত্যুকালে বলিল, "যদি তোমাদের কখন দুঃসময় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ বন্ধু অমুক জহুরীর নিকট এই রত্নখানি লইয়া যাইবে—তোমাদের দুঃখ দূর হইবে। বলিয়া জহুরী একখানি নকল হীরা তাহাদিগকে দিল। জহুরীর মৃত্যুর পর দুঃসময় আসিয়া দেখা দিল। পুত্র তখন সেই রত্নখানি লইয়া পিতৃবন্ধুর নিকট উপস্থিত হইল। বন্ধু রত্নখানি হাতে পাইয়াই বুঝিলেন, এখানি নকল। নকল রত্ন জহুরী কেন তাঁহার নিকট আনিতে বলিয়াছিলেন তাহা তিনি বুঝিলেন। উদ্দেশ্য বুঝিয়া তিনি বালককে কহিলেন, তুমি এ রত্নটী তোমার গৃহে রাখিয়া দেও; এখন তুমি আমার কাছে শিক্ষালাভ কর। তোমাদের খরচপত্র সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক—আমি সমস্ত ব্যয় বহন করিব।

কয়েক বৎসর শিক্ষার পর বালক যখন বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিল, তখন জহুরী বলিলেন, "এইবার তোমার পিতৃদত্ত রত্নটী লইয়া এস।" পুত্র তাহাই করিল এবং তাহার মূল্য অবধারণ করিতে গিয়া দেখিল—সেখানি নকল পাথর। জহুরী কহিলেন, "তোমার পিতার উদ্দেশ্য ছিল, তোমার শিক্ষা বা জ্ঞানলাভ। আমি প্রথমেই যদি তোমাকে বলিতাম এখানি নকল হীরা, তাহা হইলে তুমি হয়ত মনে করিতে আমি তোমাকে প্রতারণা করিতেছি। আগে তোমাকে শিক্ষা দিয়া নকল ও আসল চিনিবার জ্ঞান দিয়াছি। এখন তুমি নিজেই ইহা যে নকল, তাহা চিনিতে পারিতেছ।"

গল্পটী বলিয়া বাবা বলিলেন, সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করিয়া বহু বৎসর সাধন করিলে ও সৎসঙ্গ-লাভ হইলে তোমরাও বুঝিতে

পারিবে কোন্ পদার্থ নিত্য, আর কোন্‌টাই বা অনিত্য। বিষয়ানন্দ যে নকল রত্ন মাত্র, তাহা তখন তোমাদের উপলব্ধি হইবে।*

সন্ধ্যা বেলায় বাবাকে দান্তি কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। বাবা বলিলেন, দান্তি অর্থে শম দম—অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক ব্রহ্মচর্য্য। বিষয়স্পর্শে মন স্থূল ও চঞ্চল হয়। শম দম অভ্যাসে চিত্ত পবিত্র ও সূক্ষ্ম এবং অচঞ্চল হয়। মনের এই অবস্থায় ব্রহ্মানুভূতি হয়। শম অর্থে মনের নিগ্রহ; দম অর্থে ইন্দ্রিয়-দমন। একের সাহায্যে অপরটী লাভ হয়।

বাবা এক প্রতিজ্ঞারক্ষাকারী সাধুচরিত্র যুবকের গল্প বলিলেন,—

যুবকটী বাল্যাবস্থায় বিবাহিত হইয়াছিল। বিবাহের পর স্ত্রীকে আর দেখে নাই। স্ত্রী বরাবরই পিত্রালয়ে বাস করিতেছিল। যখন তাহার গৃহে লোকাভাব ঘটিল, তখন সে স্ত্রীকে আনিতে শ্বশুরালয়ে গমন করিল। গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পথের ধারে এক জলাশয়-তীরে একটী যুবতী দুইটী জলপূর্ণ কলসী লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। মাথার উপর দুইটী কলসী লইতে হইবে, কিন্তু প্রথমটীর উপর দ্বিতীয়টী উঠাইতে পারিতেছিল না। যুবককে দেখিয়া কহিল, তুমি আমার মাথার উপর কলসীটা বসাইয়া দিতে পার?"

যুবক তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। যুবতী কহিল, "কিন্তু তৎপূর্ব্বে তোমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে যে, তুমি আমার সহিত বরাবর ভ্রাতৃবৎ আচরণ করিবে।"

যুবক প্রতিজ্ঞা করিল এবং সন্তর্পণে যুবতীর মাথায় কলসী উঠাইয়া দিল। উভয়ে উভয়ের গম্যস্থানে প্রস্থান করিল। যুবক জিজ্ঞাসাবাদ

---

* ১৩৩৫ সালে এই উপদেশটি বাবা শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাবুকে দিয়াছিলেন।

করিয়া পরে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল এবং সাদরে তথায় অভ্যর্থিত হইল। রাত্রিকালে যখন যুবক যুবতী সম্মিলিত হইল, তখন উভয়ে উভয়কে দেখিয়া বিস্মিত হইল,—এই রমণীর মাথায় কিছু পূর্ব্বে কলসী উঠাইয়া দিয়া যুবক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সে তাহাকে চিরদিন ভ্রাতার নয়নে দেখিবে।

পরদিবস গৃহস্বামী, কন্যা জামাতাকে বিদায় দিলেন। যুবক স্ত্রীকে গৃহে আনিয়া কহিল, "তুমি এ গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে অবস্থান কর। ইহার বেশী আর কিছু আশা করিও না। তুমি আমার ভগ্নীতুল্যা তোমার হাতের অন্ন আমি গ্রহণ করিতে পারিব না।"

স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর উঠিল; কিন্তু এ ব্যবধানের কথা কেহ জানিতে পারিল না—তাহারা কাহাকেও কিছু বলিল না। এইরূপে তাহাদের সুখ দুঃখে দিন কাটিতে লাগিল। স্ত্রী বিবেচনা করিয়া দেখিল, তাহার ধর্ম্মপ্রাণ স্বামী কিছুতেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিবেন না। তখন সন্তান-সন্ততির সম্ভাবনা নাই। সন্তান না হইলে বংশ নির্ম্মূল হইবে, গৃহও শোভাহীন হইয়া থাকিবে। অতএব স্বামীর পুনরায় বিবাহ দিতে হইবে। নিজের বয়স্থা সহোদরা ভগ্নী আছে, তাহার সহিত বিবাহ ঘটিলে মন্দ হয় না। স্বামীকে সম্মত করিয়া পিতার নিকট সংবাদ পাঠাইল। পিতা শুনিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা পতি-গৃহে অতি সুখে ও সম্মানের সহিত আছে—তাহার কিছুরই অভাব নাই। প্রস্তাব পাইবামাত্র পিতা তাঁহার দ্বিতীয় কন্যাকে জামাতার হস্তে সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। শুভদিনে উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। কন্যাসম্প্রদানান্তে পিতা জামাতাকে কহিলেন, "তোমার হস্তে আমার দ্বিতীয় কন্যাকে দান করিলাম। তোমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে, তুমি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে যে ভাবে

দেখিয়াছ, যে ভাবে রাখিয়াছ, ইহাকেও সেইভাবে দেখিবে, সেইভাবে রাখিবে।”

জামাতা প্রতিশ্রুতি দিয়া স্ত্রীসহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে ফিরিয়া উভয় স্ত্রীকে কহিলেন, “তোমাদের পিতার নিকট আমি কথা দিয়াছি যে, আমি বড়কে যে ভাবে দেখি, ছোটকেও সেইভাবে দেখিব। বড়কে আমি ভগ্নী ভাবে দেখি, ছোটকেও অদ্য হইতে সেইভাবে দেখিব ও সেইমত ব্যবহার করিব। তোমাদের প্রস্তুত অন্নাদি আমি গ্রহণ করিব না। আমি নিজে রাঁধিয়া খাইব—তোমাদের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিব না।”

জ্যেষ্ঠা স্ত্রী মনঃপীড়া পাইলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, এইবার গৃহে সন্তান আসিবে। কিন্তু সে পথ রুদ্ধ হইল। তিনি তাঁহার সত্যপ্রাণ স্বামীকে চিনিতেন তাঁহাকে অনুরোধ করা বৃথা—তিনি কিছুতেই প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইবেন না বুঝিয়া নিরস্ত রহিলেন। দুই ভগ্নী অতি সুখে আনন্দে আছে ইহাই সকলে জানিল। বস্তুতঃই তাহারা স্বামী হইতে স্বতন্ত্র থাকিলেও তাহাদের আনন্দ-কোলাহলে গৃহ সতত মুখরিত হইত। গৃহস্বামী যুবকও সদাপ্রসন্ন বদনে পত্নীদ্বয়ের সহিত স্নেহময় ব্যবহার করিতেন।

এই সময় অনতিদূরে আর একটী ঘটনা সূচিত হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে মিলিয়া দেশ ভ্রমণ করিতেছিলেন। অর্জ্জুনের কণ্ঠে অতি দুষ্প্রাপ্য মণিময় হার। এই হার দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনকে এক সময়ে উপহার দিয়াছিলেন। উপহার দিবার সময়ে ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, এই হার কখন তুমি কণ্ঠ হইতে খুলিও না। পার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কহিয়াছিলেন, “জীবন থাকিতে আমি ইহা কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিব না।”

এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট এই হার প্রার্থনা করিলেন। পার্থ কহিলেন, “জীবন থাকিতে আমি ইহা কণ্ঠ হইতে খুলিতে পারিব না—আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।” শ্রীকৃষ্ণ নিরস্ত হইলেন।

পরে দ্বিপ্রহরকালে অর্জ্জুন অদূরে সরোবর দেখিয়া কহিলেন, “বন্ধু, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি স্নান করিয়া আসি।”

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন “বন্ধু, স্নানে যাচ্ছ, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যাচ্ছ কেন?”

পার্থ লজ্জিত হইয়া অস্ত্রাদি শ্রীকৃষ্ণের নিকট রক্ষা করত স্নানার্থে গমন করিলেন।

স্নান সমাপনান্তে যখন তিনি কূলে উঠিয়াছেন, তখন এক ভীষণাকার সিংহ সহসা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। অর্জ্জুন তখন নিরস্ত্র; আত্মরক্ষার জন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া তিনি কণ্ঠ হইতে মণিময় হার উন্মোচন পূর্ব্বক সিংহের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। সিংহ মুখব্যাদান পূর্ব্বক হার গ্রাস করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল।

পার্থ বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-সকাশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার কণ্ঠে সেই মণিময় হার দুলিতেছে। পার্থ সমস্ত বুঝিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, “কি হে বন্ধু, তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে, জীবন থাক্‌তে হার গলা হ'তে খুলবে না? তুমি ত বেঁচে আছ, কিন্তু হার কই?”

তৎপরে অর্জ্জুনকে হার প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, “চল তোমাকে দেখাব, এক ব্যক্তি কিরূপে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রছে। তুমি দেখে প্রীত হ'বে, ধন্য হ'বে।”

অতঃপর দুইজনে সাধুর বেশ ধারণ করত পূর্ব্বোক্ত যুবকের গৃহে

আসিয়া দর্শন দিলেন। গৃহস্বামী মহানন্দে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং সেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেবাগ্রহণে সম্মত হইয়া কহিলেন, "কিন্তু মায়ীদের পাক করিতে হইবে।" গৃহস্বামী তদনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন। পত্নীদ্বয় সানন্দে রন্ধন-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া পরিষ্কৃত কক্ষমধ্যে দুইখানি আসন পাতিয়া দিলেন; দুইখানি প্রস্তর-পাত্রে অন্নব্যঞ্জন পরিবেষণ করিলেন। পরে গৃহস্বামী যুক্তকরে অতিথি-দ্বয়কে আহ্বান করিয়া কক্ষমধ্যে আনিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "দুই-জনের মাত্র স্থান হইয়াছে—গৃহস্বামীকেও আমাদের সহিত বসিতে হইবে, তৃতীয় পাত্র লইয়া এস।"

বধূদ্বয় তৎক্ষণাৎ তৃতীয় পাত্র আনিয়া অন্নব্যঞ্জন পরিবেষণ করিলেন। কিন্তু গৃহস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন না। তদ্দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "তোমার গৃহে আমরা অতিথি, তুমি যদি আমাদের সহিত আহার না কর, তাহা হইলে আমরা অভুক্ত অবস্থায় এখনি তোমার গৃহ ত্যাগ করিব।"

যুবক মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি চিন্তা করিবার জন্য একটু অবসর প্রার্থনা করিলেন; শ্রীকৃষ্ণ অনুমতি দিলেন। যুবক তখন দ্বিতলে আসিয়া কক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"কোন্ অপরাধ গুরুতর? আমি যদি আহার না করি, তাহা হইলে সাধুরা এখনি অভুক্ত অবস্থায় ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করেন। আর যদি আহার করি, তাহা হইলে আমাকে সত্যচ্যুত হইতে হয়। দুই অপরাধই গুরুতর। আমি কোন অপরাধই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। তাহা হইলে আমার কর্ত্তব্য কি? আত্মহত্যা করিলে আমি এই সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। ভাল, আত্মহত্যাই করিব।"

ইহা স্থির করিয়া তিনি তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং আত্মহত্যা করিয়া এই সমস্যার মীমাংসা করিলেন।

স্বামীর ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া জ্যেষ্ঠা পত্নী দ্বিতলে গেলেন। কক্ষমধ্যে গিয়া দেখেন স্বামী রক্তাক্ত দেহে ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত। তিনি স্বামিবিয়োগ সহ্য করিতে না পারিয়া সেই তরবারি উঠাইয়া লইয়া আত্মহত্যা করিলেন। কনিষ্ঠা পত্নী ভগ্নীর ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া দ্বিতলে গমন করিলেন এবং স্বামী ও ভগ্নীকে নিহত দেখিয়া ঐ তরবারি উঠাইয়া লইয়া স্বীয় জীবন নাশ করিলেন।

এদিকে অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন, গৃহস্বামীর ফিরিতে বহু বিলম্ব হইতেছে, তখন তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন, "চল বন্ধু, দেখে আসা যাক্ ব্যাপার কি ?"

উভয়ে দ্বিতলে উঠিলেন ; কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিন জনের রক্তাক্ত দেহ ভূপৃষ্ঠে লুটাইতেছে। তদ্দর্শনে অর্জ্জুন সাতিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার তোমার কি লীলা লীলাময় ?"

শ্রীকৃষ্ণ তখন পার্থকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলেন। "এই ব্যক্তি সত্য-রক্ষার্থে নিজের প্রাণ দিয়াছে—পাছে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ অপরাধ হয়, তাই সে একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া প্রাণ দিল।"

দয়াল প্রভু কিছু জল লইয়া মৃতদেহ কয়টার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তিন জনেই তৎক্ষণাৎ জীবন লাভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা এখন নব-জীবন লাভ করিয়াছ, পূর্ব্ব-জীবনের কথা বা প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হও। আমি তোমাদের পরিণয়-কার্য্য এখনি সম্পন্ন করিতেছি—তোমরা স্বামি-স্ত্রী-রূপে সুখে সংসার কর।"

শ্রীকৃষ্ণ কন্যাদ্বয়কে যুবকের হস্তে সম্প্রদান করিয়া কহিলেন, "চল, এখন আমরা একত্র ভোজন করি।"

এই অসাধারণ সাধুটি কে তাহা জানিবার জন্য যুবকের সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছিল। অর্জ্জুন তাহা বুঝিয়া বিদায়কালে কহিয়াছিলেন, "ত্রিজগতের নাথ আজ তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তোমার মত ভাগ্যবান্ কে? তুমি সত্য রক্ষা করিয়াছ, তাই তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই কৃপা; মায়ীরা পতিগতপ্রাণা, তাই তাঁহাদের অন্তরের বাসনা পূর্ণ হইল। আর সেই সঙ্গে তিনি আমারও গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন।"

বাবা বলিলেন, উৎকট ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রযত্ন না থাকিলে চিত্তশুদ্ধি বা ব্রহ্মচর্য্য সম্ভব নয়। এইরূপ উৎকট ইচ্ছার সহিত সাধনা ও অভিমান-শূন্যতা থাকিলে ব্রহ্মলাভ হয়। বাবা দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প বলিলেন।

এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক সাধু তপস্যারত ছিলেন। ঐ বনে এক সুদর্শন কাঠুরিয়া বালক প্রত্যহ কাষ্ঠ-সংগ্রহার্থে আসিত। সাধুকে দেখিয়া তাহার ভক্তি জন্মিল। ইচ্ছা হইল, তাঁহার সেবা করে। কিন্তু সে সামর্থ্যহীন। তাহার যাহা সাধ্য সে তাহাই করিল;—এক বোঝা কাঠ সাধুর ধুনির জন্য প্রত্যহ দিয়া যাইতে লাগিল। একদিবস সাধু তাহাকে কহিলেন, "বালক, কেন তোমার পরিশ্রম-লব্ধ কাষ্ঠ প্রত্যহ আমাকে দিয়া যাও? আমার সেবায় তোমার কোনও উপকার সম্ভব নয় ত।"

"আমি ত উপকারের আশা করিয়া কাঠ দিয়া যাইতেছি না; আপনার সেবা করিয়া আমার তৃপ্তি; তা' আমি ত কিছু করিতে পারি না, তাই কিছু কাঠ রেখে যাই।"

সাধু প্রীত হইয়া কহিলেন, "তুমি রাজধানীতে যাও, রাজপুত্রগণ এক শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন; তুমি সেই শিক্ষকের নিকট গিয়া রাজবিদ্যা শিক্ষা কর।"

"তিনি আমাকে শিখাইবেন কেন ?"

"আমি তাহার উপায় তোমাকে বলিয়া দিতেছি।"

সাধু ঐ বালককে যথাযথ উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। বালক রাজধানীতে আসিয়া সাধুর উপদেশ মত শিক্ষকের গৃহে প্রত্যহ এক বোঝা কাঠ দিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু তাহার মূল্য কখন চাহিত না। শিক্ষক-পত্নী ভাবিতেন, তাঁহার স্বামী বুঝি কাঠুরিয়ার সহিত কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এক দিবস শিক্ষকের উপস্থিতিতে কাঠুরিয়া কাঠ দিয়া প্রস্থান করিল। শিক্ষক তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মূল্য দিলে না ?"

স্ত্রী কহিল, "সে কি ! আমি ত কোন দিনই মূল্য দিই না, অনেক দিন হইতে যে কাঠ দিতেছে ! আমি জানিতাম তোমার সহিত কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে।"

পরদিবস তিনি বালককে ধরিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তুমি প্রত্যহ কাঠ দিয়া যাও ? আর তজ্জন্য অর্থও লও না। তুমি কি চাও ?"

"আমি আপনার অর্থ বা উপকারের প্রত্যাশী নই—আমি চাই আপনার সেবা করিতে।"

"তোমার কে আছে ?"

"জগতে আমার কেহ নাই।" শিক্ষক বালকটীর প্রতি বিশেষ প্রীত হইয়া বলিলেন "আচ্ছা তুমি আমার গৃহে থাক।"

বালক শিক্ষকের গৃহে রহিয়া গেল। সেবাদ্বারা শিক্ষক-পত্নীকে অল্প সময়ের মধ্যে বশীভূত করিল। তিনি উত্তম বস্ত্র বা খাদ্য দিতে চাহিলে বালক তাহা গ্রহণ করিত না। অবশেষে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও তবে ?"

বালক উত্তর করিল, "মা আপনারা যদি প্রকৃতই আমার প্রতি দয়া

প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি যাহাতে উপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করুন।”

বালকের ব্যবহারে ও সেবায় গৃহস্বামী তুষ্ট হইয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। বালকের অসামান্য বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া গৃহস্বামী মুগ্ধ হইলেন এবং তাহাকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং রাজ-বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভার্থ ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এদিকে কর্ত্রী তাহার সেবায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুত্র ছিল না। অনেকেই জানিল, এই বালক শিক্ষকের পুত্র। রাজকুমারগণ বহু পূর্ব্ব হইতে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন, কিন্তু বালক তাহার অসামান্য অধ্যবসায়-প্রভাবে তাঁহাদের সত্বর অতিক্রম করিয়া গেল।

নিকটবর্ত্তী এক রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে ছাত্র পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, তাহাকেই তিনি তাঁহার একমাত্র দুহিতাকে দান করিবেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং এই জামাতাই সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। রাজ-বিদ্যালয়ে রাজনীতি-সম্বন্ধে কঠোর পরীক্ষা আরম্ভ হইল। রাজপুত্রগণের সহিত এই প্রিয়-দর্শন অধ্যবসায়ী বালকও পরীক্ষার্থিরূপে দাঁড়াইল। তাহাকে কেহ কাঠুরিয়া বলিয়া জানিত না, অনেকেই জানিত সে শিক্ষকের পুত্র। পরীক্ষায় বালক প্রথম স্থান অধিকার করিল। তখন পূর্ব্বোক্ত রাজা ঐ পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবাকে অমাত্যপদে প্রথমে নিযুক্ত করিলেন। এই কার্য্যে যুবকের বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাসমারোহের সহিত এই যুবকের হস্তে তাঁহার একমাত্র দুহিতাকে সম্প্রদান করিলেন এবং তাহাকে মন্ত্রিপদে বরণ করিলেন। তখনও যুবক রাজাকে তাহার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট করিতে লাগিল।

কিছুকাল পরে রাজা দেহত্যাগ করিলেন। তখন এই যুবক সিংহাসনে আরোহণ করিল। সৎকার্য্যে তাহার পূর্ব্ব হইতে অনুরাগ ছিল, এক্ষণে প্রভূত ঐশ্বর্য্য তাহার হস্তগত হওয়ায় সে তাহার সদিচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিল। তাহার আনন্দের সীমা রহিল না,—গৃহে প্রেমময়ী ভার্য্যা, চতুর্দ্দিকে অনুগত ভৃত্যবৃন্দ, রাজ্যময় অনুরক্ত প্রজা, জনহিত-সাধনের জন্য বিপুল ঐশ্বর্য্য। তাঁহার বহু সদনুষ্ঠানে সকলেই প্রীত হইতে লাগিল। তখন তিনি একদা নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব জীবন-কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, তিনি কত সামান্য অবস্থা হইতে আজ এই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি কত ক্ষুদ্র ছিলেন, আর আজ কত বড়! কিন্তু অধ্যবসায় থাকিলে এতদপেক্ষাও ত বড় হওয়া যায়। রাজবিদ্যা শিখিয়া রাজা, ব্রহ্মবিদ্যা শিখিলে ত ব্রহ্মলাভ হইতে পারে।

রাজা এইরূপ স্থির করিয়া মন্ত্রীকে আহ্বান করিলেন। মন্ত্রী আসিলে তাঁহাকে তাঁহার জীবনেতিহাস কহিলেন; পরে জানাইলেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে উৎসুক। কিন্তু উপযুক্ত গুরু না পাইলে ত ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষা হয় না। উপযুক্ত গুরুর অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিলেন।

কয়েকদিন মধ্যে মন্ত্রী সংবাদ দিলেন, এই রাজ্যপ্রান্তে জঙ্গলে একজন বড় সাধু আছেন। রাজা তখন রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া সৈন্যসামন্ত ও বহু মূল্যবান্ উপঢৌকন সহ সাধুদর্শনে যাত্রা করিলেন।

সাধুর আশ্রমের-সন্নিকটে পৌছিবামাত্র সাধুর এক সেবকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিল। রাজা সাধু-শিষ্যকে কহিলেন, "তুমি যাও, সাধুকে সংবাদ দেও, এ দেশের রাজা মহাত্মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন।" শিষ্য মহাপুলকিত-চিত্তে গুরুকে সংবাদ দিতে ছুটিল। বহু

দ্রব্যসম্ভার-দর্শনে তাহার চিত্ত প্রলুব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু মহাত্মা রাজাকে দর্শন দিতে ও উপঢৌকন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। শিষ্য ক্ষুণ্ণ হইয়া রাজাকে সে সংবাদ দিল। রাজা নিরস্ত হইলেন না,— অনেক বিনীত প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে মহাত্মা রাজাকে দর্শন দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু অষ্টাহ পরে। রাজা তখন সানন্দে রাজ-ধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রাজা চিন্তা করিয়া দেখিলেন, এত সৈন্য-সামন্ত লইয়া যাওয়া তাঁহার উচিত হয় নাই। অষ্টম দিবসে তিনি যখন পুনরায় সাধু-দর্শনে যাত্রা করিলেন, তখন সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইলেন বটে, কিন্তু বড় বেশী নয়; রাজ-পরিচ্ছদও ত্যাগ করিয়া সামান্য বেশে চলিলেন। আশ্রম-সন্নিকটে পৌঁছিয়া পূর্ব্বোক্ত শিষ্যের দ্বারা মহাত্মার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন; কিন্তু এবারেও সাধু দর্শন দিতে সম্মত হইলেন না। রাজা পুনঃ পুনঃ বিনীত প্রার্থনা জানাইলেন। সাধু বলিয়া পাঠাইলেন, অষ্টাহ পরে পুনরায় আসিতে। রাজা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গৃহে আসিয়া রাজা চিন্তা করিয়া দেখিলেন, এবারেও তিনি অভি-মান অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া সাধু-দর্শনে যাইতে পারেন নাই। অষ্টম দিবসে তিনি একাকী সাধুদর্শনে চলিলেন। আশ্রম-দ্বারে উপনীত হইয়া পূর্ব্বোক্ত শিষ্য দ্বারা সাধুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। এবার সাধু দর্শন দান করিলেন। রাজা প্রণামান্তে নিবেদন করিলেন যে, তিনি তত্ত্ববিদ্যা শিখিতে আসিয়াছেন। সাধু উত্তর করিলেন, "ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিবার উপযুক্ত তুমি এখনও হও নাই—আমি তোমাকে দীক্ষা দিতে পারিব না। তোমার অন্তর মধ্যে এখনও অহঙ্কার অভিমান বর্ত্তমান।"

"কিরূপে এই অহঙ্কার নষ্ট হইবে?"

"সাধুসেবায়।"

রাজা তখন সাধু-সেবার জন্য আশ্রমে বসিয়া জাঁতায় গম ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তিনি দীর্ঘ ছয় মাস অতিবাহিত করিলেন। তিনি প্রত্যহ সানন্দে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা সাধুসেবার্থে আটা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে সাধু একদিনও রাজাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন নাই, তোমার আহারাদি হইয়াছে কি না!

এই দীর্ঘকাল পরে রাজা যেদিন মনে করিলেন, এইবার তিনি পুরস্কার লাভ করিবেন, সেইদিন এক বিঘ্ন ঘটিল। এক ভিক্ষুক আশ্রমে আসিয়া গোলমাল করায় রাজা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে তিরস্কার পূর্ব্বক তাড়াইয়া দিলেন। সাধু তাহা জানিতে পারিয়া রাজাকে কহিলেন, "তোমার মত ক্রোধী ব্যক্তি এ আশ্রমের উপযুক্ত নয়—তুমি চলিয়া যাও।"

রাজা তাড়িত হইয়া আশ্রম-বাহিরে আসিলেন। কিন্তু রাজ-ধানীতে ফিরিলেন না। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, ক্রোধ ও অহঙ্কারই তাহার সিদ্ধির পথে কণ্ঠক। এই দুরন্ত রিপুদ্বয় কিরূপে বশীভূত হয়? তিনি স্থির করিলেন ভিক্ষালব্ধ অন্ন গ্রহণ করিবেন এবং যেখানে সেখানে শয়ন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিবেন। মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এক বৃদ্ধ রমণী ভাজা বিক্রয় করিয়া দিনাপাত করিত। ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ ভিক্ষান্নজীবী রাজা, এই বৃদ্ধার দ্বারে ভিক্ষার্থে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা ভিক্ষা দিত বটে কিন্তু কাজ করাইয়া লইত। রাজাকে ভাজা ভাজিতে হইত ও চুলির আগুন ঠিক রাখিতে হইত। যে সব ভাজা মাটিতে পড়িয়া যাইত তাহা রাজা কুড়াইয়া লইয়া ভক্ষণ করিতেন। এইরূপে দিন কাটিত। একদা রাজা

সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভাজা খাইতে বিশেষ মনোযোগী হইলেন; চুলার জাল যে নিবিয়া গিয়াছে সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই। বৃদ্ধা সহসা তথায় আসিয়া দেখিল, তাহার ভাজা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর রাজা ভাজা কুড়াইয়া খাইতেছে। বৃদ্ধা মহা কুপিতা হইয়া একখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা রাজাকে প্রহার করিল; তাঁহার অঙ্গ হইতে রক্তধারা ছুটিল। বৃদ্ধার ক্রোধজনিত চীৎকার শুনিয়া অনেক লোক জমা হইল। তাহার মধ্যে কেহ কেহ রাজাকে চিনিতে পারিল; দুই চারি ব্যক্তি ছুটিয়া রাজ-বাড়ীতে সংবাদ দিল। রাজা কিন্তু বৃদ্ধার কোন অপরাধ গ্রহণ করিলেন না,—তিনি জনতা হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়া সাধুর আশ্রমদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এবার সাধুর কৃপালাভ হইতে রাজা বঞ্চিত হইলেন না,—তিনি রাজাকে দীক্ষা দান করিলেন। রাজা দৃঢ় চেষ্টা, গাঢ় অনুরাগ ও ঐকান্তিক ভক্তিসহ সাধনদ্বারা যথাসময়ে সিদ্ধিলাভ করিলেন।

গল্প শেষ করিয়া বাবা কহিলেন, "শুভকার্য্যে উৎকট অর্থাৎ তীব্র ইচ্ছা চাই এবং চিত্ত হইতে মলিন অভিমান দূর করা একান্ত প্রয়োজন। এই পথে উৎকট ইচ্ছা, দৃঢ় চেষ্টা ও অত্যন্ত ধৈর্য্য ব্যতীত কার্য্য সিদ্ধ হইবে না।"

বাবা একদিন বলিতেছিলেন, "সতত ব্রহ্ম-অভ্যাস চাই। আমি সৎ চিৎ আনন্দ-স্বরূপ আত্মা—পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহি।"

বাবা একটী শ্লোক বলিলেন,—

"তচ্চিন্তনং তৎকথনং অন্যোন্য-প্রবোধনং।
এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ।"

অর্থাৎ

"তাঁর চিন্তা,—তাঁর কথা নিত্য আলোচন,—

তিনি ভিন্ন নাহি অন্য, এই সত্যজ্ঞান,—
এই একনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার স্মরণ,—
ইহাকেই ব্রহ্মাভ্যাস ক'ন সুধীজন।

বাবার কোন ভক্ত মায়ী একদা বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—নিষিদ্ধ কর্ম্ম কি ?

বাবা উত্তর করিয়াছিলেন, "যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তাহাই নিষিদ্ধ কর্ম্ম।"

বাবা তাঁহার কোন সেবিকাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "সর্ব্বদা সৎ-কথনও সকলের মঙ্গল কামনা করিবে; পরনিন্দা ত্যাগ করিবে, পরনিন্দা-দ্বারা চিত্ত মলিন হয়। যাহাতে হৃদয়ে দ্বেষভাব জন্মে, সেরূপ চিন্তা পরিত্যাগ করিবে। চিত্তে অনাসক্তি ও সন্তোষ-রক্ষা প্রয়োজন। সাধকের ত সর্ব্বাগ্রে সন্তোষ আবশ্যক।"

বাবা বলিলেন—"লক্ষ্মী চিরদিনই চঞ্চলা, একস্থানে লক্ষ্মী বদ্ধ থাকেন না। সুতরাং উহার সৎ ব্যবহার প্রয়োজন। ধনাদি চার ব্যক্তির ভোগ্য হয়। (১) ধর্ম্ম, (২) তস্কর, (৩) অগ্নি, ও (৪) নৃপ। অর্থ যদি সৎকার্য্যে ব্যয়িত না হয়, তবে উহা অপর তিনটীর কবলে যাওয়ার সম্ভাবনা। অতএব অর্থ অধিক সঞ্চয় না করিয়া শুভকার্য্যে ব্যয় করাই সঙ্গত। আমার গুরু মহারাজও বলেন—"যেরূপ কূপের জল ব্যবহার না করিলে উহা দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া উঠে, এবং যত ঐ জল ব্যবহার হয়, ততই নীচ হইতে নির্ম্মল জল উত্থিত হয়, সেইরূপ ধনের সদ্ব্যবহারেও শ্রীভগবান সন্তুষ্ট হইয়া দাতাকে অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি আরও বলেন—যে গৃহে অর্থ অধিক সঞ্চিত হয়, সে গৃহস্থের অন্তরে অনেক সময় প্রবল ভোগ-বাসনা বা দম্ভ জন্মে ও হৃদয় সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়।"

সাধুবাবা একদিন আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিলেন, মায়িক বস্তুকে প্রকৃতপক্ষে কোন সুখ নাই। আত্মাই প্রকৃত সুখের আধার, উৎস ও আনন্দস্বরূপ। মনকে কোনরূপ উপায় দ্বারা একাগ্র করিতে পারিলে আত্মার এই সুখের অনুভূতি হয়। তবে মায়িক বস্তুর দ্বারা যে জীব সুখানুভব করে, তাহার কারণ, ইচ্ছানুরূপ বস্তু পাইলে তখন ঐ সময় অল্পক্ষণের জন্য ইচ্ছার অভাব হয়; এবং ইচ্ছা বা বাসনার অভাব হইলেই মন তখন অল্পক্ষণের জন্য উহাতে একাগ্র হয় ও তাহার ফলে সুখানুভূতি হইয়া থাকে। মন অধিক চঞ্চল হইলে তার সুখানুভূতির বা রসাস্বাদনের ক্ষমতা থাকে না। বাসনা বা ইচ্ছার দ্বারা মন কেবল তরঙ্গায়িত ও চঞ্চল হয়, তাহাতে মাত্র উত্তেজনারই বৃদ্ধি হয়। এই নিমিত্ত বাসনা বা ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইবে।

বাবা বলিলেন—"বহুদিন অবধি একাগ্র ধ্যান অভ্যাসে, ধ্যানকালে অন্তর-মধ্য হইতে অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। উহা অন্তরস্থ আত্মারই ধ্বনি। ঐ ধ্বনিতে চিত্ত একাগ্র ও তন্ময় করিতে পারিলেই চিত্ত আনন্দ, শক্তি ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত ঐ ধ্যানের বিশেষ অভ্যাস করা উচিত।" নিরন্তর একাগ্রচিত্তে বহু দিবস ধ্যান অভ্যাসের ফলে ঐ অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

বাবা বলেন—"সকল স্বার্থকামনা, ফাল্‌তু চিন্তা, ফাল্‌তু বাৎ, ফাল্‌তু কর্ম্ম ত্যাগ করত মনকে সদা পরামাত্মায় একাগ্র বা স্থির করিতে অভ্যাস কর, মনের প্রবাহ সদা তাঁহার দিকে দাও, তাহা হইলেই শান্তি ও আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হইবে।"

একদা বাবা বলিয়াছিলেন ;—

"হিত অনহিত পশু পক্ষীও জানা।
মানুষ তনুগুণ জ্ঞান নিধানা ॥"

অর্থাৎ, কে হিতকারী আর কে অহিতকারী তাহা পশুপক্ষীও বুঝিতে পারে। গুণ-জ্ঞানের আধার মানুষ তাহা পারিবে, ইহা বিচিত্র নহে। বাবা বলিলেন,—কেহ যদি কাহারও শুভ কামনা করে, তাহা হইলে অপর হৃদয়েও তাহার ছায়াপাত হইবে। যদি তাহার হৃদয়ে কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকে, তাহা হইলে সে ভ্রান্ত ধারণা ক্রমে ক্রমে দূর হইবে।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

বাবা একদিন বলিতেছিলেন ;—গৃহস্থাশ্রম-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই বিবিধ দুঃখ আরম্ভ হয়। যতই দিন গত হইতে থাকে, ততই আরও অধিক নূতন নূতন বন্ধন ও দুঃখের সৃষ্টি হইতে থাকে। অবশেষে জরাগ্রস্ত শরীর-ত্যাগকালে মরণ-মূর্চ্ছার সময় সমস্ত জীবনব্যাপী সংস্কার-গুলি একে একে সম্মুখে উপস্থিত হয়। জীবের অন্তর্নিহিত বিবিধ ভোগ-তৃষ্ণার নিমিত্ত মরণের পরও পুনর্ব্বার দেহধারণপূর্ব্বক এই দুঃখময় সংসারে পুনরাগমন করিতে হয়। এই নিমিত্ত মনে মনে বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সকল সময়ে "আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, মুক্ত—আমি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ আত্মা—আমি মায়ার অধীন থাকিব কেন? আমি মায়াপাশ ছিন্ন ও বর্জ্জন করিব। সদা এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। ঐরূপ অনবরত চিন্তনের ফলে তবে উহা মনোমধ্যে দৃঢ়ভাবে বসিয়া যায়, তখন ধীরে ধীরে মায়াপাশ ছিন্ন হয়, আর তাহার এ সংসারে পুনরাবর্ত্তন ঘটে না। ঐ উপায়ের দ্বারাই জীব পরিত্রাণ পাইতে পারে। পরমজ্ঞান লাভ ব্যতিরেকে মুক্তি কদাচ সম্ভবপর নহে।"

বাবা বলিয়াছিলেন—যদি কেহ বাহিরে মাত্র গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে, তবে তাহাতে কোন ফল হয় না। মন হইতে আসক্তি বাসনার ত্যাগকেই ত্যাগ বলে। বাহিরে গৈরিক ধারণ করিয়া সন্ন্যাস লইয়া অন্তরে ভোগবাসনা আসক্তি পোষণ করিলে কোনই ফল হয় না।

৮ই বৈশাখ বাবা পদ্মা নদীতে স্নান করিয়া আসিয়া কবি গোলাপ সিং কৃত একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। আমরা বাবার চরণে ফুল দিয়া একে একে প্রণাম করিলাম। বাবা কবি গোলাপ সিং কৃত একটি দোঁহা পাঠ করিলেন।

বাবাকে ইহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—বড় বড় তপস্বী বলিয়া যাহাদের অভিমান, তাহাদেরও পদার্থের সঙ্গ হইলে পতন হইতে পারে। অভিমান থাকিলেই সে মায়ার অধীন হয়। কবি গোলাপ সিং বলিতেছেন, যে সকল ব্যক্তি মূর্খ, তাহারাই অভিমান করিয়া থাকে। যে প্রকৃত তপস্বী বিদ্বান্ বা গরিষ্ঠ ব্যক্তি, তাহার চিত্ত অভিমানশূন্য ও নম্র হয়। সম্পূর্ণ অভিমান-ত্যাগ না হইলে প্রকৃত ধর্ম্মলাভ হয় না।

বাবাকে প্রশ্ন করিলাম, "কোন একটি বস্তু ত্যাগ করিয়া যদি মনে অহঙ্কারের উদয় হয়, তখন কি উপায় দ্বারা উহা নিবারণ করা যায়?" তিনি বলিলেন "এই দৃশ্যমান পদার্থ-নিচয় কিছুই যখন আমার নয়, তখন 'ইহা ত্যাগ করিলাম' এ অভিমান ত শোভা পায় না। যে বস্তু আদৌ আমারই নয়, তাহা আমি ত্যাগ করিলাম, তা'র জন্য আবার অভিমান-অহঙ্কার কি? আমার গুরুমহারাজ বলিতেন—কোন বিষয়ে মনে অহঙ্কার-অভিমানের উদয় হইলে উপর দিক দেখিতে হয়। আমা অপেক্ষা কত ধনবান্, কত রূপবান্, কত বিদ্বান্, কত শ্রেষ্ঠ এবং বহু গুণসমন্বিত ব্যক্তির ত জগতে অভাব নাই? তবে আমি কেন সামান্য

সম্পদের অধিকারী হইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠিব? তিনি আরো বলিতেন, "এ সংসারের সকল বস্তুই পরমাত্মার, আমার কিছুই নহে।"

একদা আমার স্বামীকে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ বলিয়াছিলেন—"শরণাগতি, অনুস্মরণ ও তিতিক্ষা—ইহাই সদা অবলম্বন করিয়া চলিবে।"

মৌন রহিলে তাহার কি উপকারিতা, বাবাকে এক দিবস জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—"মৌনী হইলে তিতিক্ষা জন্মে। অর্থাৎ অপমান ক্ষতি প্রভৃতি সহনের শক্তি বৃদ্ধি পায় ও মনে ক্ষমাগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অপর কাজ না থাকায় মনন করিবারও সুবিধা হয়, ভাবও গাঢ় হয়।"

একদা বাবা গুজরাটি ভাষায় একটি দোঁহা বলিয়া তাহার এইরূপ অর্থ বলিলেন—নিদ্রাবস্থার স্বপ্ন যেমন জাগরিত হইলে সম্পূর্ণ নাশ হইয়া যায়, অর্থাৎ উহা ভ্রান্তি ব্যতীত কিছুই নয়, বুঝিতে পারা যায়, ঐ প্রকার এই সংসার-প্রপঞ্চ যে অনাদিকাল হইতে প্রতীত হইতেছে, উহা তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হইলে দূর হইয়া যাইবে। জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই—বলিয়া বাবা বলিলেন—

সব সুখ হোতো বৈরাগ্‌সে তেজ তপস্যায় মায়।
ভক্তিসে প্রভুতা বাড়ে মুক্তি জ্ঞান বিন্‌ নায়॥

অর্থাৎ বৈরাগ্যের দ্বারা সুখ-লাভ হইতে পারে, তপস্যার দ্বারা শক্তি-লাভ হইতে পারে, ভক্তির দ্বারা মান-প্রতিষ্ঠাদি-লাভ হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে জীব কখনই মুক্তির অধিকারী হইতে পারে না।

"মন পক্ষী তব লগ্‌ উড়ে বিষয় বাসনা মায়।
জ্ঞান বাজকি ঝাপট্‌মে যব লগ আওত নায়॥"

অর্থাৎ মনোরূপী পক্ষী ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিষয়রূপ বনে বিচরণ করিয়া থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে জ্ঞানরূপ বাজপক্ষীর দ্বারা ধৃত না হয়।

বাবা একদিবস কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য হইল পরমার্থ-লাভ। যে ব্যক্তি শুধু ব্যবহারিক জগৎ লইয়া থাকে, তাহার পরমার্থ-লাভ হয় না। আর যদি কেহ পরমার্থ-পথেই চালিত হয়, তবে তা'র পরমার্থেরও লাভ হয়, আবার ব্যবহারিক জগতেও উন্নতি সাধিত হয়। প্রধান বস্তু লাভ হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুগুলি আপনা হইতেই তখন আয়ত্ত হয়।

সংসারী জীব সাধারণতঃ লোভী হইয়া থাকে। তাহার ফল কখন শুভ হয় না। অতি লোভের ফল যে কতদূর বিষময়, তাহা বাবা একটী গল্প বলিয়া বুঝাইলেন।

কোন এক ব্যবসায়ী বহুলক্ষ টাকার দ্রব্য-সামগ্রী-পরিপূর্ণ জাহাজ-সহ যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল, সেই সময় পথিমধ্যে ভয়ানক ঝড় তুফান উঠিল। তখন সে আশঙ্কা করিল, হয়ত জাহাজ ডুবিয়া যাইবে। জাহাজ ডুবিলে তাহার বহু ক্ষতি হইবে, প্রাণও হয়ত যাইবে। সে তখন মহাভীত হইয়া ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইল; ব্যাকুল হইয়া তাঁহার চরণে প্রার্থনা জানাইল যে, সে যদি আজিকার এই বিপদে রক্ষা পায়, তাহা হইলে গৃহে ফিরিয়া সে বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শঙ্করের বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবে এবং তাঁহার পূজা ও সদাব্রতের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবে। ভগবৎ-কৃপায় ঝড় অচিরে থামিয়া গেল; জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে কূলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কূল যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাহার চিন্তার গতিও ততই পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সে মনে করিল, এই সামান্য কারণে বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না, দশ লক্ষ টাকা হইলেই যথেষ্ট হইবে। কিছুক্ষণ পরে সে ভাবিল, দুই লাখই যথেষ্ট হইবে; ক্রমে পঞ্চাশ হাজার, বিশ হাজার, দশ হাজারে

নামিল। যখন জাহাজ আসিয়া কূলে ভিড়িল, তখন সে স্থির করিল, কোন মন্দিরে পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিয়া পূজা পাঠাইলেই যথেষ্ট হইবে। শঙ্করজীর নিমিত্ত বৃথা বহু ব্যয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

নিরাপদে গৃহে পৌঁছিয়া ব্যবসায়ী কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিল; তখন তাহার মন হইতে শঙ্করজীর চিন্তা সরিয়া গেল। একদা হঠাৎ কোন কারণে ঐ মানসিক পূজার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে ভাবিয়া দেখিল, একেবারে পূজাটা না দেওয়া ভাল হয় না,—চারি আনার পূজা পাঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে। শেষে ভাবিল, চারি আনা ব্যয় করিবারই বা প্রয়োজন কি? একটা ডাব কিনিয়া পাঠাইলেও ত চলিতে পারে। বাজারে একটা ডাবের দাম চারি পয়সা। ভৃত্যের উপর ভার না দিয়া নিজেই ডাব কিনিতে বাজারে গেল; উদ্দেশ্য যদি কিছু সুবিধা করিতে পারে। বাজারে গিয়া শুনিল, বাগানে গিয়া খরিদ করিলে দুই পয়সায় পাওয়া যাইতে পারে। বাগানেই গেল। বাগানের মালিক জানাইল, যদি গাছে উঠিয়া সে পাড়িয়া লইতে পারে, তাহা হইলে এক পয়সা ডাব প্রতি পড়িবে। ব্যবসায়ী উৎফুল্ল হইয়া গাছে উঠিল। কয়েকটা ছোটগাছ একটা কূপের ধারে ছিল, তাহারই একটাতে উঠিল। অভ্যাস নাই, তবু একটা পয়সার লোভে নিজেই কোন রকমে গাছে উঠিল। যখন ডাবের কাঁদি ধরিয়াছে, তখন তাহার পা সরিয়া গেল; সে মাটীতে পড়িল না, কাঁদি ধরিয়া শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। এমন সময় নিকট দিয়া একজন অশ্বারোহী যাইতেছিল; তাহাকে ডাকিয়া ব্যবসায়ী কহিল, "ভাই হে, আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমাকে পুরস্কার দিব। ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে আমার পা ধর—"

অশ্বারোহী লোভে পড়িয়া তাহাই করিল। এদিকে অশ্ব ভয়

পাইয়া ছুটিয়া পলাইল ; অশ্বারোহী তখন উপায়হীন হইয়া বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তির পা ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। যখন উভয়ে শূন্যে ঝুলিতেছিল, তখন এক ব্যক্তি বৃহৎ মৃদঙ্গ ঘাড়ে করিয়া নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া ব্যবসায়ী কহিল, "ভাই হে, দেখ্‌তেই পাচ্ছ আমরা দু'জনে কিরূপ বিপদে পড়েছি। যদি ডাব হ'তে আমার হাত ছেড়ে যায়, তা হ'লে আমরা দু'জনে কূপের ভিতর প'ড়ে প্রাণ হারা'ব। যদি তুমি দয়া ক'রে এসে ঐ মৃদঙ্গের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের একটু সাহায্য কর, তবে আমরা রক্ষা পাই। কিছু পুরস্কার দিব।"

মৃদঙ্গধারী তৎক্ষণাৎ গাছের তলায় আসিয়া মৃদঙ্গের উপর দাঁড়াইল। যে মুহূর্ত্তে সে অশ্বারোহীর পদযুগল ধরিয়াছে, সে মুহূর্ত্তেই মৃদঙ্গ গড়াইয়া গিয়া কূপের মধ্যে পড়িল। মৃদঙ্গী তখন অশ্বারোহীর পা জড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। তিন ব্যক্তিই শূন্যে দুলিতে লাগিল। তিনটি দেহের ভার রক্ষা করা ব্যবসায়ীর পক্ষে সহজসাধ্য হইল না,—তাহার ক্লান্ত হস্ত অচিরে স্খলিত হইল। তখন তিন ব্যক্তিই কূপ-মধ্যে নিপতিত হইল।

বাবা গল্প শেষ করিয়া বলিলেন,—

> অতি লোভ নেহি কিজিয়ে, অতি লোভ দুখ-দিন্।
> এক নারিয়েলকে ওয়াস্তে কূপমে পড়ে তিন্॥

অতি লোভের প্রসঙ্গ চলিতে থাকায় বাবা লোভের পরিণাম কি হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আর একটি গল্প বলিলেন,—

এক বণিককন্যার সহিত এক শেঠের বিবাহ হইয়াছিল। কিছুকাল গত হইলে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধিল। শেঠ্‌নী অবশেষে সঙ্কল্প করিল, আত্মহত্যা করিয়া সে এ দুঃখময় জীবনের অবসান করিবে। এই উদ্দেশ্যে একদা মধ্যাহ্নে সে চুপি চুপি গৃহনিষ্ক্রান্ত হইল। অরণ্য-মধ্য

দিয়া যখন সে চলিতেছে, তখন এক মৃদঙ্গধারী তাহার পশ্চাৎ লইল। ক্রমেই সে বুঝিল, রমণী একাই যাইতেছে, তাহার সঙ্গে কোন অভিভাবক নাই। তখন সে সাহস পাইয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এত গহনাপত্র পরিয়া একা কোথা যাইতেছ ?

রমণী কহিল, সে আত্মহত্যা করিতে অরণ্য-মধ্যে আসিয়াছে।

মৃদঙ্গধারী মহা আনন্দিত হইল। তাহার লোভ পড়িয়াছিল গহনার উপর। স্ত্রীলোকটী আত্মহত্যা করিলে গহনাগুলি তাহার হইবে। শেঠ্‌নী অগ্রসর হইয়া এক কূপের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন সেই ব্যক্তি কহিল, "তুমি ত এখন মরিতে যাইতেছ, গহনাগুলি আমাকে দিয়ে যাও না।"

শেঠ্‌নী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া অলঙ্কারগুলি অঙ্গ হইতে খুলিয়া ফেলিল এবং একটা পুঁটুলি বাঁধিয়া মৃদঙ্গধারীকে দিল। সব গহনা দিল, কেবল নাক-ফুলটি দিল না। মৃদঙ্গী সেটা চাহিলে রমণী কহিল, "এটা আমি দিতে পারিব না, এটা আয়তির লক্ষণ। আমি মরিয়া গেলে তুমি আমার মৃতদেহ উপরে উঠাইয়া আমার নাক হইতে ইহা খুলিয়া লইও।

মৃদঙ্গী চিন্তা করিয়া দেখিল, তাহাতে বড় হাঙ্গামা। আমি কূপে নামিয়াছি, তখন যদি কেহ আমাকে দেখিয়া ফেলে! আর মৃতদেহই বা উপরে উঠাইব কি করিয়া ? যদি কেহ তখন দেখিয়া ফেলে আমি মৃতার নাক হইতে গহনা খুলিতেছি, তাহা হইলে আমাকে হয় ত হত্যাকারী বলিয়া ধরিবে, ও-সব গোলে কাজ নাই।

চিন্তান্তে মৃদঙ্গী প্রস্তাব করিল, "যদি তুমি মরিবেই, তবে কূপে পড়ে কেন ? গাছে ঝুলে গলায় দড়ি দিয়ে মরনা কেন ? আমি মৃদঙ্গের দড়ি খুলে গাছে লাগিয়ে দি, তুমি মৃদঙ্গের উপর উঠে গলায় ফাঁস

আট্‌কে দেও, আমি পায়ের তলা হইতে মৃদঙ্গ টেনে নি—ব্যস্ এক মুহূর্ত্তেই সব কাজ শেষ। বড় আরামে মর্‌বে, কিছু জান্‌তে পার্‌বে না কখন মর্‌ছি। আর কূপে পড়ে মর্‌তে দু'চার দিন হয়ত লেগে যা'বে।"

শেঠ্‌নী তৎক্ষণাৎ গলায় দড়ি দিতে সম্মত হইল। কিন্তু কিরূপে গলায় ফাঁস লাগাইতে হয় তাহা সে জানে না। কহিল, "তুমি নিজের গলায় ফাঁস লাগিয়ে আমাকে দেখিয়ে দেও।"

মৃদঙ্গী ভাবে নাই এত সহজে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। সে পুলকিতচিত্তে ক্ষিপ্রহস্তে সমস্ত আয়োজন করিয়া লইল। অতঃপর মৃদঙ্গের উপর উঠিয়া নিজের গলায় ফাঁস লাগাইয়া রমণীর প্রতি চাহিয়া যেমন শিক্ষা দিতে উদ্যত হইল, অমনি পদতল হইতে মৃদঙ্গ সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসও গলায় চাপিয়া লাগিল। রমণী ভীত নয়নে দেখিল, মৃদঙ্গী মৃত্যুকালে অতি ভীষণ যন্ত্রণা পাইল; তাহার বদন বিকৃত হইল, জিহ্বা নির্গত হইল, মুখভঙ্গী ভয়াবহ হইল। তদ্দর্শনে শেঠনী মৃত্যু-কামনা ত্যাগ করত অলঙ্কারসমূহ উঠাইয়া লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

অতি লোভই মৃদঙ্গধারীর মৃত্যুর কারণ হইল; নাক-ফুলের লোভ ছাড়িয়া অন্যান্য অলঙ্কার লইয়া গৃহে ফিরিলে তাহার আর এ দুর্দ্দশা ঘটিত না।

বাবা বলিলেন—

অতি লোভো ন কর্ত্তব্যঃ
লোভোঽতি প্রাণঘাতকঃ।
বণিক্‌কন্যা-প্রসঙ্গেন
মৃদঙ্গী মরণং গতঃ॥

বাবা আর একদিন আমাদের একটী গল্প বলিলেন। কোন এক

বাদ্‌শাহ তাঁহার মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার পাঁচটী প্রশ্ন আছে, তোমার নিকট হইতে তাহার উত্তর চাই।"

"আজ্ঞা করুন।

"আমার প্রথম প্রশ্ন, ইহকালে দুঃখী ও পরকালে সুখী কে? দ্বিতীয় ইহলোকে সুখী, পরলোকে দুঃখী কে? তৃতীয়, ইহলোকে সুখী, পরলোকেও সুখী কে? চতুর্থ, ইহলোকে দুঃখী পরলোকেও দুঃখী কে? পঞ্চম প্রশ্ন, পাপ কি?"

বাদশাহের প্রশ্নে মন্ত্রী সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। কহিলেন, "আমাকে এক মাসের সময় ও বিদায় দিতে আজ্ঞা হউক।"

বাদশাহ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। মন্ত্রী নির্জ্জনে বসিয়া কয়েকদিন চিন্তা করিলেন। তারপর গৃহ ত্যাগ করিয়া নগর বাহিরে এক সাধুর আশ্রমে উপনীত হইলেন, এবং সাধুকে অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "আপনি দয়া করিয়া রাজসভায় একবার অমুক তারিখে দর্শন দিলে আমার বড় উপকার হয়।" সাধু কহিলেন, "রাজ-সভায় আমার কোন প্রয়োজন নাই—বিষয়ী ব্যক্তির সংসর্গে আসিতে ইচ্ছা করি না।"

মন্ত্রী কহিলেন, "আপনি যদি না যান, আমার বিশেষ অনিষ্ট হইবে, আর যদি যান, তবে আমার বড় উপকার হইবে।"

সাধু উত্তর করিলেন, "তোমার যদি উপকার হয়, তবে আমি যাইব; কিন্তু কবে, কোন্ সময়ে?"

মন্ত্রী স্থান কাল নির্দ্দেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এক নর্ত্তকীর নিকট আসিয়া তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজসভায় আসিতে আদেশ করিয়া কহিলেন, "তুমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিলে নিশ্চয় পারিতোষিক পাইবে।"

তৎপরে এক কুলীর নিকট আসিয়া তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভায় হাজির হইতে আদেশ করিলেন, পুরস্কারেরও লোভ দেখাইলেন।

তৎপরে আসিলেন, এক ধনী শেঠের নিকটে। তিনি দানশীল, পরোপকারী ও ধর্ম্মপরায়ণ। মন্ত্রী তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন তিনি যেন নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজসভায় আগমন করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

সর্ব্বশেষে মন্ত্রী আসিলেন, রাজগুরু পীর সাহেবের নিকট। তাঁহাকে কহিলেন, "আমি একটী মৃত কুকুরশাবক পাঠাইয়া দিব, আপনি ঐ শাবকটী লইয়া আগামী কল্য মধ্যাহ্নে রাজসভায় আসিয়া দর্শন দিলে আমি বড়ই উপকৃত হইব।" পীর সাহেব প্রথমে অস্বীকার করিলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে লক্ষ টাকা দিবেন জানাইলেন। পীর সাহেব তথাপি অস্বীকৃত। মন্ত্রী যখন দুই লক্ষ টাকায় উঠিলেন, তখন পীর সাহেব লোভে পড়িয়া সম্মত হইলেন। মৃত কুকুরশাবক যথাকালে প্রেরিত হইবে জানাইয়া মন্ত্রী প্রস্থান করিলেন।

পরদিবস মধ্যাহ্নে রাজসভা বসিয়াছে। বাদশাহের আগমনের পূর্ব্বেই সভাতল পূর্ণ। মন্ত্রী দেখিলেন, সাধু, নর্ত্তকী, কুলী ও শেঠ সকলেই আসিয়াছেন। রাজ-আসনের পার্শ্বে মহার্ঘ আসনের উপর রাজ-গুরু উপবিষ্ট আছেন তাহাও দেখিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলেন, মৃত শাবকটী একটা রেশমী রুমালে জড়ান তাঁহার বাহুর নীচে আছে। মন্ত্রী তখন নিশ্চিন্তমনে রাজ-আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বাদশাহ আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন; এবং মন্ত্রীর পানে চাহিয়া কহিলেন, "আজ আপনি আমার পাঁচটী প্রশ্নের উত্তর দিতে স্বীকৃত

আছেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিউন,—ইহলোকে দুঃখী, পরলোকে সুখী কে?"

মন্ত্রী তখন অঙ্গুলী-সঙ্কেতে সাধুকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই যোগী পুরুষ ইহলোকে কোন সুখভোগ করিলেন না, কিন্তু পরলোকে সুখী হইবেন।"

বাদশাহ,—ইহলোকে সুখী, পরলোকে দুঃখী কে?

মন্ত্রী,—এই নর্ত্তকী; এক্ষণে সুখ ভোগ করিতেছে, কিন্তু পরলোকে দুঃখ ভোগ করিবে।

বাদশাহ,—ইহপরলোকে সুখী কে?

মন্ত্রী,—এই ধর্ম্মপরায়ণ ধনী শেঠ। ইনি ইহলোকে পরোপকার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যেমন সুখী, পরলোকেও তেমনি সুখী হইবেন।

বাদশাহ,—আর ইহ পরলোকে দুঃখী কে?

মন্ত্রী,—এই কুলী। ইহজন্মে অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া দিনাতিপাত করে, পরজন্মেও তাই করিতে হইবে। পূর্ব্বজন্মে কোন সুকৃতি না থাকায় ইহ জন্মে এই দারিদ্র্য ও দুঃখ; আবার ইহ জন্মে কোনো সুকৃতি অর্জ্জিত হইতেছে না, সেই জন্য পরকালেও দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

বাদশাহ,—পাপ কি?

মন্ত্রী,—লোভ।

বাদশাহ,—প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত কই?

মন্ত্রী,—জাঁহাপনা আমাকে ক্ষমা করিবেন,—প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আপনার সন্নিকটে উপবিষ্ট। পীর সাহেবকে হাত দুইটী তুলিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।"

পীর সাহেব আদিষ্ট হইয়া যেমন উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত তুলিলেন, অমনি মৃত কুকুর-শাবক তাঁহার কক্ষভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল। তদ্দৃষ্টে

সভাসদ্‌গণ কেহ কেহ ধিক্কার দিয়া উঠিল, কেহ কেহ হাস্য করিল, বাদশাহ মুখ ফিরাইলেন। পীর সাহেব মহা লজ্জিত হইয়া অধোবদনে রহিলেন।

বাবা একদিন বুঝাইতেছিলেন, যে ব্যক্তি মায়ার বশীভূত, সেই বদ্ধ জীব, আর যে মায়া-রহিত, সেই স্বাধীন, ঈশ্বর-স্বরূপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ কহিলেন, কোন এক ফকির নিজেকে খোদা নামে পরিচয় দিত। কথাটা ক্রমে বাদশাহের কাণে উঠিল; তিনি বিরক্ত হইয়া, উক্ত ফকিরকে ধরিয়া আনিয়া শাস্তি দিতে কাজিকে আদেশ করিলেন। ফকির যথাকালে ধৃত হইয়া কাজির সম্মুখে বদ্ধাবস্থায় আনীত হইল। তাহার হস্তপদ রজ্জু দ্বারা দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া যখন তাহাকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করা হইল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তুমি কে?"

ফকির উত্তর করিল—"বান্দা।"

কূপ হইতে তাহাকে উঠাইয়া বন্ধনমুক্ত করত জিজ্ঞাসা করা হইল, "এখন তুমি কে?" ফকির উত্তর করিল, "খোদা।" তখন ফকিরকে আবার বাঁধিয়া কূপমধ্যে নিক্ষেপ করা হইল; বদ্ধাবস্থায় সে বলিল, "আমি বান্দা।" মুক্তাবস্থায় কহিল, আমি "খোদা।" কাজি তখন ইহার অর্থ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল, "বান্দা যো, সো বান্দা, আওর খুলা যো সো খোদা।"

কাজি ব্যাপারটি কি তখন বুঝিলেন। জীব যতক্ষণ আসক্তির বন্ধনে আবদ্ধ, ততক্ষণ সে বান্দা। আর যে আসক্তিশূন্য, সে মুক্ত, পরমেশ্বর স্বরূপ—খোদাই বটে।

তৃতীয় তরঙ্গ

বাবা আমাদের তোতা পাখী ও মর্কটের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছিলেন, জীব প্রকৃতপক্ষেই মুক্ত—সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ— সে ভ্রমান্ধ হইয়া মনে করে সে বদ্ধ। তোতা পাখী ও মর্কট প্রকৃতপক্ষেই মুক্ত, কিন্তু তাহারা নিজেদের বদ্ধ মনে করিয়া ধরা দেয়।

তোতা ও মর্কট কিরূপে ধরা দেয় জানিতে চাহিলে বাবা বলিলেন, যাহারা বন্য তোতা পাখী ধরে, তাহারা একটা সরু বাঁশের মধ্যভাগে এধার ওধার ছিদ্র করিয়া উহার মধ্যে রজ্জু চালাইয়া দেয়; রজ্জুর দুইমুখ গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা থাকে, বাঁশটীতে কয়েকটা লঙ্কা বাঁধিয়া ব্যাধ অদূরে লুকাইয়া থাকে, লঙ্কা খাইবার লোভে পাখী আসিয়া যেমন বাঁশটীর উপরে বসে, আর বাঁশটী অমনি ঘুরিয়া যায়। সেই সময় পাখী যদি বাঁশ ছাড়িয়া দিয়া পলাইয়া যায়, তাহা হইলে সকল গোল চুকিয়া যায়; কিন্তু তাহা না করিয়া তোতা মহা আতঙ্কিত হইয়া নিজের পায়ের দ্বারা বাঁশটীকে আরও অধিক আঁকড়াইয়া ধরে। তখন ব্যাধ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। এইরূপে নিজের বুদ্ধি-দোষেই তোতাটী ধরা পড়ে।

বানরও এইরূপে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার কারণে আবদ্ধ হয়। যাহারা বানর ধরে, তাহারা সরু-মুখ কলসীর মধ্যে বানরকে দেখাইয়া ছোলা কিংবা কলা রাখে এবং অদূরে অপেক্ষা করিতে থাকে। বানর আহার লোভে কলসীমধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দেয়; আহার্য্য গ্রহণ করিয়া যখন মুষ্টিবদ্ধ হস্ত বাহির করিতে চেষ্টা করে, তখন হস্ত কিছুতেই বাহির

করিতে পারে না। আহার্য্য অর্থাৎ মুষ্টি ছাড়িয়া সোজা হাত টানিয়া তুলিলেই সহজে মুক্তি মিলে, কিন্তু এ বুদ্ধি তাহাদের তখন হয় না। অধিকন্তু, তাহারা মনে করে যে কলসী তাহাদিগকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। বন্ধন-মুক্ত হইবার জন্য তাহারা ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, কিন্তু মুক্তির উপায় অনবগত। সেই অবসরে ব্যাধ আসিয়া তাহাদের ধরিয়া ফেলে।

তাই বাবা বলিতেছিলেন, জীব ত মুক্তই ; কিন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ সে মনে করে—সে আবদ্ধ। এই অজ্ঞানতা ত্যাগ করিবার একমাত্র উপায় আত্মানুসন্ধান। জীব মায়ায় আবদ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিতেছে না, সে কে। সে যে স্বয়ং ব্রহ্ম তাহা বিস্মৃত হইয়া মনে করিতেছে, আমাকে মোহ বাঁধিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই মোহকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে।

আমরা অযথা আতঙ্কিত হইয়া যে অনেক সময় বিপদের সৃষ্টি করি, ধীর ও অবিচলিত থাকিলে যে অনেক বিপদ্ আপদ্ দূর হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া বাবা একটি গল্প বলিলেন।

কোন এক বণিকের একটী সাত আট বৎসর বয়স্কা কন্যা ছিল। বালিকা দোল-পূর্ণিমার দিবস একটা ঘটিতে রং গুলিয়া তাঁহার পিতার খাটের নীচে রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রাতে উঠিয়া সেই রং লইয়া হোলি খেলিবে। কিন্তু তাহার ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই তাহার পিতা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সেই রং গোলা ঘটী লইয়া শৌচে গেল। শৌচান্তে যখন গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন দেখিতে পাইল, মৃত্তিকা রক্তরাগে রঞ্জিত। ভীত হইয়া চিন্তা করিল, "এত রক্ত যখন আমার শরীর হইতে নির্গত হইয়াছে, তখন আর আমার বাঁচিবার আশা নাই।"

অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া গৃহে ফিরিল এবং পুত্রদের ডাকিয়া কহিল, তাহার আর বাঁচিবার আশা নাই। পুত্রেরা ডাক্তার বৈদ্য ডাকিল; কিন্তু কোন ফল হইল না। ক্রমে ভয়ে তাঁ'র শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। এদিকে বালিকা যথাকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আগে তাহার রংয়ের ঘটী খুঁজিল। কোথাও না পাইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তোমার খাটের নীচে যে আমি রং গুলে ঘটী রেখেছিলাম, সেটা কোথা গেল?"

তখন বণিকের ভ্রম ঘুচিল। দেহে আর কোন রোগই অনুভব করিল না—সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল।

মানব মায়ার অধীন ও বদ্ধ সর্ব্বদা মনে করায় সে সত্যই মায়ার অধীন ও বদ্ধ হইয়া পড়ে—কিন্তু সে মায়ার অধীন নয়, সে মুক্ত জীব, সে শুদ্ধ আত্মা—এইরূপ সদা মনে করিলেই মুক্ত হইতে পারে।

বাবা বলিতেছিলেন, মনকে অনাসক্ত ও লোভবর্জ্জিত রাখিতে পারিলে ভগবানের দর্শন-লাভ ঘটিয়া থাকে। বেশভূষায় কিছু হয় না, মন লইয়াই সব; তা' তুমি গৃহেই থাক, বা পর্ব্বত-কন্দরে থাক।

সংসার-বীজং মন এব বিদ্ধি
ন পুত্রভার্য্যাদ্রবিণাদিকং হি।
সংসারনাশো মনসো লয়েন
ন তদ্ গৃহস্থাশ্রম-বর্জ্জনেন॥

অর্থাৎ—

মনেই সংসারবীজ জানিও নিশ্চয়,—
দারা-সুত-ধন-আদি নহে বীজ তার।
মনের দমনে ঘটে সংসারের লয়,—
গৃহস্থ-আশ্রম-ত্যাগে ঘুচে না সংসার॥

বাবা একদিন বলিয়াছিলেন,—

ধৈর্য্য ধর্ম্ম মিত্র ঔর নারী।
আপদ্ কালে পরখিয় চারি॥

আপদ কালেই এই চারি বস্তুর পরীক্ষা হয়।

বাবা বলিয়াছেন, বাঙ্গালার বায়ু খুব স্নিগ্ধ—জলে ভরা; সুতরাং ইহার পাচক শক্তি খুব কম। বায়ু যত জলশূন্য হইবে ততই ইহার পাচক শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মৎস্য মাংসাহারের পরিবর্ত্তে পবিত্র গোদুগ্ধ সেবন করিলে শরীরে শক্তি ও লাবণ্য দুই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বাবা আর একদিন বলিয়াছিলেন, যাহার যে স্বভাব, তাহা সে সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপ কহিলেন,—এক সাধু জলে স্নান করিতে নামিয়াছেন; সহসা দেখিলেন, একটা বিছা মৃতপ্রায় অবস্থায় জলের মধ্যে পড়িয়া আছে। তিনি তাহাকে সযতনে উঠাইয়া কূলে তুলিতে গেলেন। বিছা দংশন করিতে উদ্যত হইল। তদ্দৃষ্টে অপর এক ব্যক্তি কহিল, ওটাকে জল হ'তে উঠাবেন না—জলে ডুবিয়াই মরুক। সাধু উত্তর করিলেন, "বিছা বিপদে পড়িয়াও উহার স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে নাই, আমি কেন তবে আমার নিজ স্বভাব ত্যাগ করিব?" ইহা বলিয়া সাধু বিছাকে উপরে তুলিলেন।

বাবা আমাদের নিকট দুই বন্ধুর গল্প শুনাইলেন। এক জনের নাম গুরুমুখ, অপরের নাম মনোমুখ। দুই বন্ধুতে একদা মাঠের উপর দিয়া পথ চলিতেছিল। তখন অপরাহ্ন। গুরুমুখ বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হইল। মনোমুখ কহিল, অদূরে একটা কূপ দেখা যাইতেছে, চল সেখানে যাই। উভয়ে কূপের নিকট আসিয়া দেখিল, কূপ গভীর। জল উঠাইবার পাত্র বা দড়ি তাহাদের নাই। তখন মনোমুখ কহিল, "এক কাজ করা যাক;

তোমার মাথার পাগড়ি খুলে একধার শক্ত করে ধর, আমি তোমাকে ধীরে ধীরে কূপের ভিতর নামিয়ে দি, পরে আবার টেনে উঠাব।"

গুরুমুখ সরল ব্যক্তি; বন্ধুর কথায় বিশ্বাস করিয়া পাগড়ির এক প্রান্ত ধরিয়া কূপে নামিল। বিশ্বাসঘাতক বন্ধু, গুরুমুখকে নীচে নামাইয়া উপরে আর টানিয়া তুলিল না,—পাগ্‌ড়ি ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

ঐ কূপের নিকট এক অতি পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল, তাহার শিকড় কূপ মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ঐ শিকড় আশ্রয় করিয়া গুরুমুখ সমস্ত রাত্রি সজাগ রহিল।

ঐ বৃক্ষশাখায় এক প্রেত, ও মূলদেশে এক সর্প বাস করিত। উভয়ে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ। গভীর রাত্রিতে প্রেত তাহার বন্ধু সর্পকে বলিতেছিল, "দেখ ভাই, আমি এ দেশের রাজার মেয়েকে আশ্রয় করে বসেছি। কেহ আমাকে তাড়াতে পারেনি। রাজা কত ডাক্তার, বৈদ্য, রোজা ডেকেছে, কিন্তু কেউ কিছু কর্‌তে পারেনি। একটা মন্ত্র আছে, সেইটে বল্‌লেই মেয়েটাকে ছেড়ে আমাকে পালাতে হয়।"

সর্প জিজ্ঞাসা করিল, "সে মন্ত্রটা কি ভাই?"

প্রেত তাহা বলিয়া দিল। সর্প তখন বলিল, "এই মাঠে ঐ যে একটা ইটের স্তূপ আছে, ঐখানে অগাধ ধনরাশি মাটীর নীচে লুকান আছে; আমি সেই ধনরাশির রক্ষক। আমি থাকৃতে কাহারও সাধ্য নেই, সেই রত্নে হাত দেয়।"

প্রেত জিজ্ঞাসা করিল, "কি কর্‌লে তোমাকে তাড়াতে পারা যায়?"

সর্প উত্তর করিল, "একটা মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্র যদি কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে বলে, তাহলে আমাকে সে গুপ্তধন ছেড়ে পালাতে হয়।" মন্ত্রটা কি তাহাও সর্প জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিল।

গুরুমুখ সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিয়া রজনী-প্রভাতের অপেক্ষা করিল। একটু বেলা হইলে, সন্নিকটস্থ পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত আরম্ভ করিল। গুরুমুখ তখন চীৎকার করিয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। কয়েকজন পথিক গুরুমুখের চীৎকার শুনিতে পাইয়া কূপমুখে ছুটিয়া আসিল এবং অবিলম্বে তাহাকে সমূহ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিল।

গুরুমুখ তখন বস্ত্রাদি শুষ্ক করিয়া লইয়া রাজ-দর্শনে গমন করিল। নিজেকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া রাজ-কুমারীকে রোগমুক্ত করিবার স্পর্দ্ধা জানাইল। রাজা কহিলেন, "দেখিতেছি, তুমি অল্পবয়স্ক যুবক; চিকিৎসাশাস্ত্রে তোমার কতদূর ব্যুৎপত্তি তাহা জানি না। যদি তুমি আরোগ্য করিতে পার, তবে এই কন্যাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিব; আমার আর কোন সন্তান নাই, ভবিষ্যতে তুমিই রাজ্যাধিকারী হইবে। আর যদি আরোগ্য করিতে না পার, তাহা হইলে জল্লাদ-হস্তে তোমাকে প্রাণ দিতে হইবে। এই সর্ত্তে সম্মত আছ?"

গুরুমুখ স্বীকৃত হইল। রাজকুমারী তাহার দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া একদিনেই আরোগ্য লাভ করিলেন। রাজা প্রসন্ন হইয়া মহা-সমারোহে শুভদিনে গুরুমুখের হস্তে কন্যাদান করিলেন। জামাতার বাসের জন্য প্রাসাদের সন্নিকটে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। গুরুমুখ পত্নীসহ তথায় মহাসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে যখন সুখে দিন কাটিতেছিল, তখন মনোমুখ একদিন আসিয়া বন্ধুর গৃহে অতিথি হইল। মনোমুখ শুনিয়াছিল, তাহার বন্ধু এক্ষণে রাজ-জামাতা হইয়াছে; কিছু প্রাপ্তির আশায় এক্ষণে বন্ধুত্ব জানাইতে আসিল। সরলপ্রাণ উদারহৃদয় গুরুমুখ বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা বিস্মৃত হইয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং কয়েকদিন আদর যত্নে ও উপঢৌকনে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন। মনোমুখ পাইল

অনেক—যাহা আশা করে নাই তাহাও সে পাইল; কিন্তু তাহার যে স্বভাব, তাহা সে ত্যাগ করিতে পারিল না—দংশন করিল—বিদায় লইয়া রাজধানীতে প্রচার করিয়া গেল, রাজ-জামাতা একজন ভাঙ্গি (মেথর)।

এ সংবাদ অচিরে রাজার কানে উঠিল। তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া জামাতাকে দূরে রাখিলেন। তিনি প্রত্যহ জামাতার সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিতেন, এক্ষণে জামাতার আহারের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র করিলেন। তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির হস্তে কন্যা সম্প্রদান করা তাঁহার উচিত হয় নাই; কিন্তু তিনি ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না যে, এরূপ সুদর্শন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কখন নীচ-কুলোদ্ভূত হইতে পারে না।

যাহা হউক, রাজার এই ভাবান্তর গুরুমুখ লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। রাজ-কুমারীর নিকটেও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিন্তু বেশীদিন এ কথা চাপা রহিল না,—জনৈক অনুচরের মুখে সমস্ত শুনিলেন। মনোমুখ বন্ধুরূপে আসিয়া পুনরায় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে জানিয়া তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা জানিয়াও কেন মনোমুখ এরূপ মিথ্যা অপবাদ রটাইল? তিনি তৎক্ষণাৎ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা যদিও বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন, তথাপি জামাতার কথা তাঁহাকে শুনিতে হইল। জামাতা কহিলেন, "আপনি অযথা আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন। আমি আপনার দৃষ্টিতে অজ্ঞাতকুলশীল বটে, কিন্তু আমি বংশমর্য্যাদায় কাহারও অপেক্ষা হীন নই। আমার পূর্ব্বপুরুষের অগাধ ধনরাশি মৃত্তিকা নিম্নে লুক্কায়িত আছে। এত ধন আছে, রাজার ধনাগারে অত রত্ন আছে কি না সন্দেহস্থল। আমি সেই ধন লইয়া

এক ক্ষুদ্র রাজ্য গঠিত করিতে পারিতাম, কিন্তু আপনার স্নেহে আমি আবদ্ধ। বিশ্বাস করুন, আমি সদ্‌বংশজাত।"

গুরুমুখের প্রতি রাজা প্রসন্ন হইলেন; কিন্তু সন্দেহকে সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে গুরুমুখ ও লোকজন লইয়া সেই বিস্তৃত ময়দানে অশ্বারোহণে গমন করিলেন। বিশাল অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ দৃষ্ট হইল। রাজা তথায় গমন করিয়া জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ স্থানে রত্নাদি প্রোথিত আছে?"

গুরুমুখ তাহা জানেন না; তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন, যে স্থানে সর্পকে দেখা যাইবে, সেই স্থানেই রত্ন প্রোথিত থাকা সম্ভব। প্রকাশ্যে কহিলেন, "আমি ঠিক জানি না, পুরুষানুক্রমে বিবরণ শুনিয়া আসিয়াছি—সত্বরই স্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব।"

স্তূপমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে উভয়ে এক স্থূলদেহ দীর্ঘাকার সর্প দেখিতে পাইলেন। সর্প বিশাল ফণা উদ্যত করিয়া আক্রমণোদ্যত হইল। রাজা সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইলেন; গুরুমুখ না হটিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন। সর্প ফণা নামাইয়া সরিয়া গেল এবং সত্বর অদৃশ্য হইল।

যে স্থানে সর্প ছিল, সেই স্থানে খননকার্য্য আরম্ভ হইল। মাটী কাটিতে কাটিতে একটা বড় ঘরের দ্বার দেখা গেল। দ্বার ভাঙ্গিতেই দৃষ্ট হইল, কক্ষময় ধনরত্নের স্তূপ। রাজা অত্যন্ত পুলকিত হইয়া জামাতাকে আলিঙ্গন করিলেন। অবশেষে সেই বিশাল ধনরাশি বাহিত হইয়া কয়েকদিনের মধ্যে রাজ-কোষাগারে রক্ষিত হইল। সমুদায় রত্ন, কন্যা-জামাতার জন্য সঞ্চিত রহিল; ইহাই সকলকে জানাইলেন। রাজা দীর্ঘকাল কন্যা-জামাতা লইয়া সুখে অতিবাহিত করিয়া অবশেষে দেহত্যাগ করিলেন। গুরুমুখ তখন সিংহাসনে বসিলেন।

গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, ভাগ্য বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন সে বিপদের মধ্য দিয়া ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে টানিয়া আনিয়া তাহার উপর সুখ-শান্তি অর্থ বৃষ্টি করে। মনোমুখের মত শত শত ব্যক্তিও বাধা জন্মাইতে পারে না। প্রারব্ধ সকল ক্ষেত্রে বলবান্। এই প্রারব্ধই ভাগ্য।

বাবা বলিলেন, সাধক যে সঙ্কল্প লইয়া ভগবানের দ্বারে প্রার্থী হয়, ভগবান্ সেই সঙ্কল্পানুযায়ী ফল তাহাকে দান করিয়া থাকেন। কোন এক স্থানে এক রাজপুত্র ও তাঁহার তিন বন্ধু সঙ্কল্প করিলেন যে, তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু হইবেন। কে কি নিমিত্ত সাধু হইবেন তাহা তাঁহারা আপোষে ঠিক করিয়া লইলেন। প্রথম যুবক কহিলেন, আমি এই নিমিত্ত সাধু হইতে চাই যে, সাধু হইলে বহু সুখ,—কত সুন্দর সুন্দর খাদ্য উদর পূর্ত্তি করিয়া খাইতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ব্যক্তির বাসনা, উত্তম বস্ত্রাদি প্রাপ্তি। তৃতীয় যুবক কহিল, সাধু হইলে নিত্য কত শত ব্যক্তির দর্শন লাভ হয়। রাজপুত্র এ সব কিছুই চান না—তাঁহার সব আছে, তবু তাঁহার প্রাণে তৃপ্তি নাই। তিনি চান শাশ্বত সুখ, যে সুখের লালসায় বহু পদস্থ ব্যক্তি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি চাই শাশ্বত সুখ—চাই ভগবান্‌কে।

চারি জনে মন স্থির করিয়া এক যোগীর শরণাপন্ন হইলেন। যোগিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে কি চাও? তাঁহারা নিজ নিজ ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। যোগী তখন প্রথম ব্যক্তিকে তাঁহার ভাণ্ডারের কর্ত্তৃত্ব দিয়া কহিলেন, আশ্রমে যত প্রকার খাদ্যাদি প্রস্তুত হইবে তুমি তাহা পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কহিলেন, আমার নিকট যত নূতন বস্ত্র আসিবে তুমি তাহা হইতে নূতন বস্ত্র সকল

ইচ্ছামত লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবে। তৃতীয় ব্যক্তিকে কহিলেন, যে কেহ আমার দর্শনপ্রার্থী হইয়া আসিবে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আমার নিকট তুমি লইয়া আসিবে। আর ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী রাজপুত্রকে নিজের কাছে রাখিয়া সাধন-ভজন শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল। যোগিবর একদা দেশ-ভ্রমণের ইচ্ছা করিয়া শিষ্য-চতুষ্টয়কে কহিলেন, আমি কিছুকালের জন্য বাহিরে যাইতেছি। একটী গাছের বীজ আমি তোমাদিগকে দিয়া যাইতেছি, তোমরা ইহা আশ্রমে লাগাইবে এবং অঙ্কুরিত হইলে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। পরে ঐ বৃক্ষে চারিটি ফল ধরিবে। তখন তোমরা চারিজনে নিয়মিতরূপে পাহারা দিবে এবং যাহার পাহারার সময় যে ফলটী বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িবে, সে সেই ফলটী ভোজন করিবে।

যোগিবর এইরূপ উপদেশ দিয়া আশ্রম ত্যাগ করিলেন। শিষ্য-চতুষ্টয়, গুরুদেবের আদেশানুযায়ী আশ্রমমধ্যে বীজ রোপণ করিল এবং অত্যধিক যত্ন করিতে লাগিল এবং পালা করিয়া সতত তাহার প্রহরায় নিযুক্ত রহিল। বৃক্ষটী দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া শাখা-পত্রে সুশোভিত হইল এবং চারিটী ফল ধারণ করিল। একদা রাজপুত্রের প্রহরার সময় একটী ফল পড়িল ; রাজপুত্র তাহা ভোজন করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইল, অর্থাৎ দুর্ব্বাসনার নিবৃত্তি হইল। অপর তিনটী ফলও একে একে রাজপুত্রের প্রহরার সময় বৃক্ষচ্যুত হইল; তিনি তাহাও ভোজন করিলেন। দ্বিতীয় ফল সেবা করায় রাজপুত্র লাভ করিলেন,—যম, নিয়ম, আসন, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ; তৃতীয় ফল সেবনে, ঋদ্ধি সিদ্ধি ও সবিকল্প সমাধি লাভ করিলেন ; চতুর্থ ফল সেবনে নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইলেন।

অপর তিন ব্যক্তি দেখিলেন, রাজপুত্র চারটী ফলই সেবা করিলেন

এবং তন্নিমিত্ত বহু শক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা ঈর্ষান্বিত হইয়া বহু অনুযোগ করিলেন। রাজপুত্র উত্তর করিলেন, "আমার উপর অকারণে তোমরা বিরক্ত হইয়াছ। গুরুদেবের আদেশ প্রতিপালনই করিয়াছি—যদি তদতিরিক্ত কিছু করিয়া থাকি, আমাকে শাস্তি দেও। আমাদের বিচারকর্ত্তা গুরুদেব—তাঁহার নিকট তোমরা অভিযোগ কর। স্মরণ করিলে তিনি না আসিয়া থাকিতে পারেন না—এস আমরা তাঁহাকে ডাকি।"

রাজপুত্রের ঐকান্তিক আহ্বানে যোগিবর আশ্রমে আসিয়া দর্শন দিলেন। শিষ্যবৃন্দ প্রণামান্তে তাঁহার নিকই বিচারপ্রার্থী হইল। যোগী কহিলেন, "ইহা ঠিকই হইয়াছে। তোমরা যে যে বাসনা লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলে, তোমাদের সেই সেই বাসনা সিদ্ধ হইয়াছে কিনা তোমরাই বিচার করিয়া দেখ।"

শিষ্যবৃন্দ নিরুত্তর হইল।

বাবা আমাদের বুঝাইয়া দিলেন, এই যোগী হইতেছেন ভগবান; সাধক তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে তাহাই দেন।

শ্রীমৎ হুজুরানন্দ অবধূতজী বলিলেন, একদা শ্রীরামচন্দ্র, বশিষ্ঠজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোন্ উপায় দ্বারা মনকে বশে আনা যায়?

বশিষ্ঠজী উত্তর করিয়াছিলেন, "চারি উপায় দ্বারা, যথা,—ব্রহ্মবিদ্যা, সাধুসঙ্গ, নির্ব্বাসনা, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ।"

চতুর্থ তরঙ্গ

বাবা, ভক্তের আহ্বান এড়াইতে পারিলেন না,—তাঁহাকে জলপাই-গুড়ি যাইতে হইল। ১৭ই বৈশাখ যাত্রার দিন স্থির। রাত্রি ১টার সময় রওনা হইয়া নাটোরে রেল ধরিতে হইবে। বাবা প্রস্তুত—সকল সময়েই তিনি প্রস্তুত। তাঁহার একটী ঝাঁপি আছে, তাহাতে কিছু ঔষধ আর কিছু বস্ত্র। একটা দড়িবাঁধা পাথরের লোটা, আর একটা তিন হাত লম্বা কাঠের বৃহৎ লাঠি। এই নূতন লাঠিটির নাম শক্তিশেল—ত্রিপুরা-মহারাণী-প্রদত্ত। ইহা সাধারণ কাঠের নয়, ইহার গুণও অনেক,—যে গৃহে এই লাঠি থাকে, সে গৃহে নাকি সর্প আসিতে পারে না।

যাই হউক, বাবা লাঠি ও ঘটি লইয়া মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত। দ্বারে মোটর প্রস্তুত; বহু ভক্ত বাবাকে প্রণাম করিতে দণ্ডায়মান, অনেকেরই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত। বাবা সকলকে আশীর্ব্বাদ ও হরিহর জানাইয়া রাত্রি ১টার সময় বিদায় লইয়া মোটরে উঠিলেন। গাড়ী সত্বর অদৃশ্য হইল। আমরা তখন ভাবিলাম, বাবা আর কি কখন এ গৃহ পবিত্র করিতে আসিবেন না?

বাবাকে বিদায় দিয়া আমি ছাদে উঠিলাম। জ্যোৎস্না-পুলকিত চতুর্দ্দশী নিশা। চারিদিক্ প্রফুল্ল, কিন্তু আমার মন অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

আমার মনে হইল, দূরে যেন এক অত্যুচ্চ পাহাড়, আর সেই পাহাড়ের মাথায় এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কত দীর্ঘ দিবস তিনি একই ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া মনে হইল।

তাঁহার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই—তিনি নির্বাত নিষ্কম্প—পাহাড়ের ন্যায় অচল অটল অচঞ্চল অবিকম্পিত—কত যুগ-যুগান্তর তাঁহার মাথার উপর বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি শীত গ্রীষ্মের অতীত, বাসনা-কামনা শূন্য, অনুভবশক্তি-বর্জ্জিত। পাহাড়-পদতলে বহু নরনারী নিয়ত কোলাহল করিতেছে, পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিতেছে, হিংসাদ্বেষতাড়িত চিত্তে অবিরাম কলহ করিতেছে; কিন্তু মহাপুরুষ নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প। তিনি ব্যোম বিদারণ করিয়া বলিতেছেন,—

যাহা করিবার তাহা করিয়াছি
আর কিছু করিতে চাই না।
যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি
আর কিছু জানিতে চাই না।
যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি,
আর কিছু পাইতে চাই না। *

ভাবিলাম, ইনিই কি মুক্ত পুরুষ! মোক্ষ কি এই অবস্থাকেই বলে! গুরুদেব, আমাকে শিখাও, আমাকে গ'ড়ে লও, আমাকে পথ দেখাও।

---

* লিখিত আছে ভগবান গৌতম বুদ্ধ এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন।

পঞ্চম তরঙ্গ

বাবা দিন দুই জলপাইগুড়িতে অবস্থান করিয়া দার্জ্জিলিং, কালিম্‌পং প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিলেন। দার্জ্জিলিং বা দুর্জ্জয়লিঙ্গে আমার বড় দিদির * (বড়মা'র) 'গিরিবিলাস' নামে এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা আছে; বাবাকে তথায় অবস্থান করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা হইয়াছিল। বাবা স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু আমার স্বামীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ২১শে জ্যৈষ্ঠ কয়েক ঘণ্টার জন্য তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বাবা যে সময় দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা ঘুরিয়া যশিডিতে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময় বড়দিদি পত্রে ও 'তারে' পুনঃ পুনঃ বাবাকে অনুরোধ করিলেন, একবার তাঁহার গৃহে দীঘাপতিয়ায় পদার্পণ করিতে হইবে। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু বাবা কাহাকেও মনোব্যথা দিতে ইচ্ছা করেন না,—তিনি দীঘাপতিয়ায় আসিলেন। সে দিন ২৩শে জ্যৈষ্ঠ। আমরা তার দুই দিন আগে বড়দিদির অনুরোধে দীঘাপতিয়ায় গিয়াছিলাম।

বাবা রাজ-প্রাসাদে বাস করিলেন না। দীঘির তীরে এক হাওয়া-খানা আছে, বাবা তথায় রহিলেন। এই হাওয়াখানার তিন দিকে জল—স্বচ্ছ ও গভীর—বাবা এই স্থান পছন্দ করিলেন। শ্রীমান্ কুমার † প্রতিভানাথ (রাজা প্রমদানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র) সকল সময়ে বাবার নিকটে থাকিয়া স্বহস্তে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্ণে আমরা অবধূত হুজুরানন্দজীকে ধরিলাম—তাঁহার জীবনের কোন ঘটনা আমাদিগকে শুনাইতে হইবে। অবধূতজী স্বভাবতঃই

* দীঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথের স্ত্রী, রাণী শ্রীমতী গিরিজাকুমারী।
† এক্ষণে রাজা।

গম্ভীর ও অল্পভাষী। তিনি দেখিলেন, গল্প না বলিলে তাঁহার পরিত্রাণ নাই। সুতরাং তাঁহার জীবনের একটী ঘটনা ব্যক্ত করিলেন।

তিনি সে সময় কৌপীন ব্যতিরিক্ত কোন বস্ত্র পরিধান করিবার অধিকার পান নাই। কেবল অবধূত-অবস্থা লাভের জন্য কৌপীন সম্বলে তাঁহাকে দ্বাদশ বর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। সেই সময় একদিন পাঞ্জাবে তিনি কোন শ্মশানের সন্নিকটে এক উন্মুক্ত স্থানে রাত্রি অতিবাহিত করিতেছিলেন। সহসা দেখিলেন, অদূরে এক মায়ী শ্মশানক্ষেত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কি করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এই অন্ধকার রাত্রিতে শ্মশানে স্ত্রীলোক একাকী কেন? ইনি কি সত্যই মনুষ্য? কৌতূহলী হইয়া অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, বস্তুতঃই একটী স্ত্রীলোক অগ্নি-সাহায্যে রোটী তৈয়ার করিতেছে। ঐ দেশে এই প্রথা ছিল যে, কোন স্ত্রীলোকের উপযুক্ত বয়সে সন্তানাদি না হইলে সন্তানের নিমিত্ত অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে এই ভাবে তাহাকে শ্মশানে আসিয়া রাত্রিকালে রোটী প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে হইবে। অবধূতজী বোধ হয় ক্ষুধার্ত্ত ও অভুক্ত ছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া একখানি রোটী ভিক্ষা করিলেন। হঠাৎ তাঁহার দীর্ঘাকার কৌপীন-পরিহিত মূর্ত্তি চুল্লীর অস্পষ্ট আলোকে দেখিবামাত্র স্ত্রীলোকটি ভূত মনে করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে অবধূতজী ভীত হইলেন; আশঙ্কা করিলেন, রমণীর কোন পুরুষ অভিভাবক অদূরে প্রচ্ছন্নভাবে নিশ্চয়ই অবস্থান করিতেছে, সে আসিয়া কোন গণ্ডগোল করিয়া বসিবে। তাই তিনি আর সেখানে তিলার্দ্ধকাল অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন এবং অন্ধকার মধ্যে সত্বর অদৃশ্য হইলেন।

অবধূতজী পর দিবস গ্রামে অনুসন্ধান লইয়া সেই রমণীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। রমণী তখনও ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে-ছিলেন। অবধূত তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত ও সুস্থ করিলেন।

অবধূতজী বলিলেন,—ভূতযোনির অস্তিত্ব থাকিলেও শুদ্ধ ব্যক্তির তাহা হইতে কোন ভয়ের কারণ নাই। সাধুবাবাও একদিন কথা-প্রসঙ্গে এইরূপই উপদেশ দিয়াছিলেন। বাবা আরও বলিলেন, যে গৃহে কলহ নাই, যথায় নিত্য ভগবৎপ্রসঙ্গ হয় ও যথায় শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি বাস করে, তথায় প্রেত তিষ্ঠিতে পারে না।

এখন ত আমরা আনন্দে দিন কাটাইতেছি, কিন্তু যখনই মনে হইতেছে বাবা তিনদিন মাত্র থাকিয়া যশিডি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখনই অন্তর বিষণ্ণ হইয়া উঠিতেছে। বাবাকে আরও কয়েক দিন থাকিবার জন্য আমরা সকলে মিলিয়া ধরিলাম ; কিন্তু বাবা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বলিলেন, কয়েকজন সাধু তাঁহার প্রতীক্ষায় কৈলাসে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা বাবাকে কৈলাসে ফিরিবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছেন, বাবা পথে আর কোথাও বিলম্ব করিতে পারেন না। দুইখানা পত্রও আমাদের পড়িয়া শুনাইলেন। একখানায় লেখা আছে,—

> "লছমীপতিকে কর বিখে পাঁচ বরণ যো নাম।
> আদি অক্ষর ছোড়্‌কে বঁচে সে দিজে আন্‌॥"

অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর হস্তে যে পাঁচ অক্ষর যুক্ত সুদর্শন চক্র রহিয়াছে, উহার প্রথম অক্ষর ছাড়িয়া দিলে অবশিষ্ট চার অক্ষর থাকে, তাহাই আমি প্রার্থনা করি। অর্থাৎ কৃপা করিয়া 'দরশন' দেও।

অপর একখানি পত্রে,—

"হোবে শিব কৈলাসমে তব্ শোভতে কৈলাস।
শুন মিত চল্‌তে সমে চিত হামারে হোতো উল্লাস ॥"

অর্থাৎ শিব যদি কৈলাসে রহেন, তবেই কৈলাসের শোভা। হে মিত্র, আমরা চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে যদি তোমার দর্শন পাই, তবে বহুৎ আনন্দ লাভ হয়।

সুতরাং বাবার মন কৈলাসের দিকে ছুটিয়াছে। কলিকাতাতেও দুই তিন দিন বিলম্ব হইতে পারে, সেখানেও ত দু'দশ জন দর্শনপ্রার্থী ভক্ত অপেক্ষা করিতেছে।

বাবা আমাদের বিষণ্ণ অন্তরকে প্রফুল্ল করিবার অভিপ্রায়ে এক তোতা পাখীর গল্প বলিলেন,—

কোন এক রাজার গৃহে একদা এক সাধু আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক সুন্দর তোতা পাখী ছিল; সাধু তাহাকে যত্নপূর্ব্বক স্তব স্তোত্র গীতা শিখাইয়াছিলেন। পাখীর মুখে গীতা, ভাগবত শুনিতে রাজার বড় ভাল লাগিত। সাধু কয়েক মাস অবস্থানানন্তর বিদায়-কালে রাজাকে তোতা পাখীটি দিয়া গেলেন। পাখীটি রাজার বড় প্রিয় ছিল; তিনি সর্ব্বদা তাহাকে কাছে রাখিতেন ও তাহার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিতেন।

রাজার একটী রক্ষিতা স্ত্রীলোক ছিল। সে শুনিল, রাজা এই পাখীটিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন ও তাহার মুখে অনেক তত্ত্বকথা শ্রবণ করেন। বেশ্যার অন্তরে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল; আশঙ্কাও হইল, ইহার মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া রাজার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে পারে; তাহা হইলেই ত তাহার কপাল ভাঙ্গিল।

এক দিবস নৃত্য-গীতে রাজাকে পরিতুষ্ট করিয়া বেশ্যা, রাজার নিকট হইতে পাখীটি পুরস্কার-স্বরূপ প্রার্থনা করিল। রাজা ভাবিলেন, হয়ত

সে, পাখীটিকে সেবা যত্ন করিতে ইচ্ছা করে। যাই হউক তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রিয় পাখীটিকে দান করিলেন।

বেশ্যা প্রথম সুযোগে দাসীকে কহিল, পাখীটিকে লইয়া গিয়া এখনই হত্যা কর। দাসী পাখীকে লইয়া শিবমন্দিরে গেল। সেই স্থানই নিভৃত, মধ্যাহ্নে জনসমাগম তথায় বিরল। মন্দিরে আসিয়া দাসীর মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ভাবিল, এই পবিত্র স্থানে জীব-হত্যা করিব! পাখীটিকে না মারিয়া তাহার ডানা পালক ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রস্থান করিল এবং কর্ত্রীর নিকট জানাইল তাহাকে মারিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

এদিকে তোতা ভগ্ন পক্ষ লইয়া উড়িতে সমর্থ হইল না। যে স্থান দিয়া শিবের স্নানজল বাহিরে আসিয়া পড়ে, সেই স্থানে অতি কষ্টে হাঁটিয়া আসিল এবং স্নানজল পান করিল; কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলে সেই পথ দিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মহাদেবের পূজার তণ্ডুল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহা খাইল; গঙ্গাজলও পান করিল। তখন মন্দিরের এক কোটরের মধ্যে উঠিয়া রাত্রিযাপন করিল।

এইরূপে কয়েকদিন কাটিল। পাখীটি ক্রমে সুস্থ হইল। একদিন সেই বেশ্যা মহাদেবকে পূজা দিতে আসিল। যখন সে শিবকে প্রণাম করিয়া উঠিতেছে, তখন তোতা অদৃশ্য থাকিয়া কহিল, বর গ্রহণ কর। বেশ্যা মনে করিল, মহাদেব বুঝি তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বর গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছেন; তাই সে মহা পুলকিত চিত্তে কহিল, "প্রভু যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর দান করুন, রাজা যেন চিরদিন আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, কখন যেন অসন্তুষ্ট না হ'ন।"

উত্তর হইল,—"তাই হবে; কিন্তু এজন্য তোমাকে একদিন কিছু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে; সম্মত আছ?"

"আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিব।"

"তোমাকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া গাধার উপর বসিতে হইবে—মুখে আল্‌কাৎরা মাখিবে—সমস্ত দেহ নগ্ন থাকিবে—এইভাবে নগর প্রদক্ষিণ করিতে হইবে—সঙ্গে এক ব্যক্তি বাদ্যধ্বনি করিতে করিতে যাইবে এবং বাদ্যে আকৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিতে হইবে।"

"প্রভুর আদেশ বড় কঠিন।"

"কষ্ট স্বীকার না করিলে সিদ্ধি লাভ হয় না। তুমি স্বীকার কর উত্তম, না কর, শীঘ্রই রাজ-প্রীতি হারাইবে।"

বেশ্যা তখন স্বীকৃত হইয়া গৃহে আসিল। পরদিবস প্রভাতে মস্তক মুণ্ডন করত সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করিল এবং মহাদেব তথা পক্ষী কর্ত্তৃক যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছিল সেইরূপ করিল। বাদ্যধ্বনিতে আকৃষ্ট ও মিষ্টান্নে প্রলুব্ধ হইয়া বহু ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে আসিল। প্রাসাদের সন্নিকট দিয়া যখন সে বাজনা বাজাইয়া যাইতেছিল, তখন রাজার কাণে ঐ জনকোলাহল ও বাদ্যধ্বনি পৌছিল। রাজা কৌতূহলী হইয়া জনৈক প্রহরীকে ব্যাপার কি জানিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। প্রহরী দেখিয়া আসিয়া লজ্জায় অধোবদন রহিল—রাজাকে সহসা কিছু বলিতে পারিল না। রাজা পুনঃ পুনঃ আদেশ করাতে প্রহরী তখন সকল কথা খুলিয়া বলিল। রাজা তখন ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন, "সে মাগীটাকে আর যেন বাগান বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয়।" রাজ-আজ্ঞা তৎক্ষণাৎ যথাস্থানে প্রেরিত হইল।

এদিকে নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকটা শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহে অপরাহ্ণে যখন গৃহে

ফিরিল, তখন সচকিতে দেখিল গৃহদ্বার রুদ্ধ—প্রহরী তাহাকে প্রবেশ করিতে দিল না। তাহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। সে কাঁদিয়া ভাসাইল। কিন্তু উপায় নাই। তখন সহসা মহাদেবের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। সে ছুটিয়া মন্দিরে গেল এবং দ্বারে মাথা কুটিয়া কাতরভাবে মহাদেবকে তাহার বেদনা জানাইল।

সেই সময় তোতা এক বৃক্ষশাখায় বসিয়া কহিল,—

শঠং প্রতি শাঠ্যং কুর্য্যাৎ
সারল্যং সরলং প্রতি।
ত্বয়া মে মুণ্ডিতং পক্ষং
ময়া তে মুণ্ডিতং শিরঃ॥

অর্থাৎ—শঠতা শঠের প্রতি করিবে সাধন,—
অকপট সরলতা সরলে বিহিত।
তুমি মোরে পক্ষহীন করিলে যেমন,
আমি তব শির তথা করিনু মুণ্ডিত॥

২৫শে জ্যৈষ্ঠ অরুণোদয়ে আমরা সকলে উঠিয়া বাবাকে প্রণাম করিলাম। এই দিন প্রভাতে শ্রীমান্ প্রতিভানাথ বাবার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, এই দিন রাত্রিতে বাবা দীঘাপাতিয়া ত্যাগ করিবেন। বড়দিদি মহাব্যস্ত, প্রতিভা চঞ্চল। দিদি ব্যস্ত—বাবার সেবা লইয়া—প্রতিভা চঞ্চল নবজীবনের দ্বারে দাঁড়াইয়া। দিদিও একদিন প্রয়াগ-ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ সাধুর মধ্যে দীক্ষা-লাভাশায় গুরু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং বিফল-মনোরথ হইয়া অবশেষে কৈলাসে আসিয়া কাতরভাবে বাবারই চরণে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন। বাবা তাঁহাকে নিরাশ করেন নাই—কৃপাপূর্ব্বক দীক্ষা দিয়াছিলেন। বাবার জনৈক

বাঙ্গালী শিষ্য একদা দিদিকে বলিয়াছিলেন, "দিদি আগে ছিলেন রাণী, এখন হয়েছেন দেবী।" বস্তুতঃই তাই।

বাবা প্রতিভানাথের ব্যগ্র প্রার্থনায় অদ্য তাহাকেও সস্ত্রীক দীক্ষা দিলেন।

শুনিলাম, বাবা নাকি জলের উপর ভাসিতে পারেন। কিরূপে ভাসেন দেখিবার নিমিত্ত আমরা ব্যস্ত হইয়া বহির্বাটীর ঘাটে ছুটিলাম। গিয়া দেখিলাম, বাবা পদ্মাসন করিয়া বসিয়া মাথার উপর হাত দুইটী তুলিয়া, আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া চিৎ হইয়া জলে ভাসিতেছেন। বহুক্ষণ ভাসিলেন। বলা বাহুল্য, হস্তপদের সঞ্চালন নাই। নিশ্বাস-ত্যাগের সময় দেহ একটু নামিয়া গিয়া অর্দ্ধেক মাত্র জলের উপর অবস্থান করিতেছিল; প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার সময় দেহ আবার উঠিয়া পড়িয়া বারো আনা বা ততোধিক অংশ জলের উপর দেখা যাইতেছিল। সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল, বিশাল বক্ষঃ উদর সকল সময়ে জলের উপর ভাসিতেছিল। আমরা দেখিতে লাগিলাম—আগ্রহপূর্ণ নয়নে সেই জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে দেখিতে লাগিলাম। জলের মধ্যে সেই হিরণ্ময় বপুর শোভা চতুর্দ্দিক যেন আলোকিত করিতেছিল। স্মরণ হইল ১৩৩৬ সালের শ্রাবণ পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজও তাঁহার আশ্রমস্থ 'নর্ম্মদাকুণ্ডে' বহুক্ষণ এইরূপ ভাসিয়াছিলেন। তাঁহারও সেদিনের সেই তেজঃপূর্ণ কান্তি চিত্তে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

তিন দিন মাত্র দীঘাপতিয়ায় অবস্থান করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে বাবা কৈলাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুরী আবার নিবিয়া গেল। তিন দিনের জন্যে যে আলোক-প্রভায় রাজপুরী উজ্জ্বল হইয়াছিল, আজ তাহা নিবিয়া গেল; যে বেদ-বেদান্ত-প্রণব-মন্ত্রে গৃহ সতত মুখরিত হইত, আজ তাহা নীরব হইল।

তখন বুঝিলাম মানব-আত্মা কি চায়। আত্মা চায় না ভোগ-বিলাস বিভব ঐশ্বর্য্য, আত্মা চায় আত্মাকে—নিজেকে দেখিতে চিনিতে ভালবাসিতে। আমাদের তাহাই বুঝি দেখাইতে চিনাইতে আসিয়াছিলেন—এক ফকির, এক নিঃসম্বল কৌপীনধারী, এক মহামহিমময় রাজ-রাজেশ্বর। তিনি বিদায়কালে যেন আমাদিগকে বলিয়া গেলেন,—

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তি র্ন ভীতি-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥

ষষ্ঠ তরঙ্গ

তার ঠিক চার মাস পরে আবার বাবাকে দেখিলাম। সেবার বাবা গিয়াছিলেন আমাদের দেখিতে, এবার আমরা আসিলাম বাবাকে দেখিতে। পূজার বোধন বসিয়াছে, কিন্তু পূজার বাদ্য তখনও বাজিয়া উঠে নাই। আমরা এমনি দিনে কৈলাসে আসিয়া বাবার চরণে প্রণাম করিলাম।

এবার বোধ হয় বাঙ্গালাদেশ ভ্রমণ করিবার ফলে গত আষাঢ় মাসের মাঝে বাবা ম্যালেরিয়ায় বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়েন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিবে বিবেচনায় বাবা তাঁহার ব্যাধির সংবাদ বাহিরে কাহাকেও দিতে দেন নাই। শুনিলাম সন্তরামজী প্রমুখ বাবার অন্তরঙ্গ সাধুবৃন্দ এবং ভগ্নীস্বরূপা সুসঙ্গের রাণী সুরমা দেবী অতি যত্নের সহিত

তৎকালে বাবার সেবা করিয়াছিলেন। বাবার ভক্ত ও শিষ্য সুরাটের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত জমিয়তরাম 'তারে' আহূত হইয়া আসিয়াছিলেন এবং মাসাধিক কাল অক্লান্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক বাবার চিকিৎসা ও সেবা করেন। আমরা আশ্বিনের শেষে যখন যশিডিতে আসিলাম, তখন বাবার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। বাবার উজ্জল কান্তির সামান্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল।

সে দিন দ্বৈত অদ্বৈতবাদ লইয়া কথা উঠিল। শঙ্করের নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের কথা উঠিলে বাবা বলিলেন,—

দ্বৈতাদ্বৈত বস্তুগত খালি খেঁচা তান্।
সকল ব্যবস্থা স্বপনমে জাগে মৌন মোকাম॥

অর্থাৎ দ্বৈত অদ্বৈতবাদ লইয়া যে বিবাদ, এ কেবল অজ্ঞানতা হেতু। প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে সকলের মধ্যে এক ব্রহ্মই প্রতীতহইয়া থাকেন। যেমন স্বপ্নাবস্থায় নানারূপ স্বপ্নদর্শন হয়, নানা কলরব শ্রুত হয়, কিন্তু জাগরিত হইলে সে সব কিছুই দেখা যায় না, গৃহ নিস্তব্ধ প্রতীত হয়। সেইরূপ জ্ঞানলাভ হইলে সকল বিবাদ মিটিয়া যায়।

এই কথাটা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা বলিলেন,— কোন এক সময়ে কয়েকটী পথিক পথ অতিবাহিত করিতে করিতে একটী বৃক্ষনিম্নে সম্মিলিত হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ ফকির, কেহ বৈরাগী বৈষ্ণব, কেহ জ্যোতিষী, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ পালোয়ান, কেহ বা বণিক। ঐ সময় বৃক্ষোপরি এক তিতির পক্ষী ডাকিতেছিল। সেই শব্দ পথিকগণের প্রত্যেকের কর্ণে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করিতেছিল। প্রথমে ফকির বলিল—"আহা পক্ষী কি সুন্দর বলিতেছে—'শোভন তেরি কুদরৎ।' অর্থাৎ হে ভগবান্, বলিহারী তোমার প্রকৃতি।"

ফকিরের ঐ বাক্য বৈষ্ণবের পছন্দ হইল না। সে বলিয়া উঠিল—"না, না, তুমি পক্ষীর বুলী ঠিক ঠিক ধরিতে পার নাই। পক্ষী বলিতেছে 'সীতারাম দশরথ।"

জ্যোতিষী প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমিও ঐ বুলীর তাৎপর্য্য বুঝ নাই। পক্ষী বলিতেছে—বেদ, পুরাণ শাস্তর্। অর্থাৎ এই গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন পূর্ব্বক জ্ঞান লাভ কর এবং অবিদ্যা ধ্বংস কর।"

তখন ক্ষত্রিয়টী বলিয়া উঠিল, "না, পক্ষী আদৌ তাহা বলিতেছে না। তুমি অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই। ও বলিতেছে, ঢাল, তলোয়ার সন্তর। অর্থাৎ পক্ষী বলিতেছে, ঐ সকল অস্ত্র দ্বারা দুষ্ট শত্রুকে নাশ পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে ধর্ম্মের সহিত রাজ্য কুর।"

পালোয়ান ঐ বাক্য আদৌ সমর্থন করিল না। সে বলিল "পক্ষী বলিতেছে—ডন, বৈঠক, কসরৎ।" অর্থাৎ নানারূপ কসরতের দ্বারা শরীরকে মজবুত শক্ত কর। যাহার দ্বারা শত্রু তোমার বশীভূত হইবে, এবং সাধারণ ব্যাধি তোমাকে কষ্ট দিতে না পারে ও তুমিও শীঘ্র যাহাতে জরাগ্রস্ত না হইয়া পড়।"

পালোয়ানের ঐ বাক্য শুনিয়া বণিক্ বলিয়া উঠিল, "পক্ষী ও কথা বলিতেছে না। পক্ষী বলিতেছে—নুন, তেল, আদ্রক্। অর্থাৎ নুন, তেল, আদা প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবসায় করত অর্থ সঞ্চয় কর এবং ঐ অর্থ সদ্ব্যয় পূর্ব্বক সুপথে চল।"

বাবা এই গল্পটী বলিয়া বলিলেন, "পক্ষী ঐ সকল কিছুই বলে নাই, সে তাহার নিজ বুলীই বলিতেছিল। কিন্তু যাহার যেরূপ মন, যাহার যেমন চিন্তা, সে সেইরূপই শুনিতে পাইল।" ইহা বলিয়া বাবা বলিলেন—

"যোঁ যাঁকি ভাবনা রৈ যেইসি।
হরি মূরত দেখি তিন তৈইসি ॥"

কেহ শঙ্কররূপ, কেহ গণেশরূপ, কেহ বিষ্ণুরূপ, কেহ কালীরূপ, কেহ ভগবতীরূপ, কেহ সূর্য্যরূপে তাঁহাকে চিন্তা করে, আর ঐ সকল একনিষ্ঠ ভক্তের অভীষ্ট পূরণার্থে তিনি তাঁহাদিগকে সেই মূর্ত্তিতেই দর্শন দানে চরিতার্থ করেন ; কিন্তু বাস্তবিক ভগবানের কোন রূপ নাই। পরমাত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপক। কোন স্থানই তিনি ছাড়া নয়। এই যে দৃশ্যমান্ জগৎ প্রপঞ্চ, এ সবই তাঁ'র রূপ। তাঁহাকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। সুবর্ণের অলঙ্কারের মধ্য হইতে সুবর্ণ বাদ দিলে যেমন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি ব্রহ্মকে বাদ দিলে বৃক্ষ, বনস্পতি, মনুষ্য, গো, মহিষাদি যত স্থাবর, জঙ্গম দৃষ্ট হইতেছে, এ সকল কিছুই থাকে না। যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, সে নাম রূপ বাদ দিয়া সর্ব্বত্র একমাত্র ব্রহ্মকেই দর্শন করিয়া থাকে, মূর্খেরাই নাম রূপ লইয়া বিবাদ করিয়া থাকে।—

বাবা বলিলেন—

"এ জগৎ হরি কা রূপ হৈ। হরিরূপ নজরি আয়ো ॥
যো দ্বিতীয় কো মনমে ধরে। ভয় তাঁকো বেদ ফুকারো ॥"

অর্থাৎ এ জগৎই হরির রূপ। এই প্রপঞ্চ জগৎ যাহা দৃষ্টি গোচর হইতেছে তাহা পরমাত্মাই ; যে ব্যক্তি দ্বৈতভাব মনে ধারণ করে, বেদ বলিতেছে, তাহারই ভয়।

বাবা কৈলাসে ফিরিয়া তাঁহার অতিথিদিগকে ছাড়িতে চাহিলেন না। ইঁহারা বাবাকে কৈলাসে ফিরিতে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াছিলেন ; বাবা তাই তাড়াতাড়ি কৈলাসে ফিরিলেন। ফিরিয়া, বন্ধুবৎসল বাবা তাঁহাদিগকে আর ছাড়িতে চাহেন না। বাবা আরোগ্যলাভ করিবার

কয়েকদিন পরে সন্তরামজী ও অন্যান্য সাধুগণ কৈলাস ত্যাগ করত তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইবেন ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু বাবা পাছে তাঁহাদের বাধা দেন, তাই তাঁহারা গোপনে কৈলাস ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন। ঐ সময় সন্তরামজী একখানা পত্র লিখিয়া বাবার ঘরে রাখিয়া দিয়া রাত্রি-কালে কৈলাস ত্যাগ করিলেন। পত্রে প্রথমে সকলকে নমস্কার জানাইয়া পরে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"পাবনভূমি কৈলাসমে পাইয়ে সুখ মহান্।
বহুত দিন সুখ পায়কর আভি মন ভো উপরাম॥"

আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"স্বর্গ ও কৈলাসমে বড় অন্তরো মান্।
স্বর্গ সুখ মুয়েয়া মিলে কৈলাস জিঁতে জান॥"

অর্থাৎ স্বর্গ ও কৈলাসে অনেক প্রভেদ। মৃত ব্যক্তিরা স্বর্গসুখ ভোগ করে, কিন্তু কৈলাসের সুখভোগ করে জীবিত ব্যক্তি।

সপ্তম তরঙ্গ

একদা অপরাহ্নে বাবাকে ধরিয়া বসিলাম উপদেশের জন্যে। উপদেশ বাবা নিয়ত দিতেছেন; কখন দোঁহায়, কখন গল্পে, কখন শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া। কিন্তু এই সব মহাপুরুষের উপদেশ আমরা পালন করি কই? তবে কথা এই, সৎকথা শুনিতে শুনিতে তমো ভাব কাটিয়া গিয়া সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হওয়া সম্ভব। এই সাত্ত্বিক ভাব যাহাতে অন্তরমধ্যে বদ্ধমূল হয় সেই চেষ্টা অনেকেই করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গ উঠাইলে বাবা একটী গল্প বলিলেন,—কোন এক সময়ে এক বৈশ্য বণিক বিদেশে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া পাঁচশত টাকাসহ গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল। পথ সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে শেঠজী অরণ্যপথ ধরিয়া চলিল। তিনজন ডাকাত সন্ধান পাইয়া বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত ছিল। বণিক সমীপস্থ হইবামাত্র জনৈক দস্যু কহিল, টাকার থলিয়া এখানে রেখে তুমি গৃহে যাও। শেঠ বুদ্ধিমান্, বিচার করিয়া দেখিল তিনজন বলিষ্ঠ সশস্ত্র দস্যুর সহিত লড়াই করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না; তখন সে ভদ্রভাবে কহিল, "এই যে ভাই, থলিয়া রাখিয়া দিতেছি, কিন্তু আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে, তোমরা দয়া করিয়া উত্তর দিবে কি?"

দস্যু—কি জান্‌তে চাও বল।

শেঠ—তোমরা কি জাত?

দস্যু—আমি ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, তৃতীয় ব্যক্তি চামার।

শেঠ তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে অন্তরালে লইয়া গিয়া কহিল,

"দেখ ভাই, আমার এই অর্থ বহুকষ্টে উপার্জ্জিত, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে তাহা দিতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু চামারকে দিতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে; আমি বৈশ্য, আমার কষ্টোপার্জ্জিত ধন চামারে ভোগ করিবে? ইহা অসহ্য। তাই বলিতেছিলাম আমার এ থলিয়ার মধ্যে যে পাঁচশত টাকা আছে তাহা তোমরা তুল্যাংশে ভাগ করিয়া লও, আর ছোট জাত চামারকে বিদায় দেও।"

এই সুন্দর প্রস্তাব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মনঃপূত হইল, তাহারা চামারের নিকট ফিরিয়া গিয়া কহিল, শোন ভাই, এ ব্যক্তির পরিচয় নিয়ে আমরা জান্‌তে পারলাম এ আমাদের জানাশুনা লোক; অতএব এ ব্যক্তির টাকা কড়ি কেড়ে লওয়া আমাদের ইচ্ছা নয়; তুমি অন্যত্র শিকার অন্বেষণে যাও, আমরাও ঘরে যাই।"

চামার নির্ব্বোধ, দেহেই শক্তি আছে। সে বুঝিল, শেঠ বুঝি সত্যই পরিচিত ব্যক্তি। সে প্রতিবাদ না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। চামার অদৃশ্য হইলে, শেঠ ব্রাহ্মণকে অন্তরালে লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "দেখুন আপনি ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ, আমার প্রণম্য, সুতরাং আপনাকে প্রণামীস্বরূপ এই অর্থ দিতে আমার আনন্দ বই দুঃখ নাই। কিন্তু ক্ষত্রিয়কে কেন দিব? আপনি একা সমস্ত টাকা গ্রহণ করুন, আর ক্ষত্রিয়কে বিদায় দি'ন।"

ব্রাহ্মণ কহিল, "তুমি ঠিক কথাই বলেছ, আমি ক্ষত্রিয়কে বিদায় দিচ্ছি।"

বলিয়া তিনি ক্ষত্রিয়ের নিকট আসিয়া কহিল, "পরিচয় নিয়ে জানতে পারলাম, এ ব্যক্তি আমার যজমান; সুতরাং ইহার অর্থ লুণ্ঠন করা যুক্তি সঙ্গত নয়, অতএব ভাই তুমি অগ্রসর হও, আমি যজমানকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়ে তোমাদের সঙ্গে যথাস্থানে মিলিত হ'তেছি।"

ক্ষত্রিয় ধূর্ত্ত ; ব্যাপার কি বুঝিতে পারিলেও সে কোন প্রতিবাদ করিল না। প্রতিবাদ করিলে কোন ফল হইবে না, বুঝিল—উভয়ের যুক্ত শক্তির নিকট সে পরাভূত হইবে। সে শুধু বলিল, সত্যই যদি এ ব্যক্তি তোমার যজমান হয় তাহা হইলে আমার বলিবার কিছু নাই, আমি যাইতেছি।" বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

ব্রাহ্মণ তখন শেঠকে একা পাইয়া কহিল, "এখন তুমি থলিয়াটা আমাকে দেও।"

শেঠ কহিল, "এ থলিয়া ত আপনারই। আপনি কেন কষ্ট স্বীকার করিয়া এই গুরুভার বহন করিয়া লইয়া যাইবেন? আমি যতটা পারি লইয়া যাই—অরণ্য পথ শেষ হইলে যখন আমরা ভিন্নপথ ধরিব, তখন আপনাকে থলিয়াটা দিব।"

এ প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া ব্রাহ্মণ গ্রাহ্য করিল। সে আর প্রতিবাদ না করিয়া চলিতে লাগিল। অরণ্যের বাহিরেই শেঠের বাড়ী; গৃহচূড় দেখিতে পাইয়া শেঠ কহিল, "নিকটেই আমার গৃহ, আপনি তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, গন্তব্য স্থানে গমন করিবেন।"

ব্রাহ্মণ বস্তুত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শেঠের পরামর্শ যুক্তি-সঙ্গত মনে করিয়া ব্রাহ্মণ তাহার গৃহে আতিথ্য লইল। শেঠ গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার স্ত্রীকে চুপি চুপি কহিল, "আগে এই টাকার থলিয়াটা পেটিকার মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া এসো—পরে এই ব্রাহ্মণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাও।"

বহির্ব্বাটীতে আসিয়া শেঠজী, দস্যুদলপতি ব্রাহ্মণকে কহিল "বহু পুণ্যফলে আমার গৃহে আপনার পদধূলি পড়িয়াছে; আপনি দয়া করিয়া স্নানাহার পূর্ব্বক আমাকে ধন্য করুন।"

বিস্মিত ব্রাহ্মণ স্নানান্তে পরিতোষ সহকারে আহারাদি সম্পন্ন

করিল। শেঠ-গৃহিণী তখন আসিয়া পাঁচটী রৌপ্যমুদ্রা ভোজন দক্ষিণা স্বরূপ ব্রাহ্মণের পদতলে রক্ষা করিল। দস্যু বুঝিল, এই যৎসামান্য অর্থ দিয়া শেঠ তাহাকে বিদায় করিতেছে। পাঁচশত মুদ্রার আশা ছাড়িয়া দিয়া দস্যু এই সামান্য অর্থেই সন্তুষ্ট থাকা যুক্তি-সঙ্গত মনে করিল; কেননা, সে এখন শেঠের গৃহে, বলপূর্ব্বক অর্থ লইবার উপায় নাই। দস্যু তখন শুষ্ক মুখের উপর হাসি টানিয়া বিদায় লইল।

বাবা গল্প শেষ করিয়া তাহার মর্ম্মার্থ আমাদিগকে এইরূপে বুঝাইলেন।

যেমন এই সংসারারণ্যে মানবকে সচরাচর সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ আশ্রয় করে, তেমনি শেঠকে এই তিন গুণাত্মক দস্যু আক্রমণ করিল। তমোভাবাপন্ন দস্যু হইল চামার; যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একত্রে দস্যু চামারকে বিতাড়িত করিল, সেইরূপ সত্ত্ব ও রজোভাবের একত্র যোগে, তমোকে নাশ করিতে সমর্থ হইবে। মানব-হৃদয় যখন তমোভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়, তখন সত্ত্বের প্রাধান্য বাড়িতে থাকে। অবশেষে সত্ত্ব বল সঞ্চয় করিয়া রজোকে দূরীভূত করিবে। ব্রাহ্মণও তদ্রূপ ক্ষত্রিয়কে বিতাড়িত করিয়া প্রাধান্য লাভে সমর্থ হইল। তখন সে শেঠকে নিরাপদে স্বগৃহে অর্থাৎ শাশ্বত ধামে লইয়া আসিল।

শেঠ-পত্নী হইতেছেন ব্রহ্ম-পথপ্রদর্শিনী শুদ্ধা বুদ্ধি। এই বুদ্ধি জাগরিত হইলে, তখন এই বুদ্ধির সাহায্যে সাধনা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তখন আর সত্ত্ব-রজোগুণের প্রয়োজন থাকে না, সাত্ত্বিক বুদ্ধি মানবকে পৌঁছাইয়া দেয় ব্রহ্মজ্ঞানের কাছে। এই দেহ বিদায় লয় আত্ম-জ্ঞানীর নিকট হইতে, সে তখন পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়— থাকে শুধু আত্মজ্ঞান। দস্যু বিদায় লইল পঞ্চ মুদ্রা প্রণামী পাইয়া।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ একে একে বিদায় লইল যখন শুদ্ধা বুদ্ধির উদয় হইল—পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেল—রহিল পড়িয়া অজর অমর অবিনশ্বর আমি।

এই 'আমি' এই পাঞ্চভৌতিক দেহমধ্যে নির্ব্বিকার ভাবে—দ্রষ্টারূপে নিয়ত অবস্থান করিতেছেন। দশ ইন্দ্রিয় লইয়া কার্য্য করে মন। ইন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করিবার জন্য মন সতত ব্যস্ত।

একদা শ্রীশ্রীশ্রুতানন্দ স্বামিজী বলিতেছিলেন—

"মৃগ, মীন, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, কুঞ্জর, একৈক দোষ বিনাশ।
যিস্‌মে এ পাঁচো বসে তাঁকি কহক আশ॥"

অর্থাৎ—

একৈক ইন্দ্রিয় সেবি প্রাণ দিল একৈক পরাণী।
পঞ্চেন্দ্রিয় সেবা তুমি অহরহ কর দিবাযামী॥

এক এক ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় কুরঙ্গ মাতঙ্গ পতঙ্গ ভৃঙ্গ, মীন যখন ধ্বংস হইতেছে, তখন জীবকে একই সময়ে পঞ্চেন্দ্রিয় তাড়না করিলে তাহার নিষ্কৃতি কিরূপে সম্ভব? * সম্ভব প্রভুর আশ্রয় লইলে। যে কোন ব্যক্তি যে কোন বাসনা লইয়া ভগবানকে ডাকুক না কেন, তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক ডাকিলেই—

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।" (গীতা ৯।৩১)

[আমার শরণ লইলে, শীঘ্রই সে ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়।]

কিন্তু কই শান্তি? ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদই অস্থির হইয়া আক্ষেপ করিয়াছেন,—পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করিয়া ঘর করিব?

---

* গরুড়পুরাণ।

তাহা হইলে? তাহা হইলেও উপায় আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, সনাতনকে বলিয়াছিলেন,—"ভোগের কামনা বা মোক্ষের কামনা করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে থাকে, সে ব্যক্তিও শ্রীকৃষ্ণ চরণ লাভ করে।" কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যে বলিয়াছেন।

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃস মে প্রিয়ঃ। (গীতা ১২॥১৬)

[যিনি সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমার প্রিয়]

বাসনা ত্যাগ সহজ কথা নয়। যাঁহাদের সচারাচর দেখি, তাঁহারা কেহ পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। বাসনা ত্যাগ করিতে না পারিলেও মহাপুরুষ রামতীর্থ স্বামী † এক উপায় বলিয়া দিয়াছেন—

আসন জমায়ে বৈঠে হাঁয় দর সে ন জায়েঙ্গে।

আসন জমাইয়া বসিয়াছি, দ্বার হইতে যাইব না। অর্থাৎ এই ভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার (শরণ লইয়া) দ্বার ধরিয়া পড়িয়া থাকিলে তাঁহাকে দর্শন দিতেই হইবে, তা আমার বাসনা থাক্ বা যাক্।

একদা আমার স্বামীকে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজও বলিয়াছিলেন—

"শরণাগতি, অনুস্মরণ ও ধৈর্য্য—ইহাই অবলম্বন করিয়া চলিবে।"

বাবাকে লইয়া আমরা একদিন কৈলাসের অদূরে পলাশবনে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এই বনমধ্যে এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের মাথায় এক শিব আছেন। তিনি খোদিত, প্রতিষ্ঠিত নহেন। আমরা ফুল আনিয়া শিবের মাথায় চাপাইলাম। আমার স্বামী বাবাকে কহিলেন, "শুনিয়াছি, এই শিব নাকি খুব জাগ্রত।"

বাবা স্নিগ্ধস্বরে বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বত্রই তিনি জাগ্রত—কোথায় নহেন? ব্রহ্মাণ্ডময়ই যে তিনি, ব্রহ্মাণ্ডই যে তাঁহার প্রকাশ।"

† পঞ্জাবের বিখ্যাত সাধু।

"হরি ব্যাপক সর্ব্বত্র সমানা।
প্রেম সে প্রকট হোয়ে ভগবানা ॥"

আমরাও বলিতে চাই তাই, কিন্তু পারি কই? আমাদের সে চক্ষু কই যে আমরা রেণুতে রেণুতে তাঁহাকে দেখিব?

ঋষি উপদেশ দিলেন, 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

শঙ্কর বুঝাইলেন, "শ্বেতকেতো, সেই তুমি হও" (তৎ+ত্বম+অসি)।

রামানুজ বুঝাইলেন, 'তাহার তুমি হও' (তস্য+ত্বম্+অসি)।

আমরা কি বুঝিব না বুঝিব, কিছুই জানি না; আমি চাইনা জানিতে, 'সেই আমি হই', অথবা 'তোমার আমি হই।' আমি চাই শুধু তোমার চরণে শরণ লইতে; এই বিশ্বাস লইয়া—

যো যাকু শরণ লিয়ে সো রাখে তাকু লাজ।
উলটু জলে মছ্‌লী চলে বহি যায় গজরাজ ॥

তাই প্রভু, সমস্ত হৃদয় দিয়া তোমার শরণ লইতেছি, আমার লজ্জা রক্ষা করিও।

অষ্টম তরঙ্গ

১৩৪৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ৬ই তারিখ আমরা সহসা সংবাদ পাইলাম আমাদের গুরু মহারাজ শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীজী গুরুতর পীড়িত। আমরা যে ব্যাকুলতা ও আশঙ্কা লইয়া দেওঘর অভিমুখে ছুটিলাম তাহা লিখিতে আজও প্রাণে ব্যথা পাই। সুতরাং নিরস্ত হইলাম।

ঠিক এই সময়ে শ্রীশ্রীহংসদেব অবধূত মহারাজ তাঁহার নর্ম্মদা তীরস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়া ভক্তের আহ্বানে বোম্বাই গিয়াছিলেন। আবার সেস্থান হইতে কতিপয় ভক্ত তাঁহাকে টানিয়া আনিল কলিকাতায়।

বাবা কলিকাতায় আসিয়াছেন মঞ্জুরাণীর * ভ্রাতার বিবাহের নিমন্ত্রণে। সংবাদ পাইয়া আমরা বাবাকে দর্শন করিতে কলিকাতায় ছুটিলাম। তখন আমাদের হৃদয় শোকে মুহ্যমান। গিয়া দেখিলাম বাবার পূর্ব্ববৎ হাস্যোজ্জ্বল বদন, আর তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে বহু ভক্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবনের পথে গৌড়ে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ছিল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নরনারী। গৌড়ের স্থলতান গৃহচূড় হইতে তাহা দেখিয়া সনাতনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সন্ন্যাসীর পিছনে এত লোক! আমার পিছনেও ত এত লোক যায় না। ফকির কি এদের বেতন দেয়?"

"না।"

"রসদ দেয়?"

"না; এরাই সন্ন্যাসীকে রসদ দেয়।"

"ফকির এদের কি দেয়?"

"কিছুই নয়।"

"আমি দু'দিন রসদ বন্ধ করলে আমার সৈন্যেরা আমাকে ছেড়ে চলে যায়। দু'মাস বেতন বন্ধ করলে বিদ্রোহী হয়। আর এই ফকির—"

আমাদের বাবা যেখানে যান, সেখানেও তাঁর পিছনে অগণিত নরনারী। বাবা তাহাদিগকে রসদ দেওয়া দূরে থাক্, বাবার জন্যে প্রত্যেক ভক্ত এত রসদ আনে যে, সমবেত ব্যক্তি তাহা ভোজন করিয়া উঠিতে পারে না। বাজারে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, গৃহজাত যাহা কিছু পবিত্র ও উপাদেয়, তাহা ভক্তেরা বাবার সেবার্থে আনিয়া থাকে, বাবা তাহা সানন্দে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রসাদ বলিয়া বিতরণ করিয়া দিয়া থাকেন।

* চৌগ্রাম রাজবধূ শ্রীমতী মঞ্জুরাণী দেবী।

আমরা তথায় গিয়া দেখিলাম, বাবা স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া প্রফুল্ল বদনে ভক্তমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার দেহের উপর দিয়া সময় যে বহিয়া গিয়াছে তাহার কোন চিহ্ন দেখিলাম না। দশ বছর পূর্ব্বে বাবাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, আজও ঠিক সেইরূপ দেখিলাম। সংযমীর নিকট কাল পরাজয় মানিয়াছে।

আমাদিগকে শোকার্ত্ত দেখিয়া বাবা উপদেশ দিলেন,—"প্রকৃতপক্ষে গুরুর কখন অভাব হয় না। গুরু সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, অমর। স্থূল দেহে গুরু মহারাজ তোমাদিগকে যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা ভক্তির সহিত নিরন্তর পালন করিয়া যাও, তাহা হইলেই তাঁহার সেবা করা হইবে। দেহ ত নাশবান্ বস্তু, ইহার জন্য আক্ষেপ করা বৃথা ; যাহা অবিনাশী তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাধন ভজন করিয়া যাওয়া বিধেয়।"

বাবার উপদেশে আমাদের অশান্ত হৃদয় অনেকটা শান্ত হইল। আমরা পরদিবস ফিরিয়া গেলাম ; বাবাও দার্জ্জিলিং চলিয়া গেলেন। বাবার বাসের জন্য প্রাসাদোপম গৃহ নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু বাবা সেখানে থাকিতে পারিলেন না, এমন কি দার্জ্জিলিং সহরেও থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, বহুত প্রবৃত্তি প্রধান স্থান। অতঃপর তিনি সহর ছাড়িয়া হিমালয়-পাদস্পৃষ্ট অরণ্যাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসীর বাসোপযোগী স্থান পছন্দ করিবার বাবার অসামান্য শক্তি। পাহাড়-পদতল বিধৌত করিয়া যেখানে 'রঙ্গীত' নদী বক্র গতিতে বহিয়া চলিয়াছে, যেখানে সমুচ্চ বৃক্ষরাজি মাথা তুলিয়া আকাশের দেবতার চরণ স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে, যেখানে অসমতল পর্ব্বতগাত্রে দিগন্তবিস্তারী পুষ্প-বহুল বন মধুর গন্ধ ছড়াইয়া কৈলাসেশ্বরের আরাধনা করিতেছে, বাবা সেই স্থানে বাস করিবেন স্থির করিলেন।

বাবার আদেশে অচিরে এক সমুচ্চ টোঙ্গা নির্ম্মিত হইল। বাবা তথায় করঙ্ক কম্বল সম্বল করিয়া নির্ভয়ে উঠিলেন। আর তাঁহার সঙ্গে ছিল পাঁচ হাত দীর্ঘ শক্ত লাঠী। তাঁহার সঙ্গে যাহারা ছিল, তাহাদের বাবা প্রায় এক মাইল দূরে গ্রামমধ্যে আশ্রয় লইতে উপদেশ দিলেন। তিনি একা রহিলেন জন্তুদের মধ্যে। বাবার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যাহার মনে হিংসা নাই, তাহাকে কেহ হিংসা করিবে না। কিন্তু আহারের ব্যবস্থা কি হইবে? সে চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে স্থান পায় নাই, তিনি পরমাত্মার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া মহানন্দে প্রকৃতিদেবীর স্নেহময় ক্রোড়ে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পরমাত্মার ব্যবস্থা অতি চমৎকার। যে সব পাহাড়িয়া বা গ্রামবাসী এতদঞ্চলে গোচারণে আসিত, তাহারা বাবাকে প্রচুর দুগ্ধ দিতে লাগিল; পাহাড় বা নিজেদের ক্ষেত্র হইতে ফল আহরণ পূর্ব্বক সাধুকে ভক্তি সহকারে অর্পণ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের কেহ কাহারও ভাষা বুঝিতেন না। নীরব থাকিলেও ভাবে অনেক কথা ব্যক্ত হইত। ভক্তেরা আহার্য্য অর্পণ করিয়া যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিত, অপর পক্ষ নয়নে শান্তি ও স্নেহধারা আনিয়া নীরবে সহাস্য বদনে উপহার গ্রহণ করিতেন। তাহারা ধন্য হইত।

যৌবনে বা প্রৌঢ়ে যে ভাবে বাবা জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এইবার বাবা হিমালয় প্রদেশে মহানির্জ্জনতার মধ্যে আসিয়া সেইভাবে মহানন্দে বাস করিতে লাগিলেন, কি করিতেন তাহার সংবাদ পাই নাই। বাবার নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহাই এ স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। বাবার অভিমত এই, কৈলাসাশ্রম বা নর্ম্মদাশ্রম অপেক্ষা তিনি অধিকতর আনন্দ পাইয়াছিলেন এই নির্জ্জনতার মধ্যে, এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মধ্যে, এই সরলপ্রাণ পর্ব্বতবাসীদের

সাহচর্য্যে। বাবা যখন সে স্থান ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়াছিলেন, তখন তাহাদিগকে ভান্তারা দিয়া তৃপ্তি পূর্ব্বক খাওয়াইয়া ছিলেন ; তাহারাও আসিয়াছিল দলে দলে, ছেলেমেয়েদের লইয়া এবং উপাদেয় ভোজ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া বাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত স্বগৃহে প্রস্থান করিয়াছিল।

বাবা পাহাড় হইতে নামিয়া প্রথমে আমার বড় জায়ের * আহ্বানে দীঘাপতিয়ায় আসিয়াছিলেন ; তথায় দুই চার দিন অবস্থান করিয়া আমাদের গৃহে রাজসাহীতে আসিয়াছিলেন। গুরুপূর্ণিমা সমাগত দেখিয়া বাবা দুই দিন মাত্র তথায় থাকিয়া যসিডি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমাদের এবার গুরুপূর্ণিমা কই ? আমাদের চাঁদ যে নিবিয়া গিয়াছে—আসিয়াছে অমাবস্যা। যে ঋষি, যে চাঁদ, যে দেবতা করণি-বাগ আশ্রম আলো করিয়া থাকিতেন, সে দেবতা আজ কোথায় ? মানস-মন্দিরে তাঁহার প্রতিমা গড়িয়া তাঁহার রাতুল চরণে ফুল চন্দন অর্পণ করিয়া, ধূপ-ধূনা প্রফুল্লিত মলয়ানিলে তাঁহাকে বীজন করিয়া, প্রজ্বলিত ভক্তি-দীপে তাঁহাকে আরতি করিয়া, অমাবস্যায় আমরা পূর্ণিমা আনিলাম। পূজা করিয়া তৃপ্ত হইলাম—বুঝিলাম, তিনি বর্ত্তমান—অনাদি কাল হইতে তিনি আছেন—পৃথিবী ধ্বংস হইয়া গেলেও তিনি থাকিবেন।

গুরু পূর্ণিমার কথা মনে হওয়ায় আজ গুরুদেবের প্রিয় ধ্যান কুটীরের কথা মনে পড়িতেছে। ধ্যানকুটীরের বারান্দায় যথায় গুরু মহারাজ ভক্তিপরায়ণা শিষ্যাগণের স্বহস্তে প্রস্তুত বিবিধ প্রকারের সুন্দর সুন্দর আসনোপরি হর্ষোৎফুল্ল আননে উপবিষ্ট হইয়া শত শত

* দীঘাপতিয়ার রাণী শ্রীমতী গিরিজাকুমারী রায়।

ভক্তহৃদয়ে কত আনন্দ, কত তৃপ্তি, কত জ্ঞান প্রদান করিতেন, যে ধ্যান কুটীরের বারান্দা এক দিন আনন্দের কেন্দ্র ছিল, যে ধ্যান-কুটীরে গেলে আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, সেই ধ্যানকুটীরের উন্মুক্ত বারান্দায় সুনীল অম্বরতলে মহাযোগী শেষ শ্বাস ত্যাগ করত মহাসমাধিমগ্ন শিববৎ চিরতরে মহানিদ্রা গিয়াছেন। এখন ঐ স্থানে গেলে মর্ম্মস্থান হইতে দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হয়। ঐ স্থানে এখন তাঁহার গদি প্রাপ্ত সুযোগ্য শ্রীশ্রীমোহনানন্দ ব্রহ্মচারিজী শ্বেত প্রস্তর উপরে তাঁহার রচিত এই কবিতাটি খুদাইয়া রাখিয়াছেন—

"পুণ্য পীঠ ধামে এই পুণ্য তীর্থ স্থান।
যথাচল বৈদ্যনাথ আচার্য্য মহান॥
শ্রীশ্রীগুরু কল্পতরু "বালানন্দ" নাম।
অন্তঃশ্বাস পরিহরি প্রাপ্ত দিব্য ধাম॥
জ্যৈষ্ঠ শুক্ল প্রতিপদ চুয়াল্লিশ সনে।
চিরসুপ্ত সমাধিস্থ সে মহা নির্ব্বাণে॥
গিয়াছেন রাখি, তাঁর চরণ যুগল।
স্মৃতি বক্ষে ধরি পূজি দিয়া অশ্রুজল॥
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম হেথা ত্রিবেণী সঙ্গম।
পুণ্য তীর্থে তীর্থ যাত্রী কর নিমজ্জন॥
নিরাবরণ দিব্যাত্মা অন্তরিক্ষ হ'তে।
দাও প্রভু আশীর্ব্বাদ চরণে মিশাতে॥"

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম তরঙ্গ

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম তরঙ্গ

বহু পুণ্যফলে যে দুই মহাপুরুষের সংসর্গে আসিবার ভাগ্য লাভ করিয়াছি, সেই দুই মহাজ্ঞানীর নিকট হইতে একেশ্বরবাদেরই শিক্ষা পাইয়াছি। চারিদিকে বিভিন্ন উক্তি থাকিলেও চারিবেদই প্রকারান্তরে বলিয়া গিয়াছেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। উপনিষদের প্রাণস্বরূপ মহাবাক্য নিচয়ের মধ্যে যে জ্ঞান-গম্ভীর শিক্ষা আছে, তাহার মর্ম্মার্থ যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে দিলাম। ইহা অবান্তর হইবে না এই হিসাবে যে, তাঁহাদেরই শিক্ষা আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি। তাঁহাদের উপদেশ লিপিবদ্ধ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

উপযুক্ত শিষ্যকে গুরু পরমহংস শেষ সন্ন্যাস দীক্ষার উপদেশক্রমে বলিয়া থাকেন,—

তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞো হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর॥

[হে মহাপ্রাজ্ঞ তৎ-ত্বম্-অসি, (তুমি সেই হও), তুমি আপনাকে হংস ও সোঽহং ভাবনা কর এবং মমতা রহিত ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া স্বভাবে (আত্মভাবে) তদ্‌গত হইয়া সুখে বিচরণ কর।]

বাবার নিকট হইতে এবং শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে বিভিন্ন সময়ে যাহা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা হইতে বুঝিয়াছি যে,

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ পঞ্চদশী-কার অতিবিস্তাররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান্ নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে, একমাত্র নামরূপবিবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরমব্রহ্ম ছিলেন, তিনিই তৎ শব্দের বাচ্য হন। সেই ব্রহ্ম ছাড়া আর কেহ তৎ নহেন। জগতের উৎপত্তির পরে যখন প্রাণী সৃষ্টি হইল, তখন ত্বং শব্দ সৃষ্ট হইল এই ভাব লইয়া যে, দেহ ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক যে অন্তঃকরণস্থিত চৈতন্য বিরাজ করিতেছেন, তিনিই হইলেন ত্বং। অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মচৈতন্য হইলেন তৎ, আর প্রত্যক্ষ জীব চৈতন্য হইলেন ত্বং। পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য সাধিত হইতেছে 'অসি' শব্দের দ্বারা, দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই; সেই কারণেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু শিষ্যকে নমস্কার করিতে বলেন,—

ত্বমেব তৎ তৎ ত্বমেব বিশ্বরূপ নমোঽস্তুতে।

সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদুদ্ধৃত তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অনুরূপ ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় উপনিষদের প্রাণ স্বরূপ মহাবাক্য প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম বা প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। প্রজ্ঞান হইলেন, কূটস্থ চৈতন্য—আনন্দ বা ব্রহ্ম তাঁহার বিশেষণ মাত্র। এই প্রজ্ঞান চৈতন্য নির্ব্বিকার, অসঙ্গ, সাক্ষী-স্বরূপ। নৃত্যাশালাস্থিত দীপ, যেমন দর্শক প্রভৃতিদিগকে সমভাবে প্রকাশ করে এবং তাহাদিগের অভাবেও যেমন দীপ্যমান থাকে, তেমনি এই দেহরূপ গৃহের স্বামী অহঙ্কারকে, বুদ্ধিরূপ নর্ত্তকীকে, শব্দস্পর্শাদি বিষয়রূপ দর্শকগণকে অধিষ্ঠান সাক্ষী-চৈতন্যস্বরূপ আত্মা নির্ব্বিশেষে প্রকাশ করেন এবং সুষুপ্তি অবস্থাতে দর্শকপ্রভৃতির অভাবে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত থাকেন। যাঁহার জন্ম নাই, ক্ষয় নাই, যাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই, যিনি অসঙ্গ ও নির্ব্বিকার থাকিয়া বিনা চেষ্টায়,

বিনা যত্নে, নির্ব্বিকারভাবে অন্তঃকরণে অবস্থান করিয়া সাভাস অন্তঃকরণ হইতে দেহাদি ও বাহ্যবিষয় সমূহকে প্রকাশ করেন, তিনিই এই সাক্ষী—চৈতন্যই প্রজ্ঞান শব্দে কথিত।

তারপর একই ভাব ব্যক্ত করিতে আসিলেন যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদের মহাবাক্য—অহং ব্রহ্মাস্মি। পাঞ্চভৌতিক শরীরের অন্তঃকরণ মধ্যে যিনি সাক্ষী স্বরূপ অবস্থান করিতেছেন, তিনি হইতেছেন অহং। এই অহং হইতেছে জীব চৈতন্য। অস্মি শব্দ প্রতিপন্ন করিতেছে ঐক্য, জীব-চৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে।

ইহার পরে আসিলেন বৃদ্ধ অথর্ব্ব ঋষি তাঁহার মহাবাক্য 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' লইয়া সমবেত ঋষি মণ্ডলীকে চমকিত করিতে। বিচারে আহুত হইয়া অথর্ব্ব বুঝাইয়া দিলেন, যিনি স্বয়ং প্রকাশ জীব-চৈতন্য, তিনি হইতেছেন অয়ং; আর যিনি দেহান্তর্গত অহঙ্কারাদি সমুদয়ের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, তিনি হইতেছেন আত্মা। অয়মাত্মা বুঝাইয়া পরে তিনি ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বুঝাইয়া জীব ও চৈতন্যের ঐক্য, অন্যান্য ঋষির ন্যায় প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

বাবাও এই কথা আমাদের পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছিলেন, বাবা একদা বলিয়াছিলেন,—

> যৈ অবিকৃত কৌন্তেয় মে রাধাপুত্র প্রতীত।
> চিদানন্দঘন ব্রহ্মমে জীবভাব তাঁয় রীত॥

অর্থাৎ রাধাদ্বারা পালিত হওয়ায় কুন্তীপুত্র মহাবলশালী কর্ণ যেমন নিজেকে রাধাপুত্র বলিয়াই জানিত, তেমনি জীব অজ্ঞানতা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া বুঝিতে পারিতেছে না সে কে; সে যে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নহেন, ইহা সে কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। সে যে সামান্য জীব, ইহা সে নিশ্চয় করিয়া লইয়াছে।

বাবা একদিন বলিতেছিলেন,—

ঈশ আরাধন বীজ সে উপজে তত্ত্ব সুবোধ।

জিজ্ঞাসিত হইয়া বাবা তত্ত্ব কথাটীর অর্থ বুঝাইলেন, জীব ও ঈশ্বরের একতা বোধই তত্ত্ব। বুঝাইয়া বাবা বলিলেন, এখন তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীব ও ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করিতে পারিতেছ না, কিন্তু ইহা তোমরা বুঝিবে একদিন বহু তপস্যার পর, বহু বৎসর পরে।

হায় হায়, সে তত্ত্ব কি কখন বুঝিতে পারিব, উপলব্ধি করিতে পারিব! ঋষির সোঽহং বুঝিলাম না, অয়মাত্মা ব্রহ্ম এই মহাবাক্য উপেক্ষা করিলাম, বাবার নিকট, মহাতপস্বী গুরুদেবের নিকট এত শিক্ষা, এত উপদেশ লাভ করিলাম, কিন্তু এখনও উপলব্ধি করিতে ত পারিলাম না, আমারই আত্মা সর্ব্বজীবে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমভাবে নানারূপে বিরাজ করিতেছেন। যদি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে নিজের মেয়েকে বুকে টানিয়া পরের মেয়েকে দ্বার-বাহিরে ঠেলিয়া দিতাম না, কুকুর দেখিলে লাঠি তুলিতাম না, বনের পাখী ধরিয়া আনিয়া পিঁজরায় আবদ্ধ করিতাম না। কিন্তু কয়জন তাহা পারিয়াছেন? কয়জন প্রকৃতই উপলব্ধি করিয়াছেন জগৎ আমারই প্রকাশ—আমি ছাড়া, ব্রহ্ম ছাড়া জগতে আর কিছু নাই, কোন প্রাণী নাই। এমন কি শিবাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ ভারতের একাদশ আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যদেব যে তাহা পারিয়াছিলেন, তাহাও ত মনে হয় না। যদি তাহা পারিতেন, তাহা হইলে তিনি দেশে দেশে বিচারপ্রার্থী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন না। ইহা আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য নহে—এ কথা বলিয়াছিলেন একদিন মহাযোগী অতিবৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ স্বামী। কথাটা খুলিয়াই বলি।

প্রায় আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাসাগর সঙ্গম স্থলের সন্নিকটে

ক্ষুদ্রকায় কাকদ্বীপে আদিগুরু মহাযোগী অতিবৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দদেব বাস করিতেন। তাঁহার আশ্রমের নাম "আনন্দ মঠ"। এই আনন্দ মঠে এক বিশাল বটবৃক্ষমূলে এক অসমতল প্রস্তর খণ্ড ছাড়া কোন হর্ম্ম্য বা কুটীর ছিল না। এই প্রস্তরোপরি শিষ্যবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া যোগিবর একদা উপবিষ্ট ছিলেন ; সে সময় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তথায় আসিয়া আদিগুরুর চরণে প্রণত হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, তদানীন্তন সাধন মার্গের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা মহাজ্ঞানী ব্রহ্মানন্দকে বিচারে আহ্বান করেন।

এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কহিলেন, "মহাত্মন্, আমি আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর প্রদেশে অদ্বৈত মতের বিচারে জয়লাভ করিয়া বদরিকার মুক্তি ক্ষেত্রে জোশি মঠ (১) প্রতিষ্ঠা করিয়াছি ; পশ্চিম প্রদেশ জয় করিয়া দ্বারকায় সারদা মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। (২) দক্ষিণ প্রদেশ জয় করিয়া রামেশ্বর ক্ষেত্রে শৃঙ্গেরী মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি (৩)। এক্ষণে আপনাকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বঙ্গদেশে চতুর্থ মঠ প্রতিষ্ঠা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।"

শঙ্করাচার্য্যের মনোভাব অবগত হইয়া মহাজ্ঞানী যোগী একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কোন্ বিষয়ে বিচারাভিলাষী হইয়াছ ?"

শঙ্কর,—অদ্বৈতবাদ।

যোগী,—বৎস, তোমার যথার্থ অদ্বৈত জ্ঞান জন্মিতে এখনও বহু বিলম্ব।

---

(১) যুধিষ্ঠির অব্দ ২৬৫২ সালে এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মঠের মহাবাক্য 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। যুধিষ্ঠিরাব্দের ২৫০১ সালে খৃষ্টাব্দ আরম্ভ।

(২) যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৬৪৮ সালে। এই মঠের মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি'।

(৩) যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৬৫০ সালে। এই মঠের মহাবাক্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি'।

শঙ্কর,—আপনি কিরূপে তাহা অবগত হইলেন ?

যোগী,—প্রকৃত অদ্বৈতভাবের ভাবুক হইতে পারিলে তোমার ও আমার মধ্যে পার্থক্য দেখিতে না—আমরা যে দুইটী স্বতন্ত্র জীব ইহা তুমি নির্দ্ধারণ করিয়া আমাকে বিচারে আহ্বান করিতে না। তোমার দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয় নাই বলিয়াই তুমি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তর্কে আহ্বান করিতেছ। যখন এই দ্বৈতভাব তিরোহিত হইবে, তখন তোমাতে আমাতে সর্ব্বভূতে কোন পার্থক্য দেখিবে না—দেখিবে চতুর্দ্দিকে শুধু এক অখণ্ড ব্রহ্ম—জগৎময় অদ্বৈত ব্রহ্মলীলা।

ইহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্যদেব অভিভূত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার জ্ঞানগর্ব্বিত মস্তক অবনত হইল,—তিনি পরম যোগীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "প্রভো বঙ্গদেশে নূতন মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম; এখানে কোন মঠ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আপনার আনন্দমঠের যশঃ চিরদিন বঙ্গদেশে ঘোষিত হউক।" (১)

ক্ষণপরে কহিলেন, "কিন্তু উৎকলে সাধনমার্গ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আছে। পুরীধাম বৌদ্ধ আচারে পরিপুষ্ট হইয়া হিন্দু-আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছে। পুরীধামে একটী মঠ প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।* আপনি আশীর্ব্বাদ করিলে সিদ্ধকাম হইব।†

---

(১) আজও আনন্দমঠ বর্ত্তমান। যে বিশাল অসমতল প্রস্তর খণ্ডের উপর ঠাকুর ব্রহ্মানন্দ সকল সময় উপবিষ্ট থাকিতেন, তাহা আজও বর্ত্তমান। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে বহু সাধু সন্ন্যাসী, ঠাকুরের স্মরণ পূজা উপলক্ষে এই স্থানে—এই সাগর সঙ্গমে—এই নিত্য বার্ষিক কুম্ভমেলা ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া মহাযোগীর চরণোদ্দেশে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করেন।

* পুরীধামস্থ শঙ্করাচার্য্য বা গোবর্দ্ধন মঠ ২৬৫৪ যুধিষ্ঠিরাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই এই মঠের বেদ, ঋক, মহাবাক্য, 'প্রজ্ঞানমানন্দ ব্রহ্ম'।

† গুরুপ্রদীপ।

বাবাও আমাদের অদ্বৈতবাদী মহাজ্ঞানী। তিনি এই ব্রহ্মজ্ঞান আমাদিগকে বুঝাইতে বহু যত্ন লইয়াছেন, কত উপদেশ দিয়াছেন, কত বেদান্তের উপাখ্যান বা তত্ত্বোপদেশ বলিয়াছেন ; কিন্তু আমিত্বকে আমরা কিছুতেই সরাইতে পারিতেছি না। মহাত্মা হরনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, আমিত্ব থাকিলেই দায়িত্ব। এই আমিত্ব ঘুচাইতে পারিলেই 'তুমি' আসে। 'তুমিই' ব্রহ্মময় ; তুমি ছাড়া আমি নাই, জগৎ নাই, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একদিন বলিলেন,—

তুঁ তুঁ কর্‌তা, তুঁহি রহা,
মুঝ্‌মে রহিনা হুঁ।
বলিহারি তেরে রূপ কি
যিৎ দেখুঁ তিৎ তুঁ॥

অর্থাৎ তুমি তুমি করিতে আমি তুমিময় হইয়া গিয়াছি, তুমি ব্যতীত অন্য কিছু খুঁজিয়া পাইতেছি না আমার মধ্যে—আমার আমিত্ব লোপ পাওয়ায় আমি তোমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভু, তোমার রূপের বলিহারি যাই, যে দিকে দৃষ্টি করি, সেইখানেই তুমি—তুমি ছাড়া বিশ্ব-মাঝে আর কিছু নাই।

কই তুমি প্রভু, কোথাও যে তোমাকে দেখিতে পাই না ; যে দিকে নয়ন ফিরাই, সেই দিকে দেখি আমার আত্মপরিজনের মুখ, আমার ধন দৌলত, আমার মান অভিমান। তোমাকে ত কোথাও খুঁজিয়া পাই না। মহাপুরুষদের বাক্য যদি সত্য হয়, যদি সত্যই তুমি সর্ব্বত্র বিরাজ কর, তবে আমাকে দেখা দেও—আমি যেন সর্ব্বভূতে সর্ব্বজীবে, বিশ্বসংসারময় তোমাকেই দেখিতে পাই। আমার জীবন ধন্য কর প্রভু।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

বাবা একদা আমাদিগকে বলিলেন—"বিপদ আসিলে ঘাব্‌ড়াইবে না, অর্থাৎ অধিক ব্যাকুল বা অধৈর্য্য হইবে না। বিপদ কালে ধৈর্য্যাবলম্বনে বিপদ হইতে মুক্তির উপায় হয়। যেরূপ ঝড়ের সম্মুখীন হইলে মুখে, চোখে ধূলি বালি গিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে, ঐরূপ বিপদের সময় বিপদের দিকে চলিলে বা অস্থির হইলে কোনই প্রতিবিধান হয় না, উপরন্তু বিপদে আরও জড়াইয়া ফেলে। তখন বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বিচারপূর্ব্বক ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। অধৈর্য্যের দ্বারা লোকের অনিষ্টই অধিক হয়। যেমন কাহারও হাতের উপর যদি একখানি গুরুভার পাথর পড়ে, তবে ধীরে ধীরে ধৈর্য্যের সহিতই কৌশলে হাতখানি বাহির করিয়া লইতে হয়। তাড়াতাড়ি জোরে টানিয়া বাহির করিতে গেলে চামড়া উঠিয়া গিয়া অধিকতর ক্ষত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। বাবা বলিলেন—সবই সাময়িক। জানিও বিপদও লোকের চিরদিন থাকে না। যেমন ঝড় উঠিলে তখন চতুর্দ্দিকে ভয়ানক বালি উড়ে, আবার বায়ু বন্ধ হইলে সব পরিষ্কার হইয়া যায়; তেমনি বিপদের সময়ও ধৈর্য্যাবলম্বনে সন্তোষের সহিত চুপ করিয়া রহিলে, বিপদ মুক্তির উপায়ও তিনিই মনে যোগাইয়া দিবেন। তখন জীবন আকাশ ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হইয়া পুনরায় সুখের মুখ দেখিতে পাইবে।

মায়ার প্রভাবে জীব এতই আচ্ছন্ন যে, সে বুঝে না, চিন্তা করিয়া দেখে না, সে নিত্যমুক্ত চৈতন্য। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একদিন একটী গল্প বলিলেন,—

এক সিংহ সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে এক নিবিড় ইক্ষুক্ষেত্রে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই ক্ষেত্রের একধারে কয়েকজন কৃষক কাজ করিতেছিল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া দয়ালু ক্ষেত্রস্বামী কৃষকদের কহিলেন, "সন্ধ্যা আস্‌ছে, তোমরা ঘরে যাও।" ইহা শ্রবণান্তে বেতন-ভুক্ কৃষকরা অস্ত্রাদিসহ গৃহে গমনোদ্যত হইল। তদ্দৃষ্টে সিংহ ভাবিল, "আমি কৃষকদের এত নিকটে অবস্থান করিতেছি, তাহা কৃষকরা নিশ্চয়ই বহু পূর্ব্বে অবগত হইয়াছে, কিন্তু তাহা জানিয়াও তাহারা কিছুমাত্র ভীত না হইয়া নিশ্চিন্তমনে কাজ করিয়া যাইতেছিল; এক্ষণে সন্ধ্যা আসিতেছে শুনিবামাত্র তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করিল। অতএব সন্ধ্যা আমা অপেক্ষা ভীষণতর জন্তু হইবে—আমারও আত্মরক্ষা প্রয়োজন।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সিংহ আত্মগোপনার্থে নিবিড়তর জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ মানসে ইক্ষুক্ষেত্র হইতে উঠিল। এই সময় এক রজক তাহার পালিত গর্দ্দভ হারাইয়া বোঝা পৃষ্ঠে গর্দ্দভ অন্বেষণার্থে ইক্ষুক্ষেত্র সন্নিকটে সমুপস্থিত হইল। সিংহ স্থানান্তরে যাইবার সঙ্কল্প করায় ইক্ষুদণ্ড নড়িয়া উঠিল। রজক ভাবিল, তাহার হৃত গর্দ্দভ আত্ম-গোপন করিতেছে। সিংহ ভাবিল, সন্ধ্যা এসে গেছে, আর পালাতে পার্‌লাম না। রজক আসিয়া সিংহকে বাঁধিল প্রহার করিল, ঘাড়ে বোঝা চাপাইল। সিংহ ভয়ে পিষ্ট হইয়া ভাবিল, সন্ধ্যা আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল, এক্ষণে ইহার হুকুমমত না চলিলে আমার উপায় নাই। রজক সিংহের কাণ ধরিয়া টানিয়া গৃহাভিমুখে চলিল। পথে অপর এক সিংহের সহিত বদ্ধ সিংহের দেখা হইল। মুক্ত সিংহ, বদ্ধ সিংহের অবস্থা দেখিয়া সমস্তই বুঝিল। সে কহিল, তুমি কেন আত্মবিস্মৃত হয়েছ ভাই? যে তোমার ভক্ষ্য, তাহার ইঙ্গিতে কেন চলেছ? ভেবে দেখ তুমি কে—

বদ্ধ সিংহ কহিল, চুপ কর ভাই, তুমি সময় থাকিতে পালাও, নইলে সন্ধ্যা তোমাকেও ধরিবে।

মুক্ত সিংহ তখন আরও কিছু উপদেশ দিয়া কহিল, তুমি পিঠের বোঝা ঝেড়ে ফেলে একবার গর্জ্জন করে দেখ দেখি।

তাহার উপদেশানুসারে বদ্ধ সিংহ পৃষ্ঠের বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তচ্ছ্রবণে রজক তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

গল্প শেষ করিয়া বাবা বলিলেন, মুক্ত সিংহই গুরু; তাঁহার উপদেশে বদ্ধ জীব যখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠে, তখন মায়া মূর্চ্ছিত হইয়া তাহার শরণাগত হয়।

একদা কোন এক বাঙ্গালী ভক্ত, বাবাকে বলিতেছিলেন, জ্যোতিষীর গণনামতে তাঁহার আয়ু আর বেশী দিন নাই। ইহা শুনিয়া বাবা বলিলেন, জ্যোতিষীর গণনার উপর নির্ভর করা ভুল, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটী গল্প বলিলেন—

কোন এক স্থানে এক খ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আসন্ন প্রসবা; জ্যোতিষী পূর্ব্বেই গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহার এক পুত্র জন্মিবে। কিন্তু তাহার ভাগ্যাদি কিরূপ হইবে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য ভূমিষ্ঠ কালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গর্ভযন্ত্রণা উপস্থিত হইলে স্ত্রীকে কক্ষমধ্যে রাখিয়া নিজে মসীলেখনীসহ দ্বার-সান্নিধ্যে উপবেশন করিলেন। একটী লেবু ধাত্রীকে দিয়া এই উপদেশ দিলেন যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সে যেন ওই লেবুটী দ্বার বাহিরে নিক্ষেপ করে, এই সঙ্কেতানুসারে লগ্নকাল নির্দ্ধারিত হইবে। যথাকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল; ধাত্রী লেবুটী সজোরে দ্বার-বাহিরে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু লেবু বাহিরে না আসিয়া কপাটে প্রতিহত হইয়া

কক্ষ মধ্যে ফিরিয়া আসিল, ধাত্রী, প্রসূতী ও প্রসূতকে লইয়া ব্যস্ত ছিল; সে তাহাদের ছাড়িয়া লেবু অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। লেবুটী সংগ্রহ করিয়া সে পুনরায় তাহা নিক্ষেপ করিল। এবার তাহা বাহিরে আসিয়া জ্যোতিষীকে জন্মসময় জানাইল, কিন্তু যে নক্ষত্রের ভোগ্যাংশের শেষভাগে শিশু প্রকৃতই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহা তখন চলিয়া গিয়াছে, অন্য নক্ষত্র তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। জ্যোতিষী তাহা অবগত হইতে না পারিয়া গণনা করিয়া দেখিলেন, যে সময় লেবু তাঁহার সান্নিধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই সময় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সে পিতৃঘাতী হয়, তাহার মুখদর্শন করিলে পিতার মৃত্যু হয়। শিশু গণ্ডযোগে জাত হওয়ায় তাহার অথবা তাহার জনকের মৃত্যু অনিবার্য্য। নিয়তির এই বিধানকে অতিক্রম করা যায়, যদি পিতা পুত্রে সাক্ষাৎ না ঘটে। অনেক গবেষণার পর জ্যোতিষী পুত্রকে বিসর্জ্জন না দিয়া নিজেই গৃহত্যাগ করিলেন।

এ দিকে শিশু শশীকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শৈশব গত হইয়া কৈশোর আসিল; তাহার রূপ ও গুণ দেখিয়া গ্রামের লোক মুগ্ধ হইল; তাহার মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি দৃষ্টে শিক্ষকেরা আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে পণ্ডিত গড়িয়া তুলিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া সে জ্যোতিষ শাস্ত্র শিখিতে লাগিল। পিতৃপরিত্যক্ত দুর্ল্লভ গ্রন্থ গৃহে ছিল; একে একে অল্প সময় মধ্যে সে সকল অধীত হইল,—যুবক অচিরে মহাজ্যোতিষী হইয়া দেশ মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিল।

তদনন্তর যুবক পিতার অন্বেষণার্থে গৃহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিল। মাতা তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলে সে কহিল, আমি গণনা করিয়া দেখিয়াছি পিতা জীবিত আছেন এবং আমি অচিরে তাঁহার

দর্শন পাইব ; ইহাও আমি আশা রাখি যে, তাঁহাকে লইয়া আমি সত্বর গৃহে ফিরিতে পারিব।

জননী আর কোন বাধা না দিয়া আশা-উৎফুল্ল অন্তরে পুত্রকে বিদায় দিলেন। পিতা কোন্ দিকে অবস্থান করিতেছেন তাহা গণনা দ্বারা স্থির করিয়া লইয়া পুত্র গৃহত্যাগ করিলেন। বহুদেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক রাজ্যের রাজধানীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন প্রাতঃকাল। তিনি দেখিলেন, বহু ব্যক্তি রাজপুরী অভিমুখে ছুটিতেছে। তদ্দৃষ্টে তিনি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। শুনিলেন, রাজ-গৃহে এক অসাধারণ জ্যোতিষী আসিয়া গণনা করিয়া বলিয়াছেন, মধ্যাহ্ন কালে আকাশ হইতে এক জীবিত মৎস্য ভূপৃষ্ঠে পড়িবে। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিবার জন্য বহু লোক রাজপুরীতে সমবেত হইয়াছে। যুবক জ্যোতিষীও তাহাদের মত এই ব্যাপার দেখিবার জন্য রাজপুরীতে গমন করিলেন।

তখন মধ্যাহ্নের কিছু বিলম্ব আছে দেখিয়া যুবক গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গণনা করিয়া দেখিলেন, মৎস্য আকাশ হইতে সত্যই পড়িবে, কিন্তু ঠিক মধ্যাহ্নে নয়—মধ্যাহ্নের অৰ্দ্ধ দণ্ড পরে। এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ জ্যোতিষী বলিয়াছেন মধ্যাহ্নকালে আকাশ হইতে মৎস্য পড়িবে ?"

এক প্রৌঢ় ব্যক্তি উঠিয়া বলিলেন, "আমি বলিয়াছি।"

যুবক। আপনার গণনায় ভুল হইয়াছে—কিছুকাল পরে আপনি তাহা উপলব্ধি করিবেন।

"তুমি কি বলিতে চাও, বালক ?"

"মৎস্য পড়িবে ঠিক, কিন্তু মধ্যাহ্নের অৰ্দ্ধদণ্ড পরে।"

ক্রমে মধ্যাহ্ন আসিল, কিন্তু মৎস্য পড়িল না। মধ্যাহ্ন অতীত

হইয়া অর্দ্ধদণ্ড হইবামাত্র মৎস্য ধরাপৃষ্ঠে বিপুল শব্দে পড়িল। নবাগত জ্যোতিষীর গণনা ঠিক হইল দেখিয়া রাজা তাহাকে সসম্মানে অমাত্য-বর্গের পার্শ্বে স্থান দিলেন। প্রৌঢ় জ্যোতিষী একটু সঙ্কুচিতভাবে স্বীয় আসনে উপবিষ্ট রহিলেন। যুবক তখন প্রৌঢ়ের সমীপাগত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন; কহিলেন, "আপনি আমার পিতা—"

"সে কি! তুমি কিরূপে তাহা বুঝিলে?"

"যিনি গণনা দ্বারা বলিতে পারেন মধ্যাহ্নকালে আকাশ হইতে মৎস্য পতিত হইবে, তিনি আমার জন্মদাতা ছাড়া অপর কেহ হইতে পারেন না।"

"আমার গণনা ঠিক হয় নাই, তুমিত তাহা দেখাইলে।"

"আপনার গণনা ঠিকই হইয়াছে—ঠিক মধ্যাহ্নকালে মৎস্য আকাশচ্যুত হইয়াছিল, কিন্তু বাতাস ঠেলিয়া এতটা পথ আসিতে তাহার যে সময় লাগিবে আপনি তাহা হিসাবের মধ্যে আনেন নাই। এইরূপেই আপনি ভ্রান্ত হইয়াছিলেন আমার জন্মলগ্ন নির্দ্ধারণে—"

প্রৌঢ় জ্যোতিষীর তখন আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, এই যুবক তাঁহার ঔরসজাত পুত্র। উভয়ে তখন মহানন্দে মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিলেন।

গল্প শেষ করিয়া বাবা বলিলেন, জ্যোতিষীর গণনার উপর নির্ভর করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ভুল—গণনা বহুক্ষেত্রে ভুল হয়।

অতঃপর এক ক্রোধপরায়ণ শিষ্যকে কহিলেন, "ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কোন ফল নাই, ধৈর্য্যদ্বারা ফল লাভ হয়।" ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটী গল্প বলিলেন:—

কোন এক গ্রামে এক কলহপ্রিয়া রমণী ছিল,—কলহ না করিয়া সে থাকিতে পারিত না—কারণ-অকারণে নিয়ত সে কলহ করিয়া গ্রামের

লোককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। অবশেষে গ্রামস্থ ব্যক্তিরা উক্ত রমণীর সহিত এক রফা করিল। রফার সর্ত্ত হইল এই, এক এক ঘরের সহিত এক এক দিন পালাক্রমে রমণী কলহ করিবে—সকলের সহিত একদিনে নয়। এক ছোট পুকুরের একদিকে কলহপ্রিয়া রমণী দাঁড়াইবে, বিপরীত দিকে যে বাড়ীর পালা, সেই বাড়ীর একজন প্রতিনিধি আসিয়া কলহদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইবে।

পালা পড়িল একদিন এক নিরীহ গৃহস্থের; সে দিন আবার তাহার গৃহে নব পরিণীতা বধূ আসিয়াছে। বাড়ীতে সে কারণে আনন্দোৎসব হইলেও শাশুড়ীর বদন বিষাদাচ্ছন্ন। স্নেহময়ী বধূ তাহা লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আপনার মুখ এত বিষণ্ণ কেন?" শ্বশ্রূ এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে কহিল, "আজ আমার ঝগড়ার পালা—তাই বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি; কলহপ্রিয়া রমণী অতিশয় দুর্ম্মুখ।" বালিকা তখন ধরিয়া বসিল, সে তাহার শাশুড়ীর পরিবর্ত্তে কলহ করিতে যাইবে। শাশুড়ী বধূকে নিরস্ত করিবার অনেক প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু বধূ নিরস্ত না হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমুপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া কলহপ্রিয়া রমণী রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে পুষ্করিণীর অপর পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুদ্র বালিকা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া কলহপ্রিয়া বাছাবাছা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বালিকা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না,—সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বধূর তরফ হইতে কোন উত্তর না পাইয়া রমণী ক্ষণপরে ক্ষান্ত হইল। সে ক্ষান্ত হইবামাত্র বধূ দুই হস্ত তুলিয়া ইঙ্গিতে জানাইল, তুমি চুপ কর। তদ্দর্শনে কলহপ্রিয়া আরও গর্জ্জিয়া উঠিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বধূর নিকট হইতে কোনরূপ প্রতিবাদ না আসায় ক্ষণপরে রমণী ক্ষান্ত হইল। ক্ষান্ত হইতে না

হইতে বধূ হস্তদ্বয় উত্তোলিত করিয়া পূর্ব্ববৎ ইঙ্গিত করিল। তদ্দৃষ্টে রমণী আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করায় কলহপ্রিয়া রমণী ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাহার কণ্ঠও আহত হইয়া, বাক্‌রুদ্ধ হইল। তখন সে ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "অদ্যাবধি আমি কাহারও নিকট পরাস্ত হই নাই, আমি তোমার নিকট আজ পরাজয় স্বীকার করিতেছি।"

বধূ কহিল, "আমি যে আপনার মেয়ে—"

রমণী চমৎকৃত হইল, তদবধি বধূকে সে স্নেহ-নয়নে দেখিতে লাগিল এবং কাহারও সহিত আর কলহ করিত না।

এইরূপে বাবা আমাদের ধৈর্য্য ও বিনয় শিক্ষা দিয়া বলিলেন, যাহার ধৈর্য্য নাই, তাহার কৃতকার্য্যতা নাই। ধৈর্য্য বিনা তপস্যা চলে না; কত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সফলকাম হইতে হইবে, সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে হইবে। শ্রীরামচন্দ্র শিক্ষা দিলেন, সত্যধর্ম্ম; দধীচি পরোপকার, শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম ধর্ম্ম, শঙ্করাচার্য্য জ্ঞান, শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তি, শাক্যসিংহ ত্যাগ ও দৃঢ়তা, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দৃঢ়তার সহিত কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ও ব্যাকুল আগ্রহে গাঢ় ভক্তি-পূর্ব্বক উপাসনা ধ্যান শিক্ষা দিয়া আমাদের সম্মুখে আদর্শ পুরুষরূপে দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহাদের শিক্ষা, তাঁহাদের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইলে আমাদের বিপথে চলিবার আশঙ্কা থাকে না। ত্যাগ ও বৈরাগ্য আসিবে যখন অভাব-বোধ থাকিবে না। বাবা বলিলেন, যাহার অভাব-বোধ আছে, সেই প্রকৃত কাঙ্গাল; যাহার অভাব-বোধ নাই, সেই রাজা। যে ব্যক্তি অভাব-বোধের স্তর অতিক্রম করিয়াছে, যাহার অন্তরে কোন তৃষ্ণা বা কামনা নাই, সেই ব্যক্তি শান্তি ও সন্তোষ লাভ করিয়াছে।

"যিস্‌কা মন্‌মে সন্তোষ হ্যায়, সো শাহানসাহ।' ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটী দৃষ্টান্ত দিলেন। কোন দেশে এক অবধূত ছিলেন। তিনি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কোন স্থানে স্থির থাকিতেন না। তাঁহার গৃহ ছিল না, আত্মীয়-স্বজন ছিল না, জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় ছিল না। উপায় না থাকিলেও তিনি কাহারও দ্বারে ভিক্ষা করিতেন না, কাহারও নিকট আহার্য্য বা আশ্রয় যাচ্ঞা করিতেন না। কেননা, তাঁহার অভাব-বোধ ছিল না। ক্ষুধার্ত্ত হইলে ফল মূল দ্বারা সে কার্য্য সমাপন করিতেন, অভাবে গৃহীদের দ্বারপার্শ্বে নিক্ষিপ্ত ভুক্তাবশিষ্ট যাহা কিছু থাকিত তাহাই গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। এইরূপ ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিতে তাঁহার কোন সঙ্কোচ বা ঘৃণা হইত না।

একদা এক রাজবাটীতে যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল এবং বহু ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভুক্তাবশেষ যাহা কিছু ছিল তাহা রাজবাটীর সন্নিকটে একস্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অবধূতজী সেই ভুক্তাবশেষ সানন্দচিত্তে ভোজন করিতেছিলেন, দৈবাৎ রাজা তাহা দেখিতে পাইয়া ভৃত্যদ্বারা সাধুকে ভিতরে আসিয়া আহার করিতে আমন্ত্রণ করিলেন। সাধু কহিলেন, আমি কাহারও বাড়ী যাই না। রাজার নিকট ভৃত্য সে সংবাদ দিলে রাজা কহিলেন, সাধুকে কিঞ্চিৎ আহার্য্য দিয়ে এস। আহার্য্য আনিয়া ভৃত্য দিতে চাহিলে সাধু কহিলেন "কই কাঙ্গালকো দে দেও।" রাজা বিস্মিত হইয়া ভৃত্যদ্বারা সাধুকে দুইটি টাকা পাঠাইয়া দিলেন। সাধু তদ্প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজ মনে আহার করিয়া যাইতে লাগিলেন, ভৃত্য সাধুর হাত টানিয়া ধরিয়া টাকা দিতে চেষ্টা করিলে সাধু হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া কহিলেন, 'কই কাঙ্গালকো দে দেও।'

ভৃত্য রাজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া সকল কথা নিবেদন করিলে,

রাজা ভাবিলেন এই টাকা সামান্য ভাবিয়া সাধু ফিরাইয়া দিয়া থাকিবেন। আমার দ্বারপার্শ্বে এক সাধু আজ এই যজ্ঞের দিনে অভুক্ত অবস্থায় ফিরিবে ইহা অতীব লজ্জার কথা। মনে মনে ইহা বিচার পূর্ব্বক রাজা এক কর্ম্মচারী দ্বারা সাধুকে একশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। কর্ম্মচারী টাকা আনিয়া সাধুকে দিতে গেলে সাধু আপন মনে নির্ব্বিকারচিত্তে ভুক্তাবশেষ খাইয়া যাইতে লাগিলেন এবং কর্ম্মচারীর প্রতি চাহিয়াও দেখিলেন না। তখন সে সাধুর মাথা ধরিয়া টানিয়া কহিল, রাজা তোমার দুঃখে কাতর হইয়া এই অর্থ তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সাধু পূর্ব্ববৎ কহিলেন, 'কই কাঙ্গালকো দে দেও।' কর্ম্মচারী ফিরিয়া গিয়া রাজার নিকট সকল কথা বলিলে রাজা কহিলেন "সাধুর উপযুক্ত এই টাকা হয় নাই; অতএব খাজাঞ্চি তুমি এক সহস্র টাকা লইয়া দিয়া এস।"

রাজার আদেশে খাজাঞ্চি ঐ টাকা লইয়া সাধুর নিকট আসিল এবং তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত বিপুল চেষ্টা করিল। অবশেষে সাধু তাহার প্রতি চাহিয়া পূর্ব্ববৎ কহিলেন, 'কই কাঙ্গালকো দে দেও।' বলিয়া তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে ভুক্তাবশেষ ভোজন করিতে লাগিলেন। এদিকে খাজাঞ্চি ফিরিয়া গিয়া রাজার নিকট সকল কথা বলিলে রাজা স্থির করিলেন, এ সাধু নিশ্চয় কোন উচ্চস্তরের—হাজার টাকার লোভ সংবরণ করা সামান্য ব্যক্তির কার্য্য নয়। অতএব এবার আমি দশহাজার টাকা লইয়া নিজেই যাইব। তাঁহার আদেশে দেওয়ান দশহাজার মুদ্রা লইয়া সঙ্গে চলিল। কিন্তু অবধূতজী রাজার পানে চাহিয়াও দেখিলেন না, নিবিষ্টমনে বাছিয়া বাছিয়া ধীরে ধীরে খাইয়া যাইতে লাগিলেন। রাজা সাধুকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "সাধুজি আপনার জন্য আমি দশ সহস্র মুদ্রা আনিয়াছি, আপনি গ্রহণ করুন, প্রয়োজন হয় আরও

দিতে প্রস্তুত আছি।" সাধু ফিরিয়াও চাহিলেন না, বা কোন উত্তরও দিলেন না। রাজা পুনঃ পুনঃ বলাতে সাধু আগ্রাহভরে কহিলেন, 'কই কাঙ্গাল কো দে দেও।'

তখন রাজা কহিলেন, তুমিই ত কাঙ্গাল, আমার রাজ্যে তোমার মত কাঙ্গাল আর কেহ নাই।

সাধু,—আমি কাঙ্গাল!

রাজা,—নিশ্চয়ই, নতুবা তুমি উচ্ছিষ্ট খাইয়া বেড়াইবে কেন?

সাধু,—তুমি বুঝি এ রাজ্যের রাজা?

রাজা,—হ্যাঁ।

সাধু,—আচ্ছা আমি যদি তোমাকে কয়েক লক্ষ টাকা প্রদান করি, তাহা হইলে তুমি তাহা গ্রহণ কর?

রাজা,—নিশ্চয়ই লই; আপনি কৃপা করে যদি দেন—

সাধু,—তোমার ভাণ্ডারে যত ধন-দৌলত, মণি-মাণিক্য আছে, তত ধন-দৌলত আমি যদি তোমাকে প্রদান করি—

রাজা মহাপুলকিত চিত্তে সাধুকে প্রণাম করিয়া কহিলেন "আপনি দয়া করিয়া যদি আমাকে এই সব দেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।"

অবধূতজী তখন হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "কে কাঙ্গাল এইবার বুঝিতে পারিতেছ কি? তোমার এত ধন-দৌলত থাকা সত্ত্বেও তুমি অভাব-বোধ করিতেছ; আর আমার কিছু না থাকিলেও আমি অভাব-বোধ করিতেছি না। যাহার অভাব-বোধ আছে সেই কাঙ্গাল; আর যাহার অভাব-বোধ নাই, সেই রাজা। মনে সতত সন্তোষ রাখিবে, অভাব-বোধ-ভাব ত্যাগ করিবে, তবে তুমি রাজা হইতে পারিবে।"

এই বলিয়া সাধু প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় তরঙ্গ

একদা বাবা বলিলেন,—

শান্তি তুল্যং তপোনাস্তি ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্।
নচ তৃষ্ণায়াঃ পরমো ব্যাধিঃ নচ ধর্ম্ম দয়া সমম্॥

অর্থাৎ শান্তি তুল্য তপ নাই, সন্তোষ তুল্য সুখ নাই, তৃষ্ণা তুল্য ভীষণ ব্যাধি নাই এবং দয়ার ন্যায় ধর্ম্ম নাই।

কিন্তু এই ব্যাধি, এই তৃষ্ণার কবল হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করি? এই দেহ-মন্দির হইতে বাসনা কামনা দূরীভূত না হইলে ত শান্তি বা বা সন্তোষ আসিবে না। কিন্তু এই পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে কি বাসনার নির্ব্বাসন সম্ভব? শুনিতে পাই যাঁহারা অবধূত, তাঁহারা নাকি বাসনা-শূন্য।* পরমহংসর অবস্থা আরও উচ্চতর, শ্রীমন্মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—সন্ন্যাসীরা পরমহংস অবস্থায় আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা শূকরবিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিবে। বিনা প্রার্থনায় যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন করিতে হইবে। কোনরূপ বাসনা মনে জাগিবে না। আচ্ছাদনোপযোগী বস্ত্রাদি পাওয়া না গেলে দিগম্বর অবস্থায় থাকিতে হইবে। এ অবস্থায় সন্ন্যাসী ভাবাভাব রহিত হইয়া যাইবেন। বিনা চেষ্টায় তাঁহাদের প্রকৃতি এইভাবে গঠিত হইবে। যিনি আত্মব্রহ্মময় হইয়া নির্ব্বাক, স্তব্ধ, জড় বা বালভাবাপন্ন হইয়া সর্ব্বদা

---

* অবধূত;—'অ' অর্থে আশপাশ বিনির্ম্মুক্ত আদি মধ্যঅন্ত নির্ম্মল, 'ব' অর্থে বাসনাবর্জ্জিত, 'ধূ' অর্থে ধূলিধূসরিত গাত্র ধূতচিত্ত নিরাময়, 'ত' অর্থে তত্ত্বচিন্তাকারী চিন্তাচেষ্টাবিবর্জ্জিত অহঙ্কারমুক্ত।

ব্রহ্মানন্দে গদগদ হইয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মকোটি পরমহংস ; আর যিনি ঈশকোটী জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবানের প্রতিনিধিরূপে নিষ্কামব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মবিস্মৃত হইয়া বিশ্বের কল্যাণকর কার্য্যে সতত নিয়োজিত থাকেন, তিনি ঈশকোটী পরমহংস—সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ।*

এই অবস্থা—দেবতা ও ঋষি আকাঙ্ক্ষিত অবস্থা আমরা কোথায় পাইব ? তবে কি আমাদের বাসনার কবল হইতে মুক্তি পাইবার আশা নাই ? বাবা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যত ভোগ আছে তাহার কিছুই চায় না, যাহার মনে কোন আকাঙ্ক্ষা নাই এবং যে মননশীল মুনি বেদের গূঢ়ার্থ জ্ঞাত আছে, তাঁহারই প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। বাবা বলিলেন, তীব্র বৈরাগ্য জন্মিলে তবেই বাসনার সংহার হয়। এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছিলেন,—

কোন এক রাজার অন্তরে সহসা তীব্র বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া তিনি অরণ্যবাসী হইবার সঙ্কল্প করিলেন। রাজার আকস্মিক এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া রাণী বজ্রাহত হইলেন। রাণী রাজাকে কহিলেন, আপনি কি নিমিত্ত সংসার ত্যাগের বাসনা করিয়াছেন ? আপনি কি স্থির করিয়াছেন সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইলে আপনি অধিকতর সুখ লাভ করিবেন ? ইহা আপনার ভ্রম। নিশ্চিত ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের পিছনে ছুটিলে আপনি প্রাপ্ত সুখও হারাইতে পারেন। একটা কথা আছে 'দুবিধামে দুনো গেয়ে, মায়া মিলে না রাম।' অর্থাৎ দুই দিকে মন দিলে সংসার সুখ ভোগ হয় না, রামও মিলে না। যেমন—'ইত্‌কে না উৎকে, বিচ্‌মে খাবে কুৎকে।' অর্থাৎ এদিকেও না, ও-দিকেও না,

* জ্ঞান-প্রদীপ।

মাঝ পথে কেবল লাঠি খাওয়াই সার। অর্থাৎ দুই দিকে দেখিতে গেলে সংসার ভোগও ঠিক হয় না এবং বৈরাগীর কর্ত্তব্যও ঠিকমত পালন হয় না। আপনি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন।

রাজা কহিলেন, আমি দৃঢ়-সঙ্কল্প রাণি !

রাণী উত্তর করিলেন, আমি আপনাকে একটী গল্প বলি, মন দিয়া শুনুন :—

এক সময়ে নদীকূলে নির্জ্জন বনমধ্যে বৃক্ষাশ্রয়ে এক বানর দম্পতি সুখে বাস করিত। ক্ষুধার সময় বৃক্ষফল ও নব পত্র ভক্ষণ করিয়া তাহারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত এবং তৃষ্ণার সময় নির্ম্মল নদী-জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিত। চারিদিকে মহান্ দৃশ্য ; উচ্চবৃক্ষচূড়ে থাকিয়া সানন্দে তাহা উপভোগ করিত। তাহাদের সুখে বাধা দিতে কেহই ছিল না।

একদা ঊষা সমাগমে—দিবা ও রাত্রির মিলন কালে সহসা এক দৈব-বাণী শ্রুত হইল। দম্পতি বিস্ময়ে শুনিল বাণী বলিতেছে,—এই মুহূর্ত্তে যদি কেহ নদীজলে অবগাহন স্নান করে তাহা হইলে সে দিব্য মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করিবে। ইহা শুনিবামাত্র বানর-দম্পতি প্রলোভিত হইয়া নদীতে নামিল এবং অবগাহন স্নান করিল। নদীকূলে উঠিয়া দেখিল তাহারা দিব্য মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছে। আনন্দে অধীর হইয়া তাহারা বনে জঙ্গলে বিচরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সমাগমে যখন আলো নিবিয়া অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, তখন তাহারা পুনরায় দৈববাণী শুনিল। বাণী বলিতেছে, এই মুহূর্ত্তে যদি কেহ জলে অবগাহন স্নান করে তাহা হইলে সে দেবদেহ প্রাপ্ত হইবে, অথবা সে পশুদেহ লাভ করিবে। মানব বা বানর প্রলুব্ধ হইয়া স্নানোদ্যত হইল ; বানরী বা মানবী নিষেধ করিয়া কহিল, এই ত আমরা সুন্দর মনুষ্য দেহ পাইয়াছি, এই দেহ পাইয়া আমাদের সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। অনিশ্চিতের পশ্চাতে

ছুটিলে আমাদের হয়ত এই নিশ্চিত হারাইতে হইবে। মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া আমাদের সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। লোভে পড়িলে, হয়ত আমরা পশুযোনি পুনরায় লাভ করিতে পারি।

বানর বা মানব তাহার স্ত্রীর উপদেশ গ্রহণ করিল না; তাহার লোভ অতি প্রবল। সে অনিশ্চিত সুখের চিত্রে প্রলুব্ধ হইয়া স্নানার্থে স্ত্রীর হাত ধরিয়া নদীগর্ভে নামিল। স্নানান্তে দেখিল, তাহারা আবার পশুদেহ লাভ করিয়াছে।

মহিষী এই গল্পটী বলিয়া রাজাকে কহিলেন, আপনি বুদ্ধিমান্, বুঝিয়া দেখুন, আপনি যে অনিশ্চিত সুখের আশায় এই ভোগবিলাসময় সংসার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আপনি হয়ত পরিণামে উভয় সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া অনুতপ্ত হইবেন।

রাজা কহিলেন, সঙ্কল্প করিয়াছি অনিশ্চিত আনন্দের পশ্চাতে আমি ছুটিব, না পাই জীবন দিব। শোন রাণি, এই সঙ্কল্পই আমার প্রাণ। তোমাকে একটী গল্প বলি মন দিয়া শোন।

আকবর বাদশার নাম শুনে থাক্‌বে। তাঁর নয় জন জ্ঞানী মন্ত্রী ছিল। বিক্রমাদিত্যের যেমন নবরত্ন ছিল, আকবরেরও তেমনি নয় জন মন্ত্রী ছিল। কিন্তু এই অমাত্য নিচয়ের মধ্যে বীরবলই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ছিলেন। বাদশাও তাঁকে সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করতেন। আকবরের এই পক্ষপাতিত্ব মুসলমান মন্ত্রীরা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা একদিন পরামর্শ করে বাদশাকে বল্‌লেন, "মছলিম সম্রাটের নিকট হিন্দু অমাত্যের কেন প্রাধান্য থাকিবে? আমরা কি বিদ্যা-বুদ্ধিতে কোনও হিন্দুর চেয়ে কম? আমাদের উপযুক্ততা কোনো অংশে কম? তবে কেন আপনি আমাদের ঠেলে বীরবলকে সমধিক স্নেহ করেন? আমাদের বিনীত প্রার্থনা, আপনি তা'কে সরিয়ে

দিন।" বিচক্ষণ নরপতি সহাস্তে বলিলেন, "আমি যখন যা জিজ্ঞাসা করিব, তা'র যথাযথ উত্তর দিতে পারিবে ত? পরামর্শ দিয়ে আমার সন্তোষ বিধান করিতে পারিবে ত? যদি পার, তবে তোমাদের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখ্‌ব।"

মন্ত্রীরা মস্তক আন্দোলন করত বল্‌লে, "নিশ্চয় পারিব, বীরবলের চেয়ে ভাল পরামর্শ দিব। পরীক্ষা করে দেখুন।"

বাদশা 'আচ্ছা' বলে তাদের বিদায় দিলেন এবং নিভৃতে বীরবলকে ডেকে বল্‌লেন, "তুমি কয়েক দিন আমার দরবারে আসিবে না। প্রয়োজন হ'লে তোমাকে ডেকে পাঠাব।

বীরবল বুঝিতে পারিলেন, বাদশার কোন উদ্দেশ্য আছে, তিনি কিছু না বলিয়া বিদায় হইলেন।

তারপর একদিন বাদশা তাঁহার মছলিম মন্ত্রীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা বল দেখি, জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু কি?"

১ম মন্ত্রী। নিজের জীবন।

২য় মন্ত্রী। স্ত্রী।

৩য় মন্ত্রী। পুত্র।

৪র্থ মন্ত্রী। রাজ্য ও ক্ষমতা।

৫ম মন্ত্রী। যশঃ ও খ্যাতি।

বাদশা বলিলেন, "তোমরা কেহই সদুত্তর দিতে পারিলে না। বীরবল থাকিলে নিশ্চয় দিতে পারিত। আচ্ছা, আমি তোমাদের সাত দিন সময় দিলাম। ইহার মধ্যে সদুত্তর চাই। যদি দিতে না পার, তোমাদের দণ্ড বিধান করিব। মনে থাকে যেন অষ্টম দিন প্রাতে সদুত্তর চাইই।"

মন্ত্রীরা মাথায় হাত দিয়া পড়িলেন, কোনই সদুত্তর খুঁজিয়া

পাইলেন না। নিজ নিজ গৃহে গিয়া অনেক চিন্তা করিলেন। উত্তর দিতে না পারিলে হয়ত তাঁদের প্রাণ যাইবে। তাঁহারা তখন একবার মনে করিলেন, বীরবলকে না তাড়ালেই ভাল ছিল, সে নিশ্চয়ই উত্তর দিতে পারিত ; তাহা হইলে আমাদের আজ এ সঙ্কটে পড়িতে হইত না। কাহারও কাহারও মনে অনুতাপ উপজিত হইল। কাহারও অনিষ্ট করিতে গেলে নিজের অনিষ্ট আগে হয়, এ প্রবাদবাক্য তাহাদের স্মরণ হইল। চিন্তা করিতে করিতে ছয় দিন চলিয়া গেল, কিন্তু কোনও উপায় বা উত্তর তাঁহাদের মাথায় আসিল না। তখন তাঁহারা সপ্তম দিবসে একত্র মিলিত হইয়া স্থির করিলেন, এ বিপদ হইতে খোদাতালা উদ্ধার না করিলে তাঁহাদের আর কোন উপায় নাই। তাঁহারা তখন আল্লার দুয়ারে ধর্ণা দেওয়া স্থির করিলেন। অরণ্য মধ্যে নির্জ্জন স্থানে এক মসজিদ ছিল। সন্ধ্যা সমাগত হইলে তাঁহারা একত্রে মসজিদ অভিমুখে চলিলেন।

এদিকে বীরবল সমস্ত সংবাদ প্রতিদিন পাইতেছিলেন। মন্ত্রীরা যে মসজিদে গিয়াছেন, তাহাও তিনি গুপ্তচর মুখে শুনিতে পাইয়াছিলেন। তখন তিনি সাধারণ বেশ ত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশ গ্রহণ করিলেন। কৃত্রিম গোঁফ দাড়ি, ভূমিচুম্বিত আচ্‌কান, মোল্লাদের উপযোগী শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি পরিধান করিয়া তিনি মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মন্ত্রীরা চমকিত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, খোদা বুঝি তাঁহাদের বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার মানসে স্বর্গ হইতে দূত বা পীরকে পাঠিয়েছেন। তাঁহারা মহাসমাদরে পয়গম্বর প্রেরিত দূতকে অভ্যর্থনা করত শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইলেন ; অতঃপর তাঁহাদের দুঃখের কথা নিবেদন করিতে উদ্যত হইলে ছদ্মবেশী বীরবল বলিলেন, "তোমাদের বিপাকের কথা আমি সবই অবগত আছি ;

সম্রাটের সাম্‌নে গিয়া আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিব—তোমরা নির্ভয় হও।"

অমাত্যনিচয় মহাপুলকিত হইয়া গৃহ হইতে তৎক্ষণাৎ মহার্ঘ পালঙ্ক আনিলেন। তদুপরি উত্তম শয্যা বিস্তার করত পীরকে মহাদরে তদুপরি বসাইয়া প্রাসাদের দিকে নিজেরাই লইয়া চলিলেন। মন্ত্রীদের স্কন্ধে বাহিত হইয়া পীর সাহেব অচিরে প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাত্রি তখন প্রায় দেড় প্রহর। পীর তাঁহার বাহকদের উপদেশ দিলেন, "আমি গাইতে থাকি, তোমরা আমার গানের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটিতে থাকো।"

বলিয়া পীর গান ধরিলেন,—

'দুনিয়ামে মতলব পিয়ারা হ্যায়',
'এ দুনিয়ামে মতলব সব্‌সে পিয়ারা হ্যায়।'

পীরের উপদেশ অনুসারে মন্ত্রীরা গানের সঙ্গে তাল রাখিয়া দরবার কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। পীর পালঙ্কের উপর আরামে বসিয়া অমাত্য-স্কন্ধে বাহিত হইয়া চলিয়াছেন। মন্ত্রীদের দেখিয়া সৈন্য সামন্ত ভৃত্য বান্দা পথ ছাড়িয়া দিল। তাঁহারা অবশেষে পালঙ্ক-স্কন্ধে বাদশার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "শাহানশা, আমরা এই পীর সাহেবকে মাথায় করিয়া বহন করিয়া আনিয়াছি, ইনি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।"

তীক্ষ্ণ নয়ন বুদ্ধিমান্ বাদ্‌শা বীরবলের ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। বীরবলও বুঝিতে পারিয়াছিলেন বাদ্‌শা তাঁহাকে চিনিয়াছেন। তিনি ঈষৎ নতমস্তকে বাদ্‌শাকে অপরের অজ্ঞাতসারে অভিবাদন করিয়াছিলেন; তদ্‌পূর্ব্বে বাদশা, ভ্রমে পড়িয়া পীরকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়াছিলেন! এক্ষণে মন্ত্রীরা

যখন বলিলেন, 'সম্রাট, এই পীর সাহেব আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন, তখন বাদ্‌শা বলিলেন, "আমি বীরবলের মুখে পূর্ব্বেই উত্তর শুনিয়াছি।"

বাদশার প্রমুখাৎ ইহা শুনিয়া তাঁহারা উত্তমরূপে পীরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন যাহাকে তাঁহারা পয়গম্বরের দূত মনে করিয়া এতক্ষণ সম্মান দিয়া আসিলেন, সেই ব্যক্তি অপর কেহ নয়—তাহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বীরবল। তাঁহারা এ যাবৎ এতই উদ্বিগ্ন ও বিচলিত ছিলেন যে, ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া বীরবলকে চিনিবার মত শক্তি তাঁহাদের ছিল না। এক্ষণে বাদশার কথা শুনিয়া তাঁহারা হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সম্রাট বলিলেন, "মতলব সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে বড়। কার্য্যসিদ্ধির জন্যেই সব উদ্যোগ আয়োজন। আমি যে এত কর্ম্মচারী, এত সৈন্য রেখেছি, তার প্রধান উদ্দেশ্য এই রাজ্য পরিচালনা। এই পরিচালনা কার্য্য আমার উদ্দেশ্য। মতলব, অর্থাৎ সঙ্কল্প। এর চেয়ে প্রিয় বস্তু আমার কিছু নাই; সঙ্কল্প সিদ্ধির চেয়ে প্রিয় আর কিছু জগতে লোকের থাকিতে পারে না। তোমরা কেহ, যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে না, বীরবল অনায়াসে তা' দিল। বীরবল বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্, এই জন্যেই তাহাকে আমি বিশেষ স্নেহ যত্ন করি ও একরূপ প্রধান মন্ত্রী করিয়া রাখিয়াছি। তোমরাও অন্য নিজের মতলব সিদ্ধির জন্যই তাহাকে একেবারে পীর করিয়া আনিয়াছ।"

এই গল্প শেষ করিয়া রাজা বলিলেন, "মহিষি, আমার সঙ্কল্পই আমার প্রিয় বস্তু। আমি সঙ্কল্প করেছি, গৃহত্যাগ করে গিরিগুহায় বা জনশূন্য অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক ভগবৎ আরাধনা করিব।"

রাণী কহিলেন, রাজন্, আপনার আজও যখন বাসনা, সঙ্কল্প, তৃষ্ণা রয়েছে, তখন আপনার পক্ষে পূর্ণ জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই।

রাজা। আমার তৃষ্ণা নাই, বিষয়ানুরাগ নাই—আমি মায়া-মুক্ত পুরুষ।

রাণী। সে গর্ব্ব আপনি করিবেন না। মায়া ত্যাগ বড় কঠিন কার্য্য। এসম্বন্ধে তবে একটা গল্প বলি শুনুন। একদা এক অরণ্যানী-বেষ্টিত পাহাড়ের মাথায় এক মহাযোগী শিলাপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার প্রাণে আনন্দ, হৃদয়ে শান্তি সতত বিরাজ করিত। তিনি চতুর্দ্দিকের শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভগবৎ চিন্তায় বিভোর হইলেন; এমন সময় দেখিলেন, এক তেজঃপুঞ্জ ব্যক্তি পাশ-হস্তে দ্রুতপদে গমন করিতেছেন। সাধু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

"আমি মায়া—কখন পুরুষ, কখন স্ত্রীরূপে দর্শন দিয়া থাকি।"

"আপনার হাতে কি?"

"পাশ—ইহা দ্বারা আবদ্ধ করি।"

"সাধুদেরও কি ইহা দ্বারা আবদ্ধ করেন?"

"তোমাদের মত সাধুদের আবদ্ধ করিতে পাশের প্রয়োজন হয় না। ইহা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জন্য।"

"আমরা সংসার ত্যাগ করেছি, ভোগ বিলাসের স্পৃহা বর্জ্জিত হয়েছি—তথাপি কি আপনার মায়াজাল ছিন্ন করতে পারি নি?"

মায়া একটু হাসিয়া প্রস্থান করিলেন।

কয়েকদিন পরে সাধু শৈলপৃষ্ঠে উপবিষ্ট অবস্থায় শুনিতে পাইলেন, দূরে যেন কে গান করিতেছে; সেই সঙ্গে সুমিষ্ট গন্ধও তাঁহার নাকে আসিল। তিনি এতদিন এই নির্জ্জনে বাস করিতেছেন, কখন ত তিনি এমন সুমধুর গান শুনেন নাই, এমন সুবাসও পান নাই। তিনি গন্ধ ও গীত অনুসরণ করিয়া চলিলেন। অনেকটা পথ যাইবার পর তিনি এক

সুরম্য উদ্যান দেখিতে পাইলেন ; কিন্তু মালিক বা মালী দৃষ্ট হইল না। গাছে গাছে ফুল, শাখায় শাখায় পাখী, স্থানে স্থানে মর্ম্মর বেদী ; বেদীর সান্নিধ্যে আবার প্রস্রবণ। কিন্তু কোথাও জন-মানব নাই। অগ্রসর হইতে হইতে সাধু সহসা দেখিলেন, এক মর্ম্মর বেদীর উপর এক অলোক সামান্যা রূপসী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। ভাবিলেন, হয়ত এই মেয়েটী মালিকের কন্যা। অগ্রসর হইয়া মেয়েটীকে সম্বোধন করিতে যাইবেন, এমন সময় মেয়েটী সরিয়া গেল। তিনি তাহার পিছনে পিছনে চলিলেন। সাধু যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন তরুণীও ততটা ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল। সাধু তখন বেগের সহিত তরুণীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। রূপসীর লীলায়িত গতি, তাহার অপরূপ রূপ, সাধুর অন্তরে ঝড় তুলিল। তিনি দ্রুতপদে ছুটিয়া গিয়া তাহার বায়ুচঞ্চল অঞ্চলখানি ধরিয়া ফেলিলেন। তরুণী তখন ফিরিয়া দাঁড়াইল ; হাসিয়া কহিল, "তোমাদের বাঁধিতে পাশের প্রয়োজন হয় না—তোমরাই আমাকে ধরিতে ব্যগ্র হইয়া পিছু পিছু ছুটিতে থাকো।"

রাজা গল্প শুনিয়া সহাস্যে উত্তর করিলেন, "দুর্ব্বলচিত্ত মানবের মন এইরূপে বিভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু আমার ন্যায়"—

চতুরা মহিষী, রাজাকে কথাটা শেষ করিতে অবসর না দিয়া মূর্চ্ছার ভান করিলেন,—তাঁহার দেহ ধরালুণ্ঠিত হইল। রাজা ব্যস্ত হইয়া রাণীকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া সেবা করিতে লাগিলেন। রাণী হাসিতে হাসিতে উঠিয়া বসিয়া রাজাকে কহিলেন, "আপনি মায়ামুক্ত পুরুষ বটে!"

রাজা—জীবে দয়া—

রাণী—দয়া করিবার আপনি কে ? সেবা বলুন। তাহা ছাড়া, আমাকে—যাহাকে আপনি বর্জ্জনীয় মনে করিয়াছেন, তাহাকে স্পর্শ করা আপনার উচিত হয় নাই।

রাজা—অপর কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরা-লুণ্ঠিত হইলে তাহাকেও আমি এই ভাবে সেবা করিতাম।

রাণী—উপনিষদে শ্রেয় ও প্রেয়র কথা উক্ত আছে। যাহা আত্মা চায়, তাহা শ্রেয়ঃ, যাহা ইন্দ্রিয় চায়, তাহা প্রেয়, আপনি ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে স্পর্শ করিয়াছেন।

রাজা ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিলেন; বুঝিয়া দেখিলেন, রাণীর কথাই ঠিক। কহিলেন, "আমি এই ইন্দ্রিয়কে শ্রীহরির প্রতি নিয়ে যেতে অরণ্যে যাচ্ছি।" রাণী কহিলেন, "তা অরণ্যে কেন? গৃহে থাক্‌লে কি হয় না?"

রাজা উত্তর করিলেন, "সাধনকালে একা থাকা উচিত, দুই সাধক একত্র থাক্‌লেও চলতে পারে, কিন্তু আর না—

এক একি সিদ্ধ হায়, সিদ্ধ সাধক পুনঃ দোয়ে।
তিন চার কুটুম্ব হায়, দশ বিশ লস্কর হোয়ে॥

অতএব আমি গৃহে না থেকে অরণ্যে গিয়ে উপাসনা করিব।

চতুরা ও বিদুষী মহিষী রাজাকে ভুলাইয়া গৃহে রাখিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন, "প্রগল্‌ভ রমণীর উপদেশ ক্ষমা করবেন রাজন্‌, কিন্তু আমার মনে হয় প্রকৃত হরি প্রেম আপনার আজও হয় নি।"

রাজা। কিরূপে তুমি তা বুঝিলে?

মহিষী। আপনি বিস্মৃত হচ্ছেন জগৎময় হরি বিরাজ করছেন সমভাবে—সংসারে যেমন, অরণ্যমধ্যেও তেমনি। মহাপুরুষরা বলে থাকেন,—

এ জগৎ হরিকা রূপ হৈ, হরিরূপ নজরি আয়ো।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বরের রূপ; যেখানে যেখানে দৃষ্টি পড়িতেছে, সেইখানেই তিনি। যে ব্যক্তি হৃদয়ে দ্বৈতভাব পোষণ করে তাহারই

ভয়। এই সংসার মধ্যে, আমাতেও এই পুষ্পের মধ্যে তিনিই সমভাবে বিরাজ করছেন ; তবে তাঁকে খুঁজতে আবার অরণ্যে ছুটছেন কেন ?

রাজা। আমি কি তাঁকে খুঁজতে অরণ্যে যাচ্ছি রাণি! আমি যাচ্ছি,—

এহি সংসার মহা দুঃখদায়ী।
ইয়ামে চিত্ত গাঢ়ো মৎ রায়ি ॥

সংসার দুঃখদায়ী বলেই আমি সংসার ত্যাগ কর্ছি।

মহিষী। তাহলে বুঝতে হবে আপনার হরি প্রেমের স্থৈর্য্য নাই ; অরণ্যে প্রেম বাড়ে, সংসারে থাকলে কমে যায় ;—

ক্ষীণহি চঢ়ে ক্ষীণহি উৎরই
সো ত প্রেম ন হৈ।
অঘট্ প্রেম পিঞ্জরে বৈসে
প্রেম কহবে সৈ ॥

যে প্রেম ক্ষণে বাড়ে, ক্ষণে কমে, সে প্রেম, প্রেমই নয়, যে প্রেম হৃদয়ে স্থির থাকে—যার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, তাহাই প্রকৃত প্রেম। আপনি প্রেমের সন্ধানে কোথা যাচ্ছেন রাজন্? প্রেম হৃদয়ের জিনিষ, স্থানের নয়। আপনি সমস্ত বিশ্ব ঘুরে বেড়ান, উচ্চ গিরিচূড়ায়, গভীর অরণ্যমধ্যে অতল সাগরগর্ভে, দেখ্বেন প্রেম সেখানে নাই ; প্রেম থাকে অন্তর মধ্যে—সেইখানেই আপনি শ্রীহরির সন্ধান পা'বেন।

রাজা। তুমি এ কি বলছ রাণী ? সংসারে থেকে শ্রীহরির সন্ধান পাব ?

মহিষী। কে কা'র সন্ধান পাবে সেটা চিন্তা করে দেখেছেন কি রাজন্ ? আপনি কে, তা ভুলে যাচ্ছেন, আপনি হাত পা মুখ ন'ন,

আপনি পরমাত্মা স্বরূপ—আপনি সন্ধান চাচ্ছেন যাঁর, তিনিও পরমাত্মা। আপনাতে আর তাঁতে কোন প্রভেদ নাই; যথা,—

সাক্ষী ব্রহ্মস্বরূপ ইক্ নেহি ভেদকো গন্ধ।
রাগদ্বেষ মতিকো ধরম তামে মানত অন্ধ॥

অর্থাৎ এই দেহে অবস্থিত দেহী বা আত্মা, পরব্রহ্ম হইতে পৃথক নয়। রাগ দ্বেষ প্রভৃতির অভিনয় যাহা দেখিতেছেন, তাহা মনের ধর্ম্ম। অন্ধ ও অজ্ঞানী জীবই দেহস্থিত আত্মায় ও পরব্রহ্মে পৃথক জ্ঞান করে।

রাজা। তোমার কথা আমি ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। তুমি কি বলিতে চাও, প্রভুতে আমাতে, আমাতে পরমাত্মাতে কোন ভেদ নেই?

মহিষী। আপনি কে আগে বিচার করে দেখুন। পূর্ব্বে বলেছি, এখনও বলছি, যা' কিছু ধ্বংসশীল, তা' মিথ্যা, অনিত্য;—

অধিষ্ঠান অজ্ঞানতে জগ উৎপত্তি পয়চান।
মনোরাজ্য নভোনীলবৎ ভরম ভয়ো ইয়ে জান॥

হে রাজন, অজ্ঞানতা প্রযুক্ত জগতের উৎপত্তি প্রতীয়মান হচ্ছে। পরন্তু ইহা ভ্রম মাত্র। আকাশকে যেমন নীলবর্ণ রঞ্জিত বলে ভ্রম হয়, তেমনি এই জগতও ভ্রান্তিমাত্র। আপনি বিচার করে দেখুন, জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে, আপনার এই দেহ নষ্ট হবে, কিন্তু প্রকৃত যাহা আপনি, তাহার ধ্বংস নেই। যাহার নাশ নাই তাহা নিত্য, পরমাত্মা-স্বরূপ; আর যাহার ধ্বংস আছে, তাহা মিথ্যা। মিথ্যাকে ছেড়ে আপনি সত্যকে অবলম্বন করুন—আত্মার স্বরূপ চিন্তা করতে করতে আপনার উপলব্ধি হ'বে—

অজ অবিনাশী আত্মা ব্রহ্ম নিত্য সুখ কন্দ।
বন্ধ মোক্ষ জগ গুণমে, তুজমে লাগে না গন্দ॥

যব জানে তবহি ছুটে জগৎ ভরমকে মায়।
আত্ম তত্ত্ব প্রকাশতে রহে ভরম কছু নায় ॥

এই ক্ষয়রহিত অবিনাশী আত্মাই সুখস্বরূপ ও ইহাই নিত্য, কিন্তু আত্মা নির্ব্বিকার—ইহাতে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি নেই। যখন আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হ'বে, তখন ভেদাভেদ জ্ঞান থাক্‌বে না, তখন বুঝ্‌বেন, আধারে আধারে জগৎময় সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মাই বিরাজ কর্‌ছেন। অতঃপর আপনার স্বাতন্ত্র্য কোথায় ?

রাজা। তোমার কথা আমি চিন্তা করে দেখ্‌ব রাণী, কিন্তু আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করি কিরূপে ?

রাণী। এখনও আপনি গৃহ ত্যাগ কর্‌তে চান ? কোন্ পদার্থের অন্বেষণে আপনি পাহাড় জঙ্গলে ভ্রমণ কর্‌তে অভিলাষী ? আপনার এই পাঞ্চভৌতিক দেহমধ্যে কে আছে অন্বেষণ করে দেখেছেন কি ? নিকটের জিনিষ ছেড়ে দূরে ছুট্‌ছেন কেন ? আপনার সন্নিকটে যে হীরকখনি আছে, তা' ছেড়ে রৌপ্য খনির সন্ধানে পাহাড় জঙ্গলে ছুট্‌ছেন কেন ? বলুন আপনি আমার সঙ্গে—

শিবোঽহং শুদ্ধোঽহং নিরঞ্জনোঽহং
নির্ব্বিকারোঽহং সচ্চিদানন্দস্বরূপোঽহং ॥

মহিষীর বাক্যে রাজার হৃদয়ে যেন অমৃতধারা বর্ষিত হইল। তিনি স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ হইয়া রাণীকে কহিলেন, "তোমার কথায় আমি আমার প্রিয় সঙ্কল্পকে ত্যাগ করিলাম।"

মহিষী তখন মহানন্দে সুর সহযোগে ভজন ধরিলেন,—

মেরে সাধুজী, কৃষ্ণ বিনা নেই কোই।
সব সন্তন মিল নিশ্চয় কিন আগম নিগম নিচোই।
মেরে সাধুজী কৃষ্ণ বিনা নেই কোই ॥

গীতাগৎ হরি আপ্ বাখানই গুপ্ত রহস্য কঁহু তোই,
তোম হাম একরূপ সনাতন, দেখনে কেতন্ দোই।
মেরে সাধুজী কৃষ্ণ বিনা নেই কোই॥
বিশ্ব চরাচর জল থল পূরজ, গূঢ় রহো সব পরই।
একমেব অদ্বৈত শ্রুতি গাবত সমজ সমজ সদ্সোই।
মেরে সাধুজী কৃষ্ণ বিনা নেই কোই॥
তত্ত্বমসি মহাবাক্য ধর দৃঢ় ভেদ দুখদ মন খই।
মেরে সাধুজী কৃষ্ণ বিনা নেই কোই॥

হে রাজন্, এই শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম। যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপকে প্রত্যক্ষরূপে জানেনা, সেই পৃথক ব্রহ্মের ধ্যান করে।

সোঽহং চিন্তন সো করে, যাঁকো ব্রহ্ম পরোক্ষ।
কেয়া নিশ্চিত চিন্তন করে, স্বয়ং অদ্বয় অপরোক্ষ।

যিনি বুঝিয়াছেন যে, তিনি অদ্বয় ব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্মের পৃথক মূর্ত্তি আর কি ধ্যান করিবেন?

চতুর্থ তরঙ্গ

একদা শ্রীশ্রীসাধুবাবা বলিতেছিলেন, ধনের দানেই সার্থকতা। তিনি বলিলেন—একদিবস প্রবল পরাক্রান্ত ভোজ রাজা তাঁহার প্রিয় কবিবয়স্যকে সঙ্গে করিয়া উপবন মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। একটী পুষ্পশোভিত বৃক্ষনিম্নে যখন বসিয়া রাজা বয়স্যের সহিত নানাবিধ গল্প করিতেছেন, তখন তিনি দেখিলেন ঐ বৃক্ষে একটী মধু-মক্ষিকা হাত পা গুলি নাড়িয়া নাড়িয়া গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে। রাজা কৌতুক করিয়া

বয়স্যকে বলিলেন, "বলত মধু-মক্ষিকা হাত মুখ ঘসিয়া ঘসিয়া কি বলিতেছে ?"

রাজবয়স্য বলিলেন, মধু-মক্ষিকা করযোড়ে আপনাকে ইহাই বলিতেছে,—

দেয়ং ভোজ ধনং ঘনং সুকৃতয়ে ন সঞ্চিতং কদা।
শ্রীকর্ণশ্চ, বলিশ্চ, বিক্রমপতে, অদ্যাপি কীর্ত্তিস্থিতা ॥
অস্মাকং মধু দানং ভোগ রহিতং নষ্টং চিরাচ সঞ্চিতম্।
নির্ব্বাণাদপি পাণি-পাদ যুগলং বদয়ন্ত্যেহমক্ষিকা ॥

অর্থাৎ হে ভোজরাজ আপনার নিকট যে ধন আছে, উহা আপনি মেঘ যেরূপ জল বর্ষণ করে ঐরূপ সৎকার্য্যে বা পুণ্যকার্য্যে ব্যয় করুন। ধন কখন সঞ্চয় করিয়া ঘরে তুলিয়া রাখিবেন না। দেখুন, দাতা-কর্ণ, বলিরাজ, বিক্রমাদিত্য, প্রভৃতি রাজণ্যবর্গ অকাতরে মুক্ত হস্তে বহু ধন দান করিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের যশঃ কীর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর আমার দশা চাহিয়া দেখুন, আমি নিজে ভোগ না করিয়া কাহাকেও একবিন্দু না দিয়া, কত কষ্টে পুষ্প হইতে মধু সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আমার সেই বহু কষ্টে অর্জ্জিত মধু আমার চাক ভাঙ্গিয়া অপরে লইয়া গিয়াছে। মধুমক্ষিকা হাত পা ঘসিয়া ঐ কথাই আপনাকে গুণ্ গুণ্ করিয়া বলিতেছে। হে রাজন্, আপনি গৃহে অনর্থক অর্থ সঞ্চয় না করিয়া উহা পূণ্য কার্য্যে ব্যয় করুণ।

বাবা আর একদিন আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সকলের সহিত মধুর ব্যবহার করিবে—কটু বা রূঢ় বাক্য দ্বারা কাহাকেও মনঃ-পীড়া দিবে না। ভক্ত তুলসীদাসও বলিয়াছেন—

"তুলসী ইয়ে বচনমে সুখ উপজে ঘনঘোর।
বশীকরণ এক মন্ত্র হ্যায়, ত্যজ দে বচন কঠোর ॥"

বাবা বলিলেন—ক্ষত শুকাইয়া যায়, কিন্তু অপমান বা রূঢ় বাক্য-দ্বারা অন্তর মধ্যে যে গভীর ক্ষত সৃষ্ট হয় তাহা সহজে শুকায় না। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটী গল্পও বলিলেন। একদা এক সিংহ চরণে কণ্টকবিদ্ধ হইয়া বড় কষ্ট পাইতেছিল। কোনো উপায়ে কণ্টক উৎপাটন করিতে না পারিয়া সে জগতের শ্রেষ্ঠজীব মানুষের শরণাপন্ন হওয়া উচিত মনে করিল। কিন্তু সেই গভীর জঙ্গল মধ্যে মানুষ কোথায়? সিংহ ইহা চিন্তা করিয়া গভীর জঙ্গল হইতে একটু সরিয়া লোকালয়ের দিকে আসিল। তথায় এক কাঠুরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল। কাঠুরিয়া পলাইতে উদ্যত হইলে সিংহ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিল, "আমি বিপন্ন হইয়া তোমার শরণাগত হইতেছি, তোমার পলাইবার কোন হেতু নাই।"

কাঠুরিয়া তখন ফিরিল; জিজ্ঞাসা করিল, "আমি আপনার কি করিতে পারি?"

সিংহ কহিল, "আমি কণ্টকবিদ্ধ হইয়া বড় কষ্ট পাইতেছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর ভাই।"

কাঠুরিয়া তৎক্ষণাৎ কুঠার রাখিয়া সিংহের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল এবং অচিরে কণ্টক উৎপাটন করিল। সিংহ বিপন্মুক্ত হইয়া কৃতজ্ঞ-কণ্ঠে কহিল, "তুমি আমার যে উপকার করিলে তাহার প্রতিদানস্বরূপ আমি তোমাকে কিছু স্বর্ণ-রৌপ্য দিব। আমি অনেক মানুষ হত্যা করত তাহাদের অলঙ্কারাদি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি—তুমি আমার সঙ্গে গভীর জঙ্গলে এসো—তোমার কোনো ভয় নাই—আমি এ বনের রাজা।"

ইহা বলিয়া সিংহ তাহাকে গভীরতম জঙ্গলে লইয়া গেল। এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার দিয়া তাহাকে বিদায় করিল; বলিয়া দিল, প্রয়োজন হইলে পুনরায় আসিয়া যেন স্বর্ণ লইয়া যায়।

কাঠুরিয়া পুলকিত অন্তরে গৃহে ফিরিল। কিয়দ্দিবস পরে আবার

আসিল এবং কিছু অলঙ্কার লইয়া গেল। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করায় স্ত্রীর মনে সন্দেহ জাগিল, স্বামী হয়ত চুরি করিয়া অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিতেছে। একদিন স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চুরি করে এ সব সোণারূপা আনছ?"

"না, আমার এক সিংহ-বন্ধু আছে, সেই আমাকে দিতেছে।"

"নরখাদক সিংহ আবার মানুষের বন্ধু হয়?"

"হয়, যদি আমি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি। ভালবাসার দ্বারা হিংসাকে পরাজয় করা যায়। পশুর চেয়ে মানুষ বেশী হিংস্র হয়।"

"বিশ্বাস হয় না। তুমি একবার সিংহকে দেখাতে পার?"

"তুমি আমার সঙ্গে বনে যেতে পার?"

"না; তুমি সিংহকে এখানে নিয়ে এস।"

"বলে দেখ্‌ব আসে কি না জানি না।"

কাঠুরিয়া পরদিন সিংহকে গিয়া বলিল, "আমার স্ত্রী তোমাকে দেখ্‌তে চায়—তুমি আমাদের বাড়ী চল।"

সিংহ সম্মত হইয়া কহিল, "তোমার অনুরোধে তোমার বাড়ীতে যেতে স্বীকৃত হচ্ছি বটে, কিন্তু কেহ কোন রূঢ় বা অপ্রিয় কথা বল্‌লে আমি হয়ত ধৈর্য্য ধারণ করতে পার্‌ব না। তোমার স্ত্রীকে পূর্ব্বেই সাবধান করে দিও।"

পরদিবস সিংহকে লইতে কাঠুরিয়া জঙ্গলে আসিল। এবং পথ অতিক্রম করিতে করিতে জানাইল যে, আমার স্ত্রীকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছি সে কোন অপ্রিয় কথা বলিবে না। সিংহের জন্য আসন প্রস্তুত ছিল। সিংহ আসিয়া বসিতে না বসিতে গৃহকর্ত্রী বলিয়া উঠিল, "মাগো! গায়ে কি দুর্গন্ধ! তা'তে আবার পোকা! আমার ঘরটাই নোংরা হয়ে গেল।"

সিংহ ইহা শুনিবামাত্র একবার কঠোর দৃষ্টিতে রমণীর পানে চাহিল, তারপর আত্মসংযম করিয়া অরণ্যের দিকে ছুটিয়া গেল। সে প্রস্থান করিলে কাঠুরিয়া, স্ত্রীকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিল। পরদিবস অরণ্যে গিয়া সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সিংহ অনুরোধ করিল, "তুমি আমার অঙ্গে কুঠার দ্বারা আঘাত কর।" বারম্বার বলাতে কাঠুরিয়া সজোরে সিংহের অঙ্গে আঘাত করিল। তারপর কিছুদিন সিংহের আর দেখা পাওয়া গেল না। অবশেষে একদিন কাঠুরিয়া গভীর জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিল। সিংহ তাহাকে বলিল, "দেখ তুমি আমাকে কুঠার দ্বারা আঘাত করিয়া যে ক্ষত উৎপন্ন করিয়াছিলে তাহা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তোমার স্ত্রী আমার অন্তর মধ্যে যে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আজও শুকায় নাই— কখন শুকাইবে কিনা জানি না।"

এই গল্প শেষ করিয়া বাবা বলিলেন, "কখন কোন দ্রব্যের অভাব বোধ করিবে না, পরমাত্মা তোমাকে যখন যাহা দিবেন তাহাতেই তুষ্ট থাকিবে।" ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্প বলিলেন। নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী এক পর্ণকুটীরে মনের সুখে বাস করিতেন। তাঁহাদের কিছু জমী ছিল, লোক দিয়া চাষ আবাদ করাইতেন, গোয়ালে গাই ছিল, গৃহে দুগ্ধের অভাব হইত না। রাজ-সভা হইতে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ পত্র আসিত, তথায় কিছু দক্ষিণা ও তৈজসপত্রাদি মিলিত। শিষ্য যজমানও দুই চারিজন ছিল, পৌরহিত্য করিয়া কখন কিছু পাইতেন। সুতরাং অভাব ছিল না—অভাব ছিল একটী জিনিষের, যাহা উভয়ে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন, কিন্তু কেহ কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিতেন না। তাঁহাদের দীক্ষা-গুরু উপদেশ দিয়াছিলেন, কখনও কোনও ইচ্ছা বা কোন বস্তুর অভাব

বোধ করিবে না। সুতরাং তাঁহাদের অন্তর অভাবগ্রস্ত হইয়া হাহাকার করিলেও তাঁহারা মুখ ফুটিয়া অভাবের কথা কাহাকেও জানাইতেন না, উভয়ে হাসিয়া আনন্দ করিয়া বেড়াইতেন। কেহ যদি বলিত, আপনাদের একটী পুত্র থাকিলে ভাল হইত। তাঁহারা উত্তর করিতেন, আমরা বেশ আছি—কোন দুঃখ বা অভাব নাই। কিন্তু অন্তর মধ্যে চীৎকার উঠিত, ওগো আমরা বড় অভাবগ্রস্ত, আমাদের সন্তান নাই।

সে অন্তরের চীৎকার বোধহয় ভগবানের কানে গেল। ব্রাহ্মণ দম্পতির এক প্রতিবেশী ছিল; তাহার নাম মহাদেব। জাতিতে বৈশ্য। গৃহে ধন ধান্য, পুত্র কলত্র সব ছিল। একদা মহাদেব কাঁদিতে কাঁদিতে বিবস্ত্র অবস্থায় ব্রাহ্মণের গৃহে ছুটিয়া আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "আমাকে রক্ষা করুন।" ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কি হয়েছে?"

"আমার ছেলে দুটো আমাকে মার্ছে—এই দেখুন আমার অঙ্গে দাগ, রক্ত পড়্ছে—কাপড় কেড়ে নিয়েছে—"

ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত। এই বৈশ্যের সুখের সংসার মনে করিয়া ব্রাহ্মণ কতদিন তাহার ঈর্ষা করিয়াছিলেন। কেমন ছেলে দুটি, কেমন পুত্রবধূ, কেমন পৌত্র! ব্রাহ্মণ একটু স্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলে মার্ছে কেন?"

"তারা বল্ছে তোমরা ঘর ছেড়ে চলে যাও—"

বৈশ্যের কথা শেষ হইতে না হইতে তাহার পত্নী চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া ব্রাহ্মণপত্নীর শরণাপন্ন হইল। জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিল, "আমার ছেলে বউ আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আবার ছোট নাতি লাঠি নিয়ে মার্তে আসে। যাকে আমি বিছানায় না শুইয়ে বুকে শোয়াতাম, নিজে ভাল জিনিষ না খেয়ে তাকে খাওয়াতাম

কত ঠাকুর দেবতার কাছে মাথা কুটে তাকে আমি পেয়েছিলাম, সেই এখন বাপমায়ের সাথে মিলে আমাকে এই বুড়ো বয়সে লাঠি নিয়ে মারতে আসে। হায়, হায়, কেন আমি পুত্রের জন্যে, পৌত্রের জন্যে ঠাকুরের দোরে মাথা কুটেছিলাম।"

মহাদেব কহিল, "এখন আমি বুঝেছি ভগবানের কাছে পুত্র কামনা করাই অন্যায় হয়েছিল। তিনি যে অবস্থায় রাখেন সেই অবস্থায় আমাদের সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। হায় হায় কেন আমি পুত্র চেয়েছিলাম!"

ব্রাহ্মণদম্পতি স্তব্ধ হইল। তাহাদের মনোমধ্যে যে কামনা ছিল তাহা তখনকার মত বিনষ্ট হইলেও তাহার অঙ্কুর মরিল না। তাহারা ভাবিল, "আমাদের সন্তান যে এমনি দুর্জ্জন হ'বে এমন ত কোন কথা নাই।" বাসনার বীজ, মানুষের অন্তর হইতে কিছুতেই যাইতে চায় না। তবে যদি মনে তীব্র বৈরাগ্য জন্মে তবেই জীব বাসনারহিত হইতে পারে। এ বৈরাগ্য বহু তপস্যায় পাওয়া যায়।

একদা গুরু মহারাজ আমাদের উপদেশ দিয়াছিলেন, "সকল অবস্থায় মনে সন্তোষ রাখ্‌বে, পরমাত্মার চিন্তায় সতত রত থাকবে, মন বিক্ষিপ্ত না হয় তাহা লক্ষ্য রাখ্‌বে।" ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত গুরু মহারাজ একটি দৃষ্টান্ত দিলেন। একদা মহাপুরুষ সনৎকুমার ধ্যানস্থ ছিলেন। নির্জ্জন প্রদেশ, চারিদিকে গিরিমালা—মহাদেবের প্রিয় স্থান। মহাদেব পার্ব্বতীসহ সেই জনশূন্য অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। সনৎকুমারের সমাধি ভঙ্গ হইল, কিন্তু সহসা বাহ্যজ্ঞান আসিল না। তাঁহার যখন এইরূপ অর্দ্ধ-সমাধি অবস্থা তখন দেবাদিদেব শঙ্কর পার্ব্বতীসহ তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতেছেন। তিনি ততটা খেয়াল না করায় বিধিমত সম্মান মহাদেবকে দিতে পারেন নাই; ইহাতে শঙ্করী

মহা রুষ্ট হইয়া সনৎকুমারকে অভিসম্পাৎ করিলেন, "তুমি ধরাধামে শূদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ কর।"

যথাকালে মহাযোগী সনৎকুমার ধরাধামে শূদ্রাণী গর্ভে জন্ম লইলেন। তিনি তপঃপ্রভাবে জাতিস্মর হইয়া জন্মিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় ধ্যানে রত থাকিতেন। একদা ভগবতী অনুসন্ধান লইতে আসিলেন, সনৎকুমার কিরূপে দিন অতিবাহিত করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ গর্ব্বিত ঋষি ?"

সনৎ। ভালই আছি মা, তোমার কৃপায়।

শঙ্করী। নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম লয়েছ বলে কি তোমার কোন আক্ষেপ নেই ?

সনৎ। না মা, বরং ভালই আছি। উচ্চ যোনির করণীয় অনেক নিয়ম আচার কর্ত্তব্যাদি আছে, সে সব পালন করিতে অনেক সময় যায়। আমি এক্ষণে সে সব কর্ত্তব্য হইতে মুক্ত। সুতরাং অধিকাংশ সময় এখন আমি ধ্যানে অতিবাহিত করিতে সমর্থ। তোমার কৃপায় আমি ভালই আছি মা। ধ্যানের ফলে আনন্দেই অতিবাহিত করি।

শঙ্করী। দেখ্ছি তোমার কোন শাস্তি হয় নি—যাও—তুমি উষ্ট্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করগে।

ভগবতীর ইচ্ছানুসারে সনৎকুমার উষ্ট্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন কিন্তু পূর্ব্ববৎ জাতিস্মর রহিলেন। যখন তিনি দেবলোকে ছিলেন, তখন তিনি যেমন ধ্যানরত ছিলেন এখনও তিনি তেমনি ধ্যানে চিন্তায় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। একদা ভগবতী কৌতূহলী হইয়া উষ্ট্রদেহধারী সনৎকুমারের সমীপস্থ হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "এবার তোমার কেমন লাগছে সনৎকুমার ?"

সনৎ। এবার মা, আরও আনন্দ পেতেছি। তোমার মা কত কৃপা!

শঙ্করী। এত আনন্দ কিসে পাও ?

সনৎ। তাঁহার ধ্যানে, চিন্তায়। শূদ্রযোনিতে অবস্থান কালে আমার কিছু কিছু কর্ত্তব্য ছিল, তাহাতে আমার অনেক সময় বৃথা নষ্ট হ'ত। এখন এই পশু জন্ম লাভ করে আমি অবিচ্ছিন্ন আনন্দে নিত্য বিভোর হয়ে আছি। আমার কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নেই, উষ্ট্রযোনিতে পানাহারেরও তাদৃশ প্রয়োজন হয় না, এজন্য আমার আহারের চেষ্টা করিতে হয় না। প্রায় সব সময়ই ধ্যানানন্দে মগ্ন থাকি ; আমি এখন বড় সুখী মা।

শঙ্করী। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম সনৎকুমার। আমি তোমাকে এতকাল পরীক্ষা করিতেছিলাম। তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।

সনৎ। আমার ত কোন বাসনা নাই মা, আমি কি চাইব ?

শঙ্করী। তবে তুমিই আমাকে বর দেও।

সনৎ। বেশ, আমি দিতে প্রস্তুত আছি ; কি বর চাও মা ?

শঙ্করী। আমি তোমাকে সন্তানরূপে চাই।

সনৎ। উত্তম—আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব।

ভগবৎকার্য্য উদ্ধারের জন্য, পুত্ররূপেই তিনি ভগবতীর গর্ভে আসিয়াছিলেন ; তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল, কার্ত্তিক।

পঞ্চম তরঙ্গ

সাধুসঙ্গ করিলে মন শুদ্ধ হয়। আমি যখনই গুরু মহারাজের অথবা সাধুবাবার নিকট যাই, তখনই আমাদের অন্তর হইতে সংসারের ক্ষুদ্র ভাবনা, বিষয়চিন্তা দূরে সরিয়া যায়। আবার যখন ঘরে ফিরিয়া আসি, তখন ঠাকুর দেবতা, সৎচিন্তা দূরে সরিয়া যায়। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "গঙ্গাস্নান করিলে যদি পাপ ধ্বংস হয়, তবে আবার পাপের ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয় কেন?" তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "গঙ্গাগর্ভে স্নানার্থে নামিতেছে দেখিয়া পাপ সরিয়া আশে পাশে দাঁড়ায়, স্নান শেষ করিয়া উপরে উঠিলে পাপ ফিরিয়া আসিয়া তোমার দেহ পুনরায় অধিকার করে।" তাঁর এই কথাটার ভিতর গূঢ় অর্থ আছে। সাধু সমীপে আমরা যতক্ষণ অবস্থান করি, ততক্ষণ পাপচিন্তা আমাদের স্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু গৃহে ফিরিতে না ফিরিতে বিষয়চিন্তা আবার আমাদের ঘিরিয়া বসে।

বাবা একদিন আমাদের উপদেশ দিতেছিলেন, "নিজের চোখে না দেখিয়া, নিজের কাণে না শুনিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে না।" তিনি আরও বলিতেছিলেন, "সকলের সহিত অমায়িক ব্যবহার করিবে, এমন কি শত্রুকেও আদরযত্ন করিবে।" তাঁহার এই উপদেশের তাৎপর্য্য আমাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত একটী গল্প বলিলেন, যথা—

একদা এক রাজা নিশীথ কালে শয্যায় শয়ান ছিলেন। তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল, এমন সময় শুনিলেন, দূরে যেন কে কাঁদিতেছে। রমণীকণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল। কারণ

অনুসন্ধানার্থে তিনি তাঁহার দেহ-রক্ষীকে পাঠাইয়া দিলেন। নিজেও তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। কারণ, তিনি কোনও সাধুর নিকট হইতে উপদেশ পাইয়াছিলেন, নিজের চোখে না দেখে, নিজের কাণে না শুনে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হবে না। সৈনিকের অলক্ষ্যে রাজা তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া রাজা জ্যোৎস্না-লোকে দেখিলেন এক অপূর্ব্ব রমণী নদীতীরে শিলাপৃষ্ঠে বসিয়া রোদন করিতেছেন। রাজা বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেহরক্ষী ইত্যবসরে অগ্রসর হইয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কে? তোমার চীৎকারে রাজার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘট্‌ছে। তোমার ভুক্ লেগে থাকে এখন চুপ্‌চাপ্ থাকো—প্রাতঃকালে কিছু খেতে দেবো।"

রমণী উত্তর করিলেন, "আমি ক্ষুধার্ত্ত নই, আমি তোমাদের নিকট কোন করুণারও প্রার্থী নই—"

"তবে কাঁদ্‌ছ কেন?"

"সাতদিনের মধ্যে এই ধার্ম্মিক রাজাকে সর্পদষ্ট হয়ে প্রাণত্যাগ কর্‌তে হবে, সেই দুঃখে আমি কাঁদ্‌ছি।"

"তুমি কে?"

"আমি রাজলক্ষ্মী। রাজা প্রাণত্যাগ কর্‌লে আমি এ রাজ্য ছেড়ে নদীর অপর পারে চলে যাবো।"

সৈনিক সকল কথা ঠিক না বুঝিয়া বলিল, "কাল সকালে তোমাকে নৌকা এনে দেবো, পারে চলে যেও এখন চুপচাপ থাকো।"

সৈনিক রাজলক্ষ্মীর কথা না বুঝিলেও রাজা ঠিক বুঝিলেন। তিনি চিন্তিত অন্তরে দ্রুতপদে গৃহে ফিরিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। ক্ষণ পরে সৈনিক আসিয়া সংবাদ দিল, "এক দরিদ্র্য রমণী অভাবের

তাড়নায় কাঁদিতেছিল ; যাহাতে মহারাজের নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় সে বিষয়ে আমি তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছি। সে আর কাঁদিবে না।”

রাজা যদি নিজের চোখে না দেখিতেন, নিজের কানে না শুনিতেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত দেহরক্ষীর কথা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। মৃত্যু দ্বারে—আশু প্রতিবিধান প্রয়োজন। সাধুর তৃতীয় উপদেশ তিনি স্মরণ করিলেন। শত্রুর প্রতিও মিত্রবৎ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এস্থলে শত্রু কে ? সর্প। কিরূপে সে তুষ্ট হইতে পারে ? দুগ্ধ ভোজনে। রাজা পর দিবস প্রাতে মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন, “রাজবাটীর প্রাচীরের ধারে ধারে স্বল্প গভীর পাকা পরিখা খনন ও গঠন কর ; এই পরিখা উত্তম দুগ্ধে পরিপূর্ণ কর। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে দ্বিতীয় পরিখা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সুবাসিত ক্ষীর দ্বারা পরিপূর্ণ কর। তিন দিবস সময় দিলাম, ইহার মধ্যে কার্য্য সমাধা করা চাই, নতুবা শাস্তি পাইবে।”

তিন দিনের মধ্যে কার্য্য সমাধা করিয়া মন্ত্রী রাজাকে সংবাদ দিলেন। চতুর্থ দিন হইতে বিপদের আশঙ্কা। রাজা চতুর্থ দিবসে প্রাতে উঠিয়া প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করত দেখিয়া আসিলেন, তাঁহার নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা। কিছু কিছু ত্রুটি ছিল, রাজা নিজে উপস্থিত থাকিয়া ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইলেন এবং সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া দুগ্ধ ও ক্ষীরে পরিখাদ্বয় পরিপূর্ণ করাইলেন।

চতুর্থ দিবস রজনীতে নাগরাজ দূত প্রেরণ করিলেন, রাজাকে দংশন করিয়া সংহার করিতে। দূত আসিল। পথের মধ্যে দুগ্ধের

পরিখা দৃষ্টে সে প্রফুল্ল চিত্তে দুগ্ধপানে রত হইল। রজনী প্রভাতে সে অদৃশ্য হইল, কিন্তু ফিরিয়া গিয়া নাগরাজকে কোন সংবাদ দিল না। নাগরাজ শ্রবণ করিলেন, রাজা সুস্থদেহে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তিনি পঞ্চম দিবস রজনীতে তীক্ষ্ণতর বিষযুক্ত এক সর্পকে পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন রাজাকে দংশন করিয়া আসিতেই হইবে। সর্প আসিল। পুরী প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রাচীর তলে সুমিষ্ট দুগ্ধ প্রবাহ দেখিয়া মোহিত হইল এবং সকল কথা বিস্মৃত হইয়া উদর ভরিয়া খাইতে লাগিল। রজনী শেষে দেখিল তাহার আর নড়িবার শক্তি নাই। নাগরাজের নিকট যে নির্দ্দেশ পাইয়াছিল, তাহাও তাহার স্মরণ হইল। তখন সে লজ্জিত হইয়া কোন এক নিভৃত স্থানে আত্মগোপন করিয়া রহিল—নাগরাজের নিকটে আর গেল না।

ষষ্ঠ দিবস প্রাতে নাগরাজ তাহাকে ফিরিতে না দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অনুচরদিগের মধ্যে এবম্বিধ কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা দৃষ্টে সাতিশয় রুষ্ট হইলেন। তখন তিনি তাঁহার প্রিয়তম অনুচর মহাবিষধর কাল সর্পকে ডাকিয়া পাঠাইয়া যথোপযুক্ত উপদেশ দিলেন। বিদায়কালে কাল সর্প গর্ব্বভরে বলিয়া গেল, "আমি রাজাকে মারিয়া তবে ফিরিব—নতুবা ফিরিব না।"

মহাদর্পী কাল সর্প ষষ্ঠ দিবস এক প্রহর রজনীতে রাজবাটীর প্রাচীরতলে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, সুমিষ্ট দুগ্ধপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। দেখিয়া লোভ হইল। কিন্তু লোভ সম্বরণ করিয়া সে আরও অগ্রসর হইল। রাজবাটীর চারিপার্শ্বে ক্ষীরের প্রবাহ দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল। সৌগন্ধ তাহার নাসিকাকে পীড়ন করত লুব্ধ করিতে লাগিল। ক্ষীর তাহার রসনাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, তুমি

আমার স্বাদ একটু গ্রহণ কর। ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় মানুষ যখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, তখন সর্প যে ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না। কালসর্প ভাবিল, একটুখানি ক্ষীর খেয়ে নি, তারপর প্রাসাদে প্রবেশ করে রাজাকে দংশন করিব। এইরূপে মনকে বুঝাইয়া কালসর্প ক্ষীর ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। তাহার সুস্বাদ ও সুঘ্রাণ কালসর্পকে এতই অভিভূত করিল যে, সে ভাবিল, যে ব্যক্তি আমাকে এমন উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করাইতেছে আমি কিরূপে তাহাকে দংশন করিব? পরক্ষণই নাগরাজের অনুজ্ঞা স্মরণ হওয়াতে সে স্থির করিল, কিছু ভোজন করিয়া লইয়া রাজাকে সংহার করিতে যাইব। কিন্তু ভোজন আর শেষ হয় না। যখন শেষ হইল, তখন আর নড়িবার শক্তি নাই। উষা সমাগত দেখিয়া কালসর্প আত্ম-গোপন করিয়া পড়িয়া রহিল—নাগরাজের নিকট কোন সংবাদ গেল না।

সপ্তম দিবস প্রাতে রাজা শয্যাত্যাগ করিয়া প্রথমে চিন্তা করিলেন, আজ শেষ দিন; আজ যদি আমি কোনরূপে রক্ষা পাই, তবেই আমার পরিত্রাণ। তিনি এক প্রিয়দর্শন শান্ত প্রকৃতির অমাত্যকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, তুমি আমার সভা দ্বারে সকল সময় প্রহরায় থাকিবে। যে কোন ব্যক্তি আমার দর্শন লাভাশায় আসিবেন, তাঁহাকে তুমি সমাদর পূর্ব্বক লইয়া আসিবে। সূপকারকে আদেশ করিলেন, উৎকৃষ্ট মালাই প্রস্তুত করিয়া সভাগৃহের স্থানে স্থানে স্বর্ণপাত্রে রক্ষা করিতে। মন্ত্রীকে আদেশ করিলেন আমার সিংহাসনের অনুরূপ আর একটী সিংহাসন আমার সিংহাসনের পার্শ্বে স্থাপন কর।

রাজার ইচ্ছামত সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইল। এদিকে নাগরাজ উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সপ্তম দিবস সায়াহ্নে স্বয়ং আসিয়া

রাজপ্রাসাদে দর্শন দিলেন। দুগ্ধ ও ক্ষীরের প্রবাহ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, তাঁহার অনুচরদিগের অবস্থা কি ঘটিয়াছে। তিনি সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাকে সাতিশয় সমাদরের সহিত আহ্বান করা হইল। যে অমাত্য দ্বারপথে আহ্বানের জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন তিনি নাগরাজকে ফুল মালায় শোভিত ও চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া রাজসভায় সম্মানের সহিত লইয়া আসিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিলেন, ইনিই নাগরাজ। তাঁহার দেহের একটা অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বুঝাইয়া দিয়াছিল, ইনি নরলোকের কেহ নহেন। রাজা সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় সিংহাসনে মহা সমাদরে তাঁহাকে বসাইলেন। মালা চন্দন অর্পণ করিয়া পরে সুগন্ধি এলাচি অর্পণ করিলেন। নাগরাজ মুগ্ধ হইলেন। রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত কোমল সঙ্গীতধ্বনি নাগরাজকে পুলকিত করিল। চক্ষু কর্ণ জিহ্বা নাসিকা তৃপ্ত হইলে নাগরাজ কহিলেন, "আজ হতে তুমি আমার মিত্র।"

রাজা কহিলেন, "আপনি আমাকে ধন্য করিলেন।"

নাগরাজ বলিলেন, "এখন তোমাকে আমার প্রকৃত পরিচয় দিতেছি। আমি নাগরাজ, তোমাকে বিনাশ করিতে আসিয়াছিলাম। পূর্ব্বে অনুচর পাঠিয়েছিলাম; তাহারা অকৃতকার্য্য হওয়ায় আমি আজ স্বয়ং এসেছি। তোমার মধুর ব্যবহারে, সুপেয় পানীয় পান করে, মধুর সঙ্গীত শ্রবণে আমি এতই মুগ্ধ হয়েছি যে, তোমাকে সানন্দে এই অভয় দিচ্ছি যে, তোমার রাজ্য মধ্যে আমার অনুচরদের অতঃপর কোন উপদ্রব থাকবে না—আমার মিত্রের হিংসা কখন কোন সর্প করবে না।"

ইহা বলিয়া নাগরাজ বিদায় লইলেন। যে কার্য্য রাজা লক্ষ লক্ষ সৈন্য লইয়া সম্পন্ন করিতে পারিতেন না, তাহা তিনি মধুর ব্যবহার দ্বারা

সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইলেন। যে তিনটি উপদেশ সাধু মহারাজ রাজাকে দিয়াছিলেন, তাহার সার্থকতা রাজা বিশেষভাবে অনুভব করিলেন।

বাবাকে একদা শম, দমর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—

শম=মনকে নিরোধ।

দম=ইন্দ্রিয় দমন।

শ্রদ্ধা=গুরু ও বেদবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস।

সমাধান=বিষয় হইতে মনকে সম্পূর্ণ সরাইয়া আত্মায় একাগ্র করা।

উপরাম=উদাসীনতা।

তিতিক্ষা=শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, লাভ, ক্ষতি ইত্যাদি অবিচলভাবে সহ্য করা।

বাবা একদা উপদেশ দিয়াছিলেন,—দানে ধনক্ষয় হয় না, ক্ষয় হয় ভোগে। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মন্ত্র শিষ্য স্বামী তুরিয়ানন্দজীও বলিয়াছিলেন (সাধনার পথে যাইতে হইলে) অর্থ সঞ্চয়ে মন দিয়ো না। অর্থ হইতে পরে অনর্থ আসে। আশ্রম করাও ঝঞ্ঝাট। পরার্থে অর্থ সঞ্চয় করিতেছি মুখে অনেকে বলে মাত্র, কিন্তু সমস্তই জানিও নিজের জন্য। এই নিমিত্তই অর্থ হইতে সুখের বৃদ্ধি না হইয়া পরে অর্থ হইতে দুঃখেরই সৃষ্টি হয়।" বাবা আমাদিগকে তাহাই বলিতেছিলেন—পরোপকার করিবে মুক্ত হস্তে, নিজের জীবিকার জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা রাখিবে। আত্মপরিজনের জন্য, সঞ্চয়ের জন্য সামান্য কিছু রাখিয়া অভুক্তের মুখে আহার দিবে, তাহা হইলে ভগবান্ কখন তোমাকে অভুক্ত রাখিবেন না। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বাবা একটি গল্প বলিলেন। কোন নগরে এক শেঠ ছিল। সে বাল্যকালে বড় কষ্ট পাইয়াছে। অল্প বয়সে

পিতামাতা হারাইয়া আত্মীয় স্বজনের গৃহে পালিত হইয়াছে। শেঠের পিতা ধনী ছিল এবং জহরতের কাজ করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। কিন্তু পুত্র কিছুই পাইল না, আত্মীয় স্বজন গ্রাস করিল। এক ব্যক্তি দয়া করিয়া তাহাকে খাইতে পরিতে দিত। বালক দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া বেশ শিক্ষা লাভ করিল। বুঝিল, তাহাকে নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে, নতুবা সংসার-সমুদ্রে তাহাকে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে হইবে। সে এক জহুরীর দোকানে বিনা বেতনে কাজ করিয়া প্রথমে শিক্ষালাভ করিল। তাহার অধ্যবসায় ছিল, বুদ্ধি ও শক্তি ছিল, দুই এক বৎসরের মধ্যে কাজ শিখিয়া লইয়া অন্য এক দোকানে অংশীদার স্বরূপ কাজ করিতে লাগিল। কিছু অর্থ সঞ্চয় হইলে সে স্বাধীনভাবে এক দোকান খুলিল, এবং অল্পকাল মধ্যে বিশেষ লাভবান হইয়া বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করিল।

তখন সে গৃহনির্ম্মাণ করিল, বিবাহ করিল। ইচ্ছা করিলে সে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া দরিদ্র কাঙ্গালকে দিত। যে অনাথ, তাহাকে আশ্রয় দিত, আহার্য্য দিত। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এক বিশাল অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিল। খঞ্জ, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, অনাথ, অনাথা, তথায় আশ্রয় ও আহার্য্য পাইত। দেশ-দেশান্তর হইতে অনাথারা আসিয়া ধর্ম্মশালায় স্থান বা আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে ধর্ম্মশালার কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এক বিশাল অট্টালিকায় পরিণত হইল। তাঁহার উপার্জ্জনের অধিকাংশ অর্থ এই ধর্ম্মশালায় ব্যয়িত হইত। সামান্য কিছু অর্থ স্ত্রী-পুত্রকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দিতেন। পরের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয়, স্ত্রী পুত্র সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। শেঠ কহিলেন, "তোমাকে যখন বিবাহ করিয়া ঘরে আনি, তখন আমি সামান্য

ব্যবসায়ী মাত্র। তোমাকে তখন বলিয়া আনি নাই যে তোমাকে আমি লক্ষাধিক মুদ্রার অলঙ্কার দিব। তোমাকে যা' দিয়াছি, তোমাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছি, তাহা তোমার আশাতীত। এখন আমি তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ আমার ইচ্ছামত ব্যয় করিব সে অধিকার আমার আছে।" পুত্রকে বলিলেন, "আমি তোমার বয়সে উপার্জ্জন আরম্ভ করিয়াছি। তোমার যোগ্যতা থাকে উপায় কর। আমি পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করিতেছি না, আমার স্বোপার্জ্জিত অর্থ আমার বাসনানুযায়ী ব্যয় করিতেছি। তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে কখন পরাঙ্মুখ হই নাই; তবে তোমার বিলাসিতাকে কখন প্রশ্রয় দিই নাই।"

পুত্র পরিবার তখনকার মত শান্ত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে আগুন জ্বলিতে লাগিল। তাহারা যখন শুনিল যে, শেঠজী বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি অনাথশালাকে দান করিয়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত নাগরিককে অছি নিযুক্ত করিয়াছেন; তখন তাহারা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। তাহাদের আশঙ্কা হইল যে, আর কিছু দিন এই ভাবে চলিলে তাহাদের পথে বসিতে হইবে। তখন তাহারা পরামর্শ করিয়া শেঠজীকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিল। বিদায়কালে শেঠজী বলিলেন, "তোমরা যখন আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া আমাকে আমার গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিতেছ, তখন আমি সানন্দে চলিয়া যাইতেছি। দেশে এখন বহু কাঙ্গাল অনাথ আছে, তাহাদের জন্য আমাকে এখনও উপার্জ্জন করিতে হইবে। তখন তোমাদের জন্য আমার কোন ব্যয় থাকিবে না, আমি সমস্ত উপার্জ্জন অনাথ কাঙ্গালকে দিতে পারিব। তোমাদের জন্য এই গৃহ ও দোকান রাখিয়া গেলাম; তোমাদের প্রতি আমার সকল কর্ত্তব্য এইখানেই শেষ হইল।"

ইহা বলিয়া তিনি গৃহত্যাগ করিলেন এবং অনাথশালার অছি-দিগকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া বলিলেন, "আমি এখন দেশান্তরে চলিলাম। আমার এই হাজার সন্তানকে আপনাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিলাম। আশা করি ইহাদিগের পরিচর্য্যার কোন ত্রুটি হইবে না।"

শেঠ গৃহত্যাগ করিয়া অনাথদিগের কথা চিন্তা করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলেন। স্ত্রী পুত্রের কথা একবারও স্মরণ হয় নাই। তাহাদের দেখিবার লোক আছে, আশ্রয় আছে, অর্থবল আছে। অনাথদিগকে দেখিবার কেহ নাই। তাহাদিগের দুঃখের কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া বিপথে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অঙ্গ কণ্টকাহত হইলে তিনি বুঝিলেন যে, তিনি অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখিলেন বিধাতার ইচ্ছায় যখন তিনি বিপথে আসিয়াছেন, তখন তিনি এই পথেই চলিবেন। চলিতে চলিতে নিবিড়তর জঙ্গল মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। জঙ্গলটী এক পর্ব্বত পাদদেশে। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন, বন্যজন্তুর আবাসভূমি এই জঙ্গল হইতে কিরূপে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইবেন ইহাও তিনি বারেক চিন্তা করিলেন। ভাবিলেন, পর্ব্বতগাত্রে কোন গুহা থাকিতে পারে, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি পর্ব্বতোপরি উঠিলেন। নীচে যত জঙ্গল উপরে তত জঙ্গল নাই; নীচে যত অন্ধকার, উপরে তত অন্ধকার নাই। জঙ্গলে বা পাহাড়ে কোথাও পথ নাই; ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সুবিধামত স্থানে পদ বিক্ষেপ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক বিশাল বৃক্ষতলে এক যোগীপুরুষ মুদ্রিত নয়নে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, তিনি ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া অদূরে

উপবিষ্ট রহিলেন। চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, অদূরে এক গুহা। বুঝিলেন, সাধু এই গুহামধ্যে বাস করেন। কিন্তু আহার করেন কি? তাঁহার উদরে তখন ক্ষুধার উদয় হইয়াছে, তাই তিনি আহার্য্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। যখন তিনি গাছপালা আকাশ গুহা প্রভৃতি হইতে নয়ন ফিরাইয়া সাধুর পানে নেত্রপাত করিলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে, সাধু তীক্ষ্ণ নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিনি পুনরায় সাধুকে প্রণাম করিয়া যুক্তকরে উপবিষ্ট রহিলেন। সাধু কি বুঝিলেন জানি না, কিন্তু তাঁহার নয়নে করুণা দৃষ্ট হইল। সাধু তাঁহাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া আনিয়া এক ক্ষুদ্র গুহা দেখাইয়া দিলেন এবং কয়েকটা ফল আনিয়া সেবার্থে প্রদান করিলেন।

শেঠজী প্রত্যূষে গুহা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সাধু মহারাজ সেই বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। তিনি ভাবিয়া পাইলেন না, সাধু কাহার ধ্যান করিতেছেন, এবং ধ্যানে কি সুখ বা আনন্দ পাইতেছেন। সাধু নিমীলিত নয়নে নিষ্কম্প দেহে উপবিষ্ট ছিলেন; কিন্তু শেঠজী প্রণাম করিবামাত্র তাঁহার দেহ কাঁপিয়া উঠিল, তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। সাধু তীক্ষ্ণনয়নে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে এসো।" শেঠজী তাঁহার অনুসরণ করিয়া এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সমীপে উপনীত হইলেন। সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী দেখাইয়া দিয়া সাধু স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শেঠজী বুঝিতে পারিলেন না, কেন তিনি তাঁহাকে এই নির্জ্জনতম প্রদেশে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়া গেলেন। সূর্য্যালোক তখনও তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। স্রোতস্বতীর ধারে ধারে তিনি পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন স্থান উচ্চ, কোন স্থান সমতল। কোথাও বা

শিলার উপর দিয়া জল ছুটিয়া আসিয়া নীচে পড়িতেছে। কোথাও বা জলপ্রপাত ঘোর শব্দ সহকারে পর্ব্বত পদতলে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। কোথাও কুলু-কুলু ধ্বনি সহকারে বহিয়া চলিয়াছে। সূর্য্য উঠিলেন, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইল। তখন তিনি দেখিলেন, স্রোতস্বতীর জল কোন স্থানে গভীর নয়। জল এত স্বচ্ছ যে তলদেশ বেশ দেখা যায়। সহসা তাঁহার মনে হইল স্রোতঃস্বতীর তলদেশে হরিদ্রা বা ঈষৎ রক্তাভ বালু-কণা বিস্তৃত রহিয়াছে। তিনি তাহার কিয়দংশ উঠাইয়া লইয়া দেখিলেন উহা সুবর্ণ। পুলকিত হইয়া বিভিন্ন স্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, নদীগর্ভ সুবর্ণে আস্তৃত রহিয়াছে।

তিনি স্থির হইয়া একস্থানে বসিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন, সাধু মহারাজ কেন তাঁহাকে এখানে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ অরণ্যময় পর্ব্বতের অধীশ্বর সাধু মহারাজ। এ স্থান মনুষ্যের অগম্য ; কখন কোন মনুষ্য এ পথে এই দুর্গম স্থানে আসিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। তিনি কিয়ৎ পরিমাণ স্বর্ণ সঞ্চয় করিয়া লইয়া সাধুর নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রণাম করিয়া বলিলেন, "বহু স্বর্ণ দেখিলাম।"

সাধু বলিলেন, "উপরে আরও দেখিবে। তুমি আপাতত যতটা বহিয়া লইয়া যাইতে পার, ততটা লও। তারপর অশ্ব ও অস্ত্র ক্রয় করিয়া আনিয়া ক্রমে ক্রমে এই সুবর্ণরাশি লইয়া যাইবে। এই স্বর্ণ তোমারই জন্য গচ্ছিত আছে।"

শেঠজী সহরে আসিয়া একটা বাড়ী খরিদ করিলেন ; অশ্ব ও অস্ত্র ক্রয় করিলেন ; ভৃত্যাদি নিযুক্ত করিলেন। তিনি একজন ধনী ব্যবসায়ী বলিয়া খ্যাত ছিলেন ; তাঁহার খ্যাতি দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত ছিল। সুতরাং তিনি যে একটা বড় বাড়ী খরিদ করিবেন ও অশ্বাদি পোষণ করিবেন ইহা বিচিত্র নয়। সকলে দেখিল, শেঠজী এবার জহরতের

ব্যবসায় না করিয়া স্বর্ণের ব্যবসায় করিতেছেন। বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে শেঠজী প্রধান প্রধান নগরে এক একটী অনাথশালা স্থাপন করিলেন এবং সাধু সন্ন্যাসীদের থাকিবার ও আহারাদির ব্যবস্থাও করিলেন। নিজে থাকিতেন এক সামান্য গৃহে, বেশ ভূষা সামান্য—আহারে বিহারে তাঁহার বিলাসিতা আদৌ ছিল না। সমস্ত রাজ্যময় মহা দানবীর বলিয়া তাঁহার নাম রাষ্ট্র হইল। এই নাম, এই যশঃ তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের কাছেও পৌছিল।

তাহারা বড় দুর্দ্দশায় পড়িয়াছিল। অলস পুত্র জহুরীর কাজ শিক্ষা করে নাই। পিতার অবর্ত্তমানে বহুমূল্য দোকানের মালিক হইয়া সে বিলাসিতায় মাতিয়া উঠিল। উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র বন্ধুবান্ধব সহবাসে কালাতিপাত করিয়া দোকানের বহুমূল্য প্রস্তরাদি অল্পকাল মধ্যে নিঃশেষ করিল। আয়ের পথ রুদ্ধ হইল, কিন্তু ব্যয়ের পথ মুক্ত। অবশেষে অট্টালিকাও বিক্রীত হইল। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সরিয়া দাঁড়াইল। নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত হইয়া মাতা পুত্র গৃহত্যাগ করিল।

অবশেষে যে অতিথিশালার বিপুল ব্যয়াধিক্য দৃষ্টে তাঁহারা ক্রোধ-পরবশ হইয়া শেঠজীকে গৃহ হইতে তাড়াইয়াছিল, সেই অতিথিশালার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তথায় তাহারা স্থান পাইল না। কর্ম্মাধ্যক্ষ বলিলেন, "এই অনাথশালা তোমাদের ন্যায় কার্য্যক্ষম ব্যক্তির জন্য নয়।"

তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া যুবক, মাতার হাত ধরিয়া পিতার চরণে আশ্রয় লইবার জন্য যাত্রা করিল। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত পথিকদ্বয় যখন শেঠজীর গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিল, সে দ্বারও রুদ্ধ। তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে বলিলেন, "তোমাদের কোন দাবী আমার উপর নাই। তোমাদের প্রতি আমার যথাসাধ্য কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি

এবং তোমরা আমার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছ। এখন আমার সম্বন্ধ অনাথ কাঙ্গালের সহিত—তোমাদের সঙ্গে নয়। আমার যাহা কিছু আছে, সব তাহাদের—তোমাদের নয়। আমি তোমাদিগকে আশ্রয় দিতে পারিব না।"

স্ত্রী-পুত্র, শেঠজীর পদতলে পড়িয়া ক্ষমা ও আশ্রয় ভিক্ষা করিল। শেঠজী কঠোর, নির্ম্মম। বলিলেন, "আমি অনাথের মুখ হইতে অন্ন কাড়িয়া লইয়া তোমাদের আহার্য্য যোগাইতে পারিব না। তবে ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক আসিলে তাহাকে যাহা আমি দিয়া থাকি, তোমাদিগকে আজিকার জন্য আমি তাহাই দিতে পারি। পরে তোমাদিগকে আমি অতিথিশালায় পাঠাইয়া দিব; কর্ম্মাধ্যক্ষ যদি উচিত বিবেচনা করেন, তোমাদিগকে তিনি তথায় আশ্রয় দিবেন।"

গল্প এইখানে শেষ হইল। আমরা কয়েকটী মূল্যবান্ উপদেশ পাইলাম। জ্ঞান-যোগী ও কর্ম্ম-যোগীর পথ ভিন্ন হইলেও উভয়ের উদ্দেশ্য এক। তাই যোগী, কর্ম্মীকে স্বর্ণ আহরণের পথ দেখাইয়া দিলেন। দ্বিতীয় উপদেশ পাইলাম, নিজের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহার শেষ আছে, কিন্তু পরের জন্য যে অর্থ-ভাণ্ডার নিয়োজিত হয়, সে ভাণ্ডারের শেষ নাই। আলস্য ও পিতৃদ্রোহিতার পরিণাম দেখিলাম। যে দানবীর, তাহার জন্য ভগবান্ অর্থ গচ্ছিত রাখেন।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

বাবা বলিলেন,—

খুদ* তুঁ বোলে, খুদ শুনে,
খুদ তু সঘন্ হার।
সব নয়নো মে এক তুঁ দেখো নয়ন পসার ॥

অর্থাৎ তিনি বলেন, তিনি শুনেন এবং তিনিই ঘ্রাণ লন। সকল চক্ষু দিয়া তিনিই দর্শন করেন।

গুরু নানক অন্য ভাষায় সেই একই কথা বলেন,—

"ব্রহ্ম শুনিয়ে, ব্রহ্ম দেখিয়ে, ব্রহ্ম ব্রহ্ম বখানিয়ে।
নানক পসরা কারণ হরা তস্ বিনা না জানিয়ে ॥"

অর্থাৎ যাহা শুনিবে, যাহা দেখিবে এবং যাহা বলিবে—নানক বলিতেছেন—এই যে প্রপঞ্চ জগৎ, ইহা ব্রহ্মময়।

বুঝিলাম সব, কিন্তু এই ধর্ম্ম কি সংসারীর? যাঁহারা পর্ব্বত কন্দরে বাস করেন, কন্দমূল বা বৃক্ষফল খাইয়া জীবনধারণ করেন, যাঁহাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি মধ্যে একমাত্র কৌপীন ও করঙ্ক, তাঁহারা মনে করিতে পারেন পরিদৃশ্যমান্ জগৎ, ব্রহ্ম বই আর কিছু নয়। কিন্তু আমরা সংসারী জীব, চোখের সাম্নে যখন দেখিতেছি চোরে আমাদের গহনার বাক্স লইয়া যাইতেছে, তখন কি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব যে, ব্রহ্ম আমাদের সোণা রূপা লইয়া যাইতেছেন? অতএব ব্রহ্মকে লইয়া যাইতে দেও, আমরা ভরত রাজার মত নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিয়া ব্রহ্মের কীর্ত্তি দেখি। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, সন্ন্যাসীর

* খুদ অর্থাৎ স্বয়ং

ধর্ম্ম হইতে গৃহীর ধর্ম্ম পৃথক্। তাহা হইলে গৃহীর ধর্ম্ম কি? কি তাহাও বাবা বুঝাইয়াছেন।

বাবা বুঝাইয়াছেন কিরূপে রিপুনিচয় দমন করিতে হয়, কিরূপে আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে হয়, কিরূপে সকল কার্য্যের মধ্যে প্রভু আমাদের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করত যন্ত্রীরূপে কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। আমাদের প্রয়োজন হয় না দণ্ডের পর দণ্ড স্থবিরের ন্যায় বসিয়া তপস্যানিরত থাকিতে; আমাদের প্রয়োজন হয় শুধু সকল সময় স্মরণ রাখিতে প্রভুর ম্যানেজার হিসাবে আমরা কাজ করিয়া যাইতেছি—তাঁর সংসারে। তিনি পাঠাইয়াছেন আমাদিগকে তাঁহার কাজ করিতে—এ দেহের কার্য্যান্তে তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া লইবেন কাজ করিতে অন্য ক্ষেত্রে। বাবা আমাদিগকে বহু উপদেশ দিয়াছেন; উপদেশগুলি যাহাতে আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে বহু গল্পও বলিয়াছেন। অভিমান অর্থাৎ আমিত্ববোধ ত্যাগ করিবার জন্য বাবা আমাদিগকে পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। গল্পও অনেক বলিয়াছেন; কিন্তু কখন কি বলিয়াছেন তাহা স্মরণ নাই। বহুপূর্ব্বে কথিত একটী গল্প মনে পড়িয়া গেল; তাহাই এস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।—

একদা এক সময়ে বহুগুণসম্পন্ন জনৈক সাধু তিব্বত ও হিমালয়ের মধ্যস্থিত ভূভাগে বাস করিতেন। তাঁহার বহু শিষ্য সেবক ছিল। যে মহাপুরুষ তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম গোরক্ষনাথ। সাধুর ইচ্ছা হইল একবার তিনি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসেন। বাসনা হইবামাত্র তিনি শিষ্য শ্রেষ্ঠ মহাত্মা গোরক্ষনাথকে লইয়া আশ্রম ত্যাগ করিলেন। আসবাব পত্রের মধ্যে সঙ্গে চলিল, কৌপীন, করঙ্ক ও দণ্ড। উভয়ের ছিল, অটুট স্বাস্থ্য, যৌবনের শক্তি, অসীম উৎসাহ। পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল মহানন্দে অতিক্রম করিয়া উভয়ে চলিয়াছেন। ভিক্ষা

দ্বারা অথবা ফলাদি আহরণ করত উদর পূর্ত্তি করিয়া চলিয়াছেন। দিনের পর দিন এইভাবে চলিল। অবশেষে তাঁহারা এক নগর সমীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। গুরুর ইচ্ছা হইল, তিনি একবার নগর ও রাজপ্রাসাদ ঘুরিয়া দেখেন। শিষ্যের ইচ্ছা অন্যরূপ। তিনি বলিলেন, "বিষয়ী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিবার ইচ্ছা আমার নাই।" গুরু কহিলেন, "তোমার চিত্ত যদি এতই দুর্ব্বল মনে কর, তবে তুমি লোকালয় হইতে দূরে থাক, আমি কিছু দিন এখানে অবস্থান করিয়া বারাণসী তীর্থে তোমার সহিত সম্মিলিত হইব।" শিষ্য কহিলেন, "আপনি এখানে বিষয়ী লোকের সংসর্গে কয়েকদিন অবস্থান করিবার মানষ করিয়াছেন, ইহা সন্ন্যাসীর পক্ষে অনুচিত। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।"

গুরু শুনিলেন না। শিষ্য তখন বাধ্য হইয়া গুরুকে ছাড়িয়া চলিলেন। বিদায়কালে বলিয়া গেলেন, "আগামী মাঘী পূর্ণিমায় তীর্থরাজ প্রয়াগধামে আপনি আমার সহিত সম্মিলিত হইবেন—ত্রিবেণী সঙ্গমে একত্র স্নান করিব।"

সাধু নগরে প্রবেশ করিলেন। অট্টালিকা সমূহের শোভা তাঁহার বড় ভাল লাগিল। ক্রমে তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। রাজা তখন সভায় অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। সাধু মহারাজ তথায় প্রবেশ করিবামাত্র রাজা ও তাঁহার পাত্র মিত্র মহাসমাদরে সাধুকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং মহার্ঘ আসনে বসাইয়া মালা চন্দন অর্পণ করিলেন। সাধু আপ্যায়িত হইলেন। ভোজনের সময় রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্য ও পানীয় আহার ও পান করিয়া তিনি অত্যন্ত তৃপ্ত হইলেন। এমন সুন্দর স্থান, এমন উপাদেয় ভোজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না, তিনি কিছুদিন তথায় থাকিয়া গেলেন। রাজকুমারী

গৌরী তাঁহার সেবা করিতেন। গৌরীর অতুলনীয় রূপলাবণ্য তাঁহাকে এই নগরে বাঁধিয়া রাখিল। তিনি শিষ্য গোরক্ষনাথের কথা, প্রয়াগধামে পৌর্ণমাসী স্নানের কথা এক কালে বিস্মৃত হইলেন, অবশেষে সাধু মহারাজ, রাজনন্দিনীকে বিবাহ করিয়া গৃহী হইলেন। রাজার পুত্রসন্তান ছিল না; কালে সাধু বা তাঁহার পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হইবেন, ইহা সকলেই জানিত। সাধু মহানন্দে আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিলেন। অবশেষে এমন একদিন আসিল যে দিন, রাজা, সাধুকে সিংহাসনে বসাইয়া দেহত্যাগ করিলেন। সাধু রাজা হইয়া সমস্ত অন্তর ঢালিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তপস্যা, পরমাত্মা, শিষ্যাদি বিস্মৃত হইয়া তিনি ইন্দ্রিয়ের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তাঁহার এক পুত্র জন্মিলে তিনি সংসারের মায়ায় আরও আবদ্ধ হইলেন।

এদিকে ধ্যানযোগে গোরক্ষনাথ তাঁহার গুরুজীর অবস্থা সম্যক বুঝিতে পারিলেন, এবং একদিন নগরে আসিয়া দর্শন দিলেন। সাধু মহারাজ শিষ্যকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। শিষ্য প্রণাম করিলে গুরু বিনা বাক্য ব্যয়ে শিষ্যকে এক নিভৃত কক্ষে লইয়া গেলেন। শিষ্য অন্যান্য কথা বার্ত্তার পর গুরুকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন; কিন্তু গুরু সম্মত হইলেন না; কহিলেন, "আর কিছুদিন পরে—এখন নয়—"

"কেন আপনি মুগ্ধ হয়ে রয়েছেন? আপনি ভুলে যাচ্ছেন আপনি কে? যাঁর যোগ প্রভাবে—"

"এখন আমার এ সব ছেড়ে যাবার অবসর নেই, গোরক্ষনাথ; পুত্র এখন বড় ছোট।"

"আচ্ছা আমি আর কিছুদিন পরে আসব, তখন আপনার কোন ওজর আপত্তি শুনব না।"

"সন্তান একটু বড় না হলে—"

গোরক্ষনাথ কয়েক বৎসর পরে আবার আসিলেন। তখন শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। এবার শিষ্যকে দেখিয়া গুরু প্রমাদ গণিলেন। নিভৃতে কহিলেন, "দেখ গোরক্ষনাথ, সন্তানকে ছাড়িয়া যাইতে আমার মন কিছুতেই সরিতেছে না। রাণীকে ছাড়িতে পারি, কিন্তু পুত্রকে নয়। সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে বসিবে, তাহার পুত্র হইবে, তখন আমি যাইতে পারি ; ইহার পূর্ব্বে নয়। তুমি আর কিছু কাল পরে আসিও।"

শিষ্য বলিলেন, "এবার আমি আপনাকে না লইয়া এ পুরী ত্যাগ করিব না।"

গোরক্ষনাথ রহিয়া গেলেন। সংসারের আকর্ষণে তাঁহাকে মুগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে রাজারাণী যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য, শ্রবণেন্দ্রিয় মুগ্ধকারী গীতবাক্য, নয়ন বিমোহন সুন্দরীর দল—কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল। একদিন প্রাতে গোরক্ষনাথ, রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া নদীতে স্নানার্থে গমন করিলেন। দুইজনে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ফিরিলেন একা। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র কই ?"

গোরক্ষনাথ উত্তর করিলেন না। রাজা ব্যস্ত হইয়া নদীকূলে লোক পাঠাইলেন। যাহারা গিয়াছিল, তাহারা বহিয়া আনিল, রাজপুত্রের মৃতদেহ। রাজা রাণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রাজা ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোরক্ষনাথ, আমার পুত্রকে মারিল কে ?"

"আমি।"

"কেন ?"

"পুত্রই আপনার বন্ধন, অতএব ইহাকে আমি সরাইলাম।"

"তুমি আশা করো না, ইহার পর তোমার সঙ্গে আমি যাইব।"

"আপনি এতই মায়ামুগ্ধ! আচ্ছা ছেলেকে আমি বাঁচাইয়া দিতেছি।"

গোরক্ষনাথের হস্তস্পর্শে বালক বাঁচিয়া উঠিল। রাজা রাণী প্রভৃতি অনেকেই সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। গুরু কিছু না বলিয়া শিষ্যের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিভৃত কক্ষে লইয়া গিয়া বলিলেন, "গোরক্ষনাথ তোমার এতটা শক্তি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।"

"এ শক্তি ত আপনারও ছিল, আপনি তাহা নষ্ট করিলেন।"

গুরু বা রাজা ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিলেন। চিন্তান্তে কহিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে যাব গোরক্ষনাথ।"

"কবে? কখন?"

"আজ মধ্য রাত্রিতে—গোপনে। অন্য কোন সময় যাবার সুবিধা হবে না; রাণী বা প্রজারা জান্‌তে পারলে আমার যাওয়া দুর্ঘট হ'বে।"

"উত্তম। আমি এখন তবে যাই—মধ্য রাত্রিতে প্রাসাদ বাহিরে আপনার প্রতীক্ষায় থাক্‌ব।"

রাত্রি এক প্রহর হইতে না হইতে রাজা, রাজ-ভাণ্ডার হইতে বহুমূল্য রত্নাদি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। মণি মুক্তা হীরক প্রভৃতি যাহা বহুকাল হইতে রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল, তাহা তিনি সংগ্রহ করিয়া থলিয়ার মধ্যে রক্ষা করিলেন; মধ্যরাত্রি সমাগত হইলে তিনি থলিয়াটী স্কন্ধের উপর ফেলিয়া গুপ্ত দ্বারপথে প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গোরক্ষনাথ নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অচিরে নগর-বাহিরে উপনীত হইলেন। অন্ধকার রাত্রি, নির্জ্জন পথ। গোরক্ষনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার থলিয়াতে কি আছে?"

"একটা রাজ্য—যে সমস্ত দুর্ল্লভ মণিরত্ন আছে, তদ্দ্বারা একটা রাজ্য ক্রয় করা যেতে পারে।"

"আপনার সেবক উপস্থিত থাকিতে আপনি কেন এই বোঝা বহন করিবেন ?—আমাকে দিন্।"

গোরক্ষনাথ বোঝাটা স্বীয় স্কন্ধে লইলেন এবং বোঝার মুখের বন্ধন খুলিয়া দিয়া এক একটী করিয়া পথের উপর ফেলিতে ফেলিতে পথ চলিতে লাগিলেন। গুরু কিছু জানিতে পারিলেন না। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, থলিয়ার মধ্যে যাহা ছিল তাহাও নিঃশেষ হইল। অতঃপর গোরক্ষনাথ থলিয়াটী ঝাড়িয়া পথপার্শ্বে জঙ্গলে ফেলিয়া দিলেন। অগ্রগামী গুরু তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "একি ! মণিরত্ন কোথা গেল ?"

"ফেলে দিয়েছি।"

"ফেলে দিয়েছ ? সর্ব্বনাশ করেছ ! এমন বহুমূল্য রত্ন—"

"এই শিলাখণ্ডের চেয়েও কি তৎসমুদায়ের মূল্য বেশী !"

"তুমি কি পাগল হয়েছ গোরক্ষনাথ ? যার বিনিময়ে আমি একটা রাজ্য কিনিতে পারিতাম—"

"আপনি নিজেকে ভুলে যাচ্ছেন। আপনি প্রস্রাব করলে এইরূপ লক্ষ লক্ষ মণিরত্ন পাওয়া যেতে পারে।"

"তুমি বাতুলের ন্যায় বকৃছ—"

"আপনি মোহাচ্ছন্ন—এই দেখুন।"

বলিয়া তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রস্রাব করিতে লাগিলেন। সাধু মহারাজ বিস্মিত নয়নে দেখিলেন, প্রস্রাবের সঙ্গে মণি মুক্তা ঝরিয়া পড়িতেছে। দুর্ল্লভ রত্ননিচয় স্তূপীকৃত হইতে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "গোরক্ষনাথ, আমাকে ক্ষমা কর, আজ হ'তে তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শিষ্য।"

আমরা সংসারী জীব, মহাশূন্য পানে বিস্ময়স্তব্ধ নয়ন ফিরাইয়া খুঁজি কোথায় সেই মহারত্ন, যাহার তুলনায় পৃথিবীর যাবতীয় রত্ন তুচ্ছ? —কোথায় সে মহারত্ন যাহার অনুসন্ধানে শত শত মহাপুরুষ অনশন ক্লিষ্টদেহে শ্বাপদসঙ্কুল চিরতুষারময় পার্ব্বত্যপ্রদেশে যুগযুগান্তর ধরিয়া তপস্যা করিতেছেন? ওগো, কোথায় সে মহারত্ন, আমার জীবনসর্ব্বস্ব আমার জীবনের জীবন, অনন্ত জীবনের চির আকাঙ্ক্ষিত ধন?

এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা এই উপদেশ পাই যে, প্রলোভন হইতে দূরে থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় নিচয়ের মহাশক্তি চুম্বক পাথর যেমন লৌহচূর্ণ খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনি প্রত্যেক ইন্দ্রিয় খুঁজিয়া থাকে কোথায় কোন্ লোভনীয় পদার্থ বিদ্যমান্ রহিয়াছে। সেই ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া রাখিবার শক্তি যাহার নাই, তাহার উচিত নয় অগ্নিকে লইয়া খেলা করা। সাধু মহারাজ ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে, এমন পদার্থ জগতে নাই। তিনি একটু গর্ব্বভাবেই বাবা গোরক্ষনাথকে বলিয়াছিলেন, তোমার যদি সে শক্তি না থাকে তাহলে তুমি বিষয়ী লোকের সংস্পর্শে আসিবে না, আমি একাই যাব। বাবা গোরক্ষনাথের প্রলোভন দমন করিবার শক্তি যথেষ্ট থাকিলেও তিনি বিষয়াসক্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিতে ইচ্ছা করিলেন না; কিন্তু যাঁহার শক্তি নাই, অথচ গর্ব্ব আছে, তাঁহার পতন কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহা এই আখ্যায়িকা প্রতিপন্ন করিতেছে। অভিমান অহঙ্কার ও লোভ সকল অবস্থায় পরিত্যাজ্য; সাধক বা গৃহী যাহাকে এই জ্বলন্ত পাবকতুল্য অভিমান ও লোভ আশ্রয় করিয়াছে, তাঁহার সকল সদ্‌গুণ পোড়াইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে। প্রকৃত বৈরাগ্য ও সাধনে প্রবল অনুরাগ না থাকিলে, এ পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

সপ্তম তরঙ্গ

বাবা একদিন পুরীধামে উপদেশ দিতেছিলেন, রসনার লোভ দমন করা কর্ত্তব্য। কোনও ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার আম খেতে ইচ্ছা হয়েছে, আমি কি আম খাব না?" বাবা উত্তর করিয়াছিলেন, আম স্বচ্ছন্দে খেতে পার, কিন্তু ইচ্ছা করা অর্থাৎ লোভ করা ঠিক নয়। রসনার লোভকে যত প্রশ্রয় দেওয়া যায়, সে ততই বলবান্ হয়ে উঠে। আজ দুধ খেতে ইচ্ছা করলে, কাল লোভ পড়বে পায়সান্ন প্রতি, পরদিবস মালাই বা রাবড়ি খেতে ইচ্ছা হবে। কাজেই রসনার লোভ চরিতার্থ করিতে না পারিলেই পীড়াদায়ক হয়। যার লোভ দুর্দ্দমনীয় হয়, সে দরিদ্র হলে চুরি করে, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হলে সর্ব্বস্বান্ত হয়।

আর একদিন বাবা বুঝাইতেছিলেন, কখন কাহার নিন্দা করিবে না। নিন্দা করিলে নিন্দুক, নিন্দিতের পাপ আহরণ করে। যাহা সত্য বলিয়া জান, তাহা প্রকাশ করিলে অসূয়া হয়; আর যাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে তুমি নিজে স্থির কিছু জান না, তাহা প্রকাশ করিলে নিন্দা করা হয়।

বাবা এই সম্বন্ধে একটা গল্প বলিয়াছিলেন,—কোন দেশে এক রাজা ছিলেন, তিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। তাঁহার কয়েকটী রাণী ছিলেন, কিন্তু রাজার দেহে মহাব্যাধি দৃষ্টে তাঁহারা রাজার সংস্পর্শে আসিতেন না। পুত্র ছিল না; এক রূপযৌবনশালিনী বিধবা কন্যা ছিল, সে-ই রাজার সেবা সুশ্রূষা করিত। অবশেষে রোগ এত বাড়িয়া উঠিল যে, নিজের দেহের প্রতি রাজার ঘৃণা হইল। বিকলাঙ্গ পূতিগন্ধময় দেহ লইয়া রাজসভায় আর আসিতেন না। একদা তিনি মন্ত্রীকে

কহিলেন, "এ রুগ্ন দেহ লইয়া আর এ রাজবাড়ীতে থাকিতে ইচ্ছা করি না। আমি আজই রাত্রিতে নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইব। যদি কখন রোগমুক্ত হইতে পারি তবেই দেশে ফিরিব। আমার অবর্ত্তমানে তুমি রাজকার্য্য পরিচালনা করিবে।"

রাজা অন্ধকারে ছদ্মবেশে নগর ত্যাগ করিলেন। পাছে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয়, এই ভয়ে তিনি বনপথ অবলম্বন করিয়া চলিতেন। একদা পথমধ্যে এক সাধুর সহিত তাঁহার দেখা হইল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাজার মাথা ভক্তিতে নত হইয়া পড়িল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও ?"

"রোগমুক্তি।"

"উত্তম। আমার আদেশমত কার্য্য কর—এক বৎসর পরে ঠিক এই দিনে আমি তোমাকে ঔষধ দিয়া আসিব—তুমি অচিরে আরোগ্য লাভ করিবে।"

"মহারাজের উপদেশ কি ?"

"তুমি রাজ্যে ফিরিয়া যাও ; তোমার প্রাসাদের পার্শ্বে তোমার বাসোপযোগী দুইটী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া লও। চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর থাকিবে। একটী মাত্র প্রবেশপথ ও একটী মাত্র গবাক্ষ থাকিবে। তুমি এই নব নির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ করিবার পর প্রবেশ পথ প্রাচীর গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দিবে। আর তোমার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বস্ত্রাদি এই গবাক্ষ পথে আসিবে। কোন দাসদাসী তোমার কাছে থাকিবে না—"

"আমার সেবা করিবে কে ?"

"তোমার বিধবা কন্যা।"

"তাহা হইলে আমরা দুই ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ থাকিবে না ?"

"না, আর কেহ থাকিবে না।"

রাজা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। রাজ্যে ফিরিয়া মন্ত্রীকে যথাযথ আদেশ দিলেন। সপ্তাহের মধ্যে রাজবাটী সংলগ্ন উদ্যানমধ্যে ক্ষুদ্রকায় বাটী নির্ম্মিত হইল। রাজা তন্মধ্যে কন্যাসহ প্রবেশ করিলেন। দ্বারপথ প্রাচীরে গাঁথিয়া বন্ধ করা হইল। গবাক্ষপথে রাজার ভোজ্য ও পানীয় আসিতে লাগিল।

এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। রাজবাটীর দাসীরা কানাকানি করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, যুবতী বিধবা কন্যা লইয়া নিভৃতে বাস, তাহাদের বিবেচনায় সন্দেহজনক। আরও কিছুদিন যাইতে না যাইতে তাহাদের সন্দেহের কথা পুরমহিলাদের কর্ণগোচর হইল। তাহারা নিষ্কর্ম্মা ছিল, সুতরাং পরচর্চ্চা লইয়া তাহারা মাতিয়া উঠিল। তাহাদের বান্ধবীরা শুনিল, ক্রমে বান্ধবীদের স্বামীদেরও কর্ণগোচর হইল। রাজপুরী মধ্যে মেয়ে মহলে ও পুরুষ মহলে সকলেই চুপি চুপি বলাবলি করিতে লাগিল, রাজা কি পাষণ্ড, কি নির্লজ্জ! ইত্যাদি। রাজার এই কলঙ্কের কথা ক্রমে রাজপুরীর বাহিরে রাষ্ট্র হইল। পাড়ায় পাড়ায় রাজার কলঙ্কের কথা প্রচার হইল এবং ঘৃণার সহিত রাজার নাম উচ্চারিত হইতে লাগিল। রাণীরা শুনিলেন, কর্ম্মচারীরা শুনিল, প্রজারা শুনিল এবং এই কলঙ্কের কথা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে সকলে যেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

এ দিকে রাজা চার পাঁচ মাস যাইতে না যাইতে কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। সাত আট মাসের মধ্যে ক্ষত শুকাইয়া আসিল। নয় মাসে দেখা গেল রাজা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়াছেন। দশমাসে ক্ষত স্থানে নূতন মাংস উদ্গত হইল এবং একাদশ মাসে রাজা আর বিকলাঙ্গ

নহেন। তখন রাজনন্দিনী কহিলেন, "বাবা, তুমি ত সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছ"—

"হ্যাঁ মা, তোমারই সেবা যত্নে আর সাধু মহারাজের আশীর্ব্বাদে আরোগ্য হয়েছি।"

"তবে আর এখানে কেন বাবা? চলো না—"

"না মা; সন্ন্যাসীর অপেক্ষায় আমাকে থাকতেই হ'বে। বৎসর পূর্ণ হতে আর এক মাস বিলম্ব।"

"তিনি আর বেশী কি করবেন? রোগত সেরে গেছে।"

"তিনি এক বছর অপেক্ষা করতে বলেছেন, আমিও কথা দিয়েছি; সুতরাং তাঁহার অপেক্ষায় আমাকে থাকতে হবে।"

এক বৎসর পূর্ণ হইল। এক তেজস্বী সন্ন্যাসী আসিয়া রাজসভায় দর্শন দিলেন। সিংহাসন শূন্য। মন্ত্রী, সিংহাসন পদতলে বসিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কোথায়?"

"উদ্যান মধ্যে এক নব নির্ম্মিত গৃহে—"

"তাঁহাকে সংবাদ দেও—"

"সেখানে আমাদের যাইবার আদেশ নাই।"

"তাঁর কাছে কে আছে?

"রাজা তাঁহার বিধবা কন্যাকে লইয়া তথায় বাস করিতেছেন, কোন দাস দাসী নাই, শুধু—"

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিলেন, "গবাক্ষপথে তাঁহাকে সংবাদ দেও কোনও সন্ন্যাসী তাঁহার দর্শন-প্রার্থী।"

রাজাকে সংবাদ দেওয়া হইল। তিনি ব্যাকুল অন্তরে সন্ন্যাসীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ

পথের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। রাজা ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর পদতলে পড়িলেন। যুক্তকরে কহিলেন, "বাবা, আজ বৎসর শেষ—ঔষধ—"

"ঔষধ কি জন্যে ?"

"আমার রোগের—"

"তোমার দেহে ত রোগ নাই।"

"কিরূপে রোগমুক্তি ঘটিল ?"

"তুমি ইহজন্মে যে পাপ করিয়াছিলে, সেই পাপ হইতে মহাব্যাধি সঞ্জাত হইয়াছিল। তোমার সেই পাপ, তোমার নিন্দুকেরা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। তুমি বিধবা কন্যা লইয়া বাস করিতেছিলে—তোমরা নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ—তথাপি তোমার দাস-দাসী, প্রজা, কর্ম্মচারী তোমার নিন্দা রচনা ও প্রচার করিয়া তোমার সঞ্চিত পাপ বণ্টন করিয়া লইল। তুমি পাপমুক্ত হইয়া রোগমুক্ত হইলে—ঔষধের কোন প্রয়োজনই হইল না।"

যাহারা নিন্দা করিয়াছিল তাহারা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, কি জানি যদি মহাব্যাধি তাহাদের দেহে দেখা দেয়। ভয়ে ভক্তিতে সকলে রাজার চরণে প্রণাম করিল।

অষ্টম তরঙ্গ

গত ১৩৩৯ সালে ২৬শে অগ্রহায়ণ—পূর্ণিমা তিথিতে পূজ্যপাদ কৈলাসপতি শ্রীশ্রীহংসদেব অবধূত মহারাজ, আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারিজীকে কৈলাসাশ্রমে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বাবার আশ্রমটী সুন্দর,—দিগ্রিয়া পাহাড়ের সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক শৈলশীর্ষে এই আশ্রম। ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী—দ্বিতলে একটী মাত্র ঘর, তাহার চারিদিকে বারান্দা। দক্ষিণে, বহু দূরে পরেশনাথ পর্ব্বতমালা অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়; পূর্ব্বে দেওঘর, তার পশ্চাতে ত্রিকূট পাহাড় ও বঙ্গবিশ্রুত তপোবন শৈল। মনোহর দৃশ্য, মনোরম স্থান, পবিত্র আশ্রম—তপস্যার উপযুক্ত বটে। এই স্থানে দুই মহাতাপস সম্মিলিত হইলেন। সে দিন আবার পুণ্যতিথি পূর্ণিমা। গুরুমহারাজের আগমন উপলক্ষে কৈলাস সাজিয়াছে পত্রপুষ্পে অতি চমৎকার। আশ্রমের দক্ষিণ পার্শ্বে চত্বরের উপর বিস্তৃত চন্দ্রাতপ, নিম্নে সুকোমল গালিচা, পুষ্পাধারে স্তবকে স্তবকে নানাবিধ ফুল, ধূপাধারে শত শত ধূপ। সমুদায় আশ্রম হাস্যময়, গন্ধময়, আনন্দময়। অবধূত মহারাজ, তাঁহার মহামান্য অতিথির করধারণ পূর্ব্বক সুদৃশ্য মূল্যবান গালিচার উপর বসাইলেন এবং পুষ্পমাল্যে তাঁহাকে বিভূষিত করিলেন। এই দুই মহাপুরুষের বহুভক্ত ও শিষ্য এবং দূরদেশাগত সাধু সজ্জন আসিয়াছিলেন,—এই দুই দেশ-বিশ্রুত মহাতাপসের মহামানবের, সম্মিলন দর্শন করিতে এবং তাঁহাদের মধুময় পবিত্র ধর্ম্মালোচনা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতে। তাঁহাদের আনন্দোজ্জ্বল তেজোদ্দীপ্ত মূর্ত্তি দর্শনে আমরা সকলে সে দিবস ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাঁহাদের পবিত্র কণ্ঠোচ্চারিত বেদ বেদান্তের

উপদেশ শুনিয়া সময় সময় আমাদের মনে হইয়াছিল, আমরা বুঝি কোন ঋষির আশ্রমে অবস্থান করিতেছি। এটা সত্যই ঋষির আশ্রম। আমরা পুরাকালের কোন ঋষিকে দর্শন করি নাই। ঋষির অর্থ যদি মহাজ্ঞানী, মহাসাধক, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হয়, তবে যে দুই মহামানবকে আমরা সে দিন কৈলাসাশ্রমে দর্শন করিয়াছি, সেই দুই মহাপুরুষ যথার্থই ঋষি। তাঁহাদের তেজোদ্দীপ্ত, হাস্যোজ্জ্বল, প্রফুল্লময় বদন দর্শন করিলে অবিশ্বাসীরও মস্তক আপনা হ'তেই তাঁহাদের চরণে নত হইয়া পড়ে।

এই মিলনের ঠিক এক মাস পরে পৌষ সংক্রান্তিতে আমার পূজ্যপাদ গুরুমহারাজ আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন আমাদের পূজনীয় সাধু বাবাকে করণিবাগ আশ্রমে। কৈলাসপতির আগমন উপলক্ষে করণিবাগ আশ্রমও উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। তাঁহার বসিবার জন্য যে আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা অতি চমৎকার। সুন্দর একখানি চৌকির উপর গালিচা, তদুপরি মখমলের মছলন্দ, তা'র উপর এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র চর্ম্ম। ব্যাঘ্র চর্ম্মের উপর বসিবার সকল সাধুর অধিকার নাই। মৃগ চর্ম্মোপরি অনেকেই বসিতে পারেন, কিন্তু ব্যাঘ্র চর্ম্মে নয়। আজও সে দিনের মত শত শত ভক্ত ও শিষ্য শিষ্যা, হরিহর সম্মিলন দেখিবার উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হৃদয়ে কৈলাসপতির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তখন অপরাহ্ণ। দেখিতে দেখিতে কৈলাসপতির মোটর আশ্রমে মধ্যে প্রবেশ করিল। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন স্বামী শ্রুতানন্দজী, স্বয়ং প্রকাশজী ও বহু ভক্ত। শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট আসনোপরি বসাইলেন। অন্যান্য অভ্যাগতদের যথা-যোগ্য আসনে বসাইয়া পরে নিজে উপবেশন করিলেন। নিম্নে বিস্তৃত গালিচোপরি কতিপয় ব্রহ্মচারি শিষ্য এবং আশ্রমের পণ্ডিতদ্বয়

উপবিষ্ট হইলেন। উত্তরদিকের বারান্দায় শিষ্যমণ্ডলী এবং অপর পার্শ্বের বারান্দায় শিষ্যাগণ উপবেশন করিলে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ সৎপ্রসঙ্গ চালাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীহংস মহারাজজীকে দুই একটী প্রশ্ন করিলেন। সভাস্থ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিতদ্বয় ও সাধকপ্রবর শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় তাহাতে যোগদান করিলেন। প্রথম প্রশ্ন হইল—"জ্ঞানীর প্রারব্ধ আছে কি না এবং জ্ঞানীর চিত্তবিক্ষেপ হয় কি না ?"

সাধুবাবা বলিলেন—"জ্ঞানীর প্রারব্ধ আছে—বলা যাইতে পারে। তবে উহা কিরূপ ? যেরূপ কুমারের কুলালচক্র সজোরে ঘুরাইয়া দিলে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উহা সমান বেগেই ঘুরিতে থাকে, তদ্রূপ।" বাবা আরও বলিলেন,—"জ্ঞানী দুই প্রকার। এক বিদেহমুক্ত, আর এক জীবন্মুক্ত। বিদেহমুক্তির কথা স্বতন্ত্র ; কিন্তু যে দেহধারী পুরুষ, যাহার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার বিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। কারণ যেরূপ বরফের ধর্ম্ম—শীতলতা, অগ্নির ধর্ম্ম—উষ্ণতা, তদ্রূপ অন্তঃকরণেও ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, ধৃতি-অধৃতি, লজ্জা-ভয়, রাগ-দ্বেষ, হর্ষ-বিষাদ, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি নানাবিধ ভাব রহিয়াছে। কিন্তু যে প্রকৃত জ্ঞানীপুরুষ, সে এই অন্তঃকরণের দ্রষ্টা। সে অন্তঃকরণের ঐ সকল যাবতীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং ইচ্ছারহিত। জ্ঞানীরা অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ রাখেন না। প্রকৃত জ্ঞানী পুরুষের সর্ব্ব বাসনা ত্যাগ হইয়া যাওয়ায় তাঁহার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব অভিমান নাই। তিনিই প্রকৃত সুকৃতিবান জীবন্মুক্ত পুরুষ, যাঁহার মনোনাশ হওয়ায় চিত্ত সম্পূর্ণ বিক্ষেপশূন্য হইয়াছে।" বাবা, আরও বলিলেন,

"ব্রহ্মজ্ঞানী সদা নির্লেপ।
যৈসে জল্‌সে কমল অলেপ ॥"

প্রশ্ন। জ্ঞান কি বস্তু ?

উত্তর। জ্ঞান ত দেখাইবার সামগ্রী নয় ? জ্ঞান অনুভবের বস্তু।

প্রশ্ন। অনুভূতি কি উপায়ের দ্বারা হইবে ?

উত্তর। সর্ব্ববাসনা ত্যাগ কর, বাহ্য-বৃত্তি-বিষয়ে একদম মৌন হইয়া যাও। বহিরিন্দ্রিয়গ্রাম রুদ্ধ করত চিত্ত সম্পূর্ণ অন্তর্ম্মুখী কর, ব্রহ্মে মন একাগ্র ও তন্ময় কর, তাহা হইলেই অনুভূতি আসিবে। এই 'আমি' যে কি বস্তু তাহা বিচারের দ্বারা ক্রমে বুঝা যাইবে। আমি অন্নময়কোষ নহি, আমি মনোময়কোষ নহি, আমি প্রাণময়কোষ নহি, আমি বিজ্ঞানময়কোষ নহি, আনন্দময়কোষও আমি নহি ; তবে আমি কি বস্তু ? এইরূপে সদাকাল অন্বেষণযুক্ত সৎবিচারের সাহায্যে এবং ব্রহ্ম-অভ্যাসে ব্রহ্মানুভূতি হইবে। বাবা আরও বলিলেন—

"সন্তত ব্রহ্ম-অভ্যাস মে মল্ বিক্ষেপকো নাশ।
জ্ঞানদৃঢ় নির্ব্বাসনা জীবন্মুক্তি প্রতিভাস॥"

প্রশ্ন। আত্মানুভূতি কিরূপ ?

উত্তর। লবণের পুত্তলীকে যদি একবার সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত করা হয়, তবে কি সে ফিরিয়া আসিয়া কিছু বলিতে সমর্থ হয় ?

সাধুবাবা একটী গল্প বলিলেন এইরূপ :—এক মুমুক্ষু ব্যক্তি কোন জ্ঞানী মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "জীবাত্মা এবং পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে পৃথক নয়, একই বস্তু।" মহাত্মার বাক্য শ্রবণে মুমুক্ষু ব্যক্তি বলিল, ইহা কি কখনও সম্ভব ? জীবাত্মা ও পরমাত্মা কি কখনও এক হইতে পারে ? ঈশ্বর—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্ব কর্ম্মের প্রেরক এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান। আর জীব পরিচ্ছিন্ন, অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তি বিশিষ্ট ; সুতরাং জীব কিরূপে ঈশ্বর হইবে ?

ঐ মুমুক্ষুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া সাধু উঠিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। বহুদূর গিয়া গঙ্গাতীরে এক নির্জ্জন স্থানে সাধু আসন বিছাইলেন। সেই ব্যক্তি সাধুর পশ্চাদনুসরণ করত তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ একই প্রশ্ন করিল। সাধু বলিলেন—"আমার বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে, আমাকে জলপান করাও।" প্রশ্নকারী বলিল—"বেশ, আমি এখনই জল আনিয়া দিতেছি।" সাধু বলিলেন,—"আমার এই করঙ্ক গ্রহণ কর, যাও—জল লইয়া আইস। কিন্তু আমি গঙ্গাজল ব্যতীত অন্য জল পান করি না।" সে বলিল—"গঙ্গা অতি নিকটে, আমি এখনই আপনাকে গঙ্গাজল আনিয়া দিতেছি।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই সে কমণ্ডলু ভরিয়া জল আনিল এবং তাহা পান করিতে সাধুকে দিল। তিনি করঙ্ক তুলিয়া লইয়া কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরাইয়া বেশ করিয়া দেখিয়া উহা ভূমিতে রাখিলেন। বলিলেন—'এ গঙ্গাজল নয়'। মুমুক্ষু—'সেকি? আমি নিজে এই জল গঙ্গা হইতে তুলিয়া আনিয়াছি। আপনি সংশয় করিবেন না,—ইহা গঙ্গাজলই।' সাধু—'ইহা কখনই গঙ্গাজল হইতে পারে না। কারণ গঙ্গা কত সুবিশাল। গঙ্গামধ্যে কত জাহাজ ষ্টীমার গমনাগমন করে, কত হাঙ্গর, মকর, বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যাদি উহাতে স্বচ্ছন্দে সন্তরণ করে, কিন্তু এই ভৃঙ্গার মধ্যে সে সকল কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সুতরাং এ গঙ্গাজল কিরূপে বিশ্বাস করিব?'

মুমুক্ষু—'এই জল সত্য সত্যই গঙ্গাজল। আমি স্বয়ং ইহা গঙ্গা হইতে উঠাইয়াছি। শুধু এই আধারটী ক্ষুদ্র, এই নিমিত্ত আপনি ইহাতে ঐ সকল বস্তু দেখিতে পাইতেছেন না। এই ভৃঙ্গার মধ্যে মৎস্যাদি বিচরণের স্থানাভাব।'

তখন সাধু ঐ মুমুক্ষু ব্যক্তিটীকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, 'দেখ বৎস,

তোমার কথা দ্বারাই তোমার প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। যেরূপ গঙ্গার সুবিস্তীর্ণ প্রবহমান বারিরাশি এবং এই করঙ্কস্থিত গঙ্গাজল একই, কেবল আধারের সঙ্কীর্ণতায় উহা উপলব্ধি হইতেছে না, সেইরূপ প্রকৃত পক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই, আধারের সঙ্কীর্ণতা মাত্র প্রভেদে এইরূপ প্রতীতি হইতেছে।'

বাবা আর একটী কাহিনী উদাহরণ স্বরূপ বলিলেন। তিনি বলিলেন—কোন একজন শিষ্য একদা তাহার গুরুর নিকট উপদেশ-প্রার্থী হইলে গুরু উপদেশ দিলেন '**তত্ত্বমসি**।' অর্থাৎ তিনিই তুমি।' ঐ মহাবাক্য কিন্তু শিষ্যের ধারণায় আসিল না। সে অপর গুরুর সন্ধানে অন্যত্র গমন করিল। নানা স্থানে ভ্রমণ করত সে ৺কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তথায় এক প্রসিদ্ধ অধ্যাপক পণ্ডিতের সন্ধান পাইল। কাশীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিবে মনস্থ করিল এবং তাহার মনোবাসনা অধ্যাপককে জ্ঞাপন করিল। তিনি বলিলেন 'এখানে যে সকল বিদ্যার্থী রহিয়াছে তাহাদের প্রতেককেই কোন না কোন কার্য্যভার দেওয়া হইয়াছে। এস্থানে পড়িতে হইলে তোমাকেও কোন একটি কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে।' ঐ ব্যক্তি তাহাতে সম্মত হইল। নবাগত বিদ্যার্থী দেখিল, কোন শিষ্য রন্ধন কার্য্যে, কেহ গুরুসেবা, কেহ বা গো-সেবা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত। কেবলমাত্র একটী কার্য্য খালি ছিল, ঐ আশ্রমে গোবরের চাপড়া দিবার লোকাভাব। সে ঐ কার্য্যেই নিযুক্ত হইল এবং গুরুর নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, ন্যায়, মীমাংসাদি ষড়দর্শন ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। অবশেষে গুরু তাহাকে যখন সর্ব্ব গ্রন্থের সার গ্রন্থ বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ করাইলেন, তখন সে জীব ও ব্রহ্মে অভেদ এবং **তত্ত্বমসিই** উহার সার উপদেশ দেখিয়া মনে

করিল—হায়রে! এ উপদেশ ত আমি গুরুর নিকট বহু পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তখন ঐ বাক্যে দৃঢ় প্রত্যয় করিলে অনর্থক আর এতদিন গোবর থাব্‌ড়াইতে হইত না।

এই গল্প শুনাইয়া সাধুবাবা আশ্রমের বৃদ্ধ পণ্ডিতজীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"আমি পণ্ডিত নহি। শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনারাই আমা হইতে অধিক জানেন।" প্রবীণ পণ্ডিতজী বাবার ঐ বাক্য শ্রবণে বিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, পণ্ডিত হইতে সাধুসন্তগণই যে ব্রহ্ম লাভের পন্থা বিষয়ে সমধিক অভিজ্ঞ সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। ইহা বলিয়া সাধুকৃপায় এক পণ্ডিত যে সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র গল্প বলিয়া শুনাইলেন। সাধুবাবা পণ্ডিতজীর বাক্য অনুমোদন করত একটী দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেন যে, একস্থানে এক সাধু পুরুষ এবং একটী শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত উপবিষ্ট ছিলেন। তথায় এক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আসিয়া প্রশ্ন করিল—কি উপায়ে ভগবান্ লাভ করা যায়? তদুত্তরে সাধু বলিলেন, 'যদি ইহার সোজা উত্তর চাও, তবে আমার নিকট আইস। আর যদি হিসাবের কথা শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে ঐ পণ্ডিতজীর নিকট যাও।" তাই বাবা বলিতেছিলেন—যদি কেহ অশ্বারোহণ-বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত বহুদিবসাবধি ঐ সম্বন্ধে গ্রন্থ অধ্যয়ন করে এবং উহা হইতে শিক্ষা পায় যে, ঘোড়ার উপর মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিতে হয়, উভয় জানুর দ্বারা ঘোড়ার শরীর কষিয়া ধরিতে হয়, ঘোড়ার কাণের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, এইরূপে লাগাম ধরিতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকার যতই সে ঐ বিষয় পুস্তক পাঠ দ্বারা শিক্ষা লাভ করুক না কেন, প্রথমে অশ্বারোহণ করিতে গেলে অতি সামান্য কারণেই তাহার অশ্ব হইতে পড়িয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু যে চিরদিন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে, তাহার এসব পাঠের

কিছুমাত্র আবশ্যক করে না, এবং তাহার ঘোড়া হইতে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনাও কম। কারণ সে ঐ কার্য্যে অভ্যস্ত। কোন বিষয় অভ্যাস না করিলে ভালরূপ আয়ত্ত করা যায় না। সেইরূপ ব্রহ্মযোগ সাধন ও নিরন্তর শ্রদ্ধার সহিত অভ্যাস ব্যতীত শুধু শাস্ত্রপাঠ দ্বারা ব্রহ্ম লাভের পন্থার অভিজ্ঞতা লাভ হয় না।

সাধু বাবার এই কথা শুনিয়া সদ্য স্বুবর্ণ পদক প্রাপ্ত আশ্রমের বয়ঃ-কনিষ্ঠ পণ্ডিতজী বলিলেন—"যদি কোন ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ এবং সাধু দুই হয়?"

উত্তর :—তাহা হইলে ত কথাই নাই, গো দুগ্ধে মিছরী মিশ্রিতবৎ অতি উপাদেয় বস্তু হয়।

ইহাতে প্রশ্ন উঠিল "কি অভ্যাস করিতে হইবে?"

উত্তর :—রাজ অন্তঃপুরের মহারাণীকে অন্তঃপুরচারিণী ব্যতীত অপর লোক কি দর্শন পায়? অধিকারী ব্যতীত সকলকে সকল কথা বলা যায় না।

এই সকল সদালাপ যদিও শ্রোতৃবৃন্দের মধুর লাগিতেছিল, কিন্তু কথায় কথায় বেলা পড়িয়া আসিল; রাত্রি হইলে বৃদ্ধ শ্রুতানন্দ স্বামিজীর অসুবিধা হইতে পারে বিবেচনায়, বিশেষতঃ যশিডির ট্রেণের সময় হইয়াছে দেখিয়া সাধু বাবা ঝটিতি 'হরিহর' শব্দ উচ্চারণ করত উঠিয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজও বাবাকে বিদায় দিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন এবং পরম প্রীতির সহিত উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। বাবা মোটরে উঠিবার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজকে জানাইলেন, ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসে উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলা—তাই তিনি পূর্ব্ব হইতে তথায় আয়োজন নিমিত্ত কল্য প্রত্যূষের ট্রেণেই যশিডি ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যদি 'রাম-নিবাস' অর্থাৎ

এই আশ্রমের কোন সাধু চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসে কুম্ভ-মেলায় গমন করিতে অভিলাষ করেন, তবে তিনি বাবার অতিথি হইলে বাবা বিশেষ আনন্দিত হইবেন এবং তাঁহার সুবিধার নিমিত্ত বাবা আনন্দের সহিত যাবতীয় বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন। তৎপরে বাবা সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত মোটরে উঠিয়া বসিলেন এবং পুনরায় মধুর স্বরে 'হরিহর' বলিলেন। মোটর দেওঘর ষ্টেশনাভিমুখে ছুটিল।

নবম তরঙ্গ

বুঝি না কেন মানুষ অনিশ্চিতের পিছনে ছুটে। ভগবানকে দেখি নাই, স্বর্গ কি রূপ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই, পুণ্য কর্ম্মের ফলাফল, পাঁজি-পুঁথি ছাড়া আর কোথাও দেখি নাই; তবু কেন আমরা অদৃশ্য অনিশ্চিতের পশ্চাতে ছুটি! আমাদের স্বার্থ কি? স্বার্থ কি পরকালের লোভ? স্বার্থ কি স্বর্গবাসের প্রলোভন? স্বর্গে বাস করিয়া কেহ কি ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছে, ওগো স্বর্গ অতি সুন্দর, অতি রমণীয়? মোক্ষ লাভান্তে কেহ কি ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছে, 'ওগো মোক্ষ মুক্তি অতি চমৎকার, তোমরা ভজন সাধন কর, তাহলে মোক্ষ লাভ করতে পারবে; বাসনা-রহিত হও, তাহলে জন্মরহিত হবে?'

না, তাহা কেহ বলেন নাই; বলিয়াছেন তাঁহারা, যাঁহারা স্বর্গবাস কখন করেন নাই, মোক্ষলাভ কখন করেন নাই, তাঁহারা অনিশ্চিতের পিছনে ছুটিয়া আমাদিগকেও দলে ভিড়াইয়া লইতেছেন না, তাহা কে বলিতে পারে? বলিতে পারে সে, যে ধনজন পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন করঙ্ক সম্বল করিয়াছে; যে বুঝিয়াছে ভোগে সুখ নাই, তৃপ্তি নাই;

ত্যাগে সুখ, ত্যাগে তৃপ্তি ; যে বুঝিয়াছে অদৃশ্য মহানের চিন্তায় আনন্দ, দৃষ্ট পদার্থের চিন্তায় তৃষ্ণার জ্বালা ; যে বুঝিয়াছে যাহা ধ্বংসশীল, তাহার চর্চ্চায় জ্বালা বই তৃপ্তি নাই, যাহা চিরবর্ত্তমান তাহার চিন্তায় আনন্দ বই দুঃখ নাই, সেই আমাদের এগার হাজার বৎসর * হইতে বুঝাইয়া আসিতেছে ওগো বাসনা ত্যাগ কর, অনিত্যের চিন্তা ত্যাগ কর। এমন শিক্ষা ত অনেকেই দিয়া থাকেন, তাহা কি আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে ? এই যে একজন বলিয়াছেন,—

বীভৎসা বিষয়া জুগুপ্সিত তমঃ কায়ো বয়ো সত্বরং
সর্ব্বৈর্বন্ধুভির ধ্বনীব পথিকৈর্যোগো বিয়োগা বহঃ
হাত ব্যোহয়ম সার এব বিরসঃ সংসার ইত্যাদিকং
সর্ব্বস্থৈব হি বাচি চেতসি পুনঃ কস্থাপি পুণ্যাত্মনঃ।
[বিষয় বীভৎস অতি দুঃখের আগার
ঘৃণিত শরীর রসরক্তের বিকার।
চঞ্চল জীবন এই আছে এই নাই
পথিক মিলন সম বন্ধু সঙ্গ ভাই।
সংযোগ কেবল মাত্র বিয়োগের হেতু
জীবের সংসারে অবিরাম দুঃখু
ইহা ভাবি, সংসার চিন্তা কর পরিহার
মুখে নয় মনে শুধু বল বারম্বার।
কিন্তু কোন্ পুণ্যবান জনের অন্তরে,
এ ভাব নিয়ত জাগে বল দেখি মোরে।] †

* ঋগ্বেদের ঋষি ভৃগু, অঙ্গিরস প্রভৃতি।

† শান্তিশতক।

কেহ কেহ বুঝিয়াছে; বুঝিয়া, ধনজন আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া অরণ্যবাসী হইয়াছে। বাবারই নিকট গল্প শুনিয়াছি, যে রাজার রসদ বহিতে হাজার হাজার উষ্ট্রের প্রয়োজন হইত, অরণ্যবাসী সেই রাজার আহার্য্য বহিতে একটা কুকুরই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। মাত্র আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, পৃথিবীর উজ্জ্বল নক্ষত্র যে রাজ-কুমার লুম্বিনীতে জন্ম লইয়া স্ত্রীপুত্র, রাজ্যধন ত্যাগ করিয়া বৃক্ষাশ্রয়ে অনশনে অর্দ্ধাশনে অনিশ্চিতের সন্ধান লাভার্থে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিয়া অবশেষে কুশি নগরে মহাবিশ্রাম করিতেছেন, তাঁহাকে ত কেহ পূর্ব্বাহ্নে বলিয়া দেয় নাই নির্ব্বাণে মহা শান্তি, নিরাকার ব্রহ্মের চিন্তায় মহা-আনন্দ; তবে তিনি কোন্ সুখের আশায় তাবৎ প্রেয় ত্যাগ করিয়া অদৃশ্য অজ্ঞাত-বস্তুর পিছনে ছুটিয়াছিলেন ?

এমন ছুটিয়া থাকেন অনেক গৃহী, অনেক সংসারী পুরুষ ও রমণী। আমি তাঁহাদের কথা বলিতেছি না যাঁহারা পুত্র কামনায় দেবতার দুয়ারে মাথা কুটেন, বৈরী নির্য্যাতনের জন্যে পূজা 'মানৎ' করেন; তাঁহাদের কথাও বলিতেছি না, যাঁহারা স্ত্রী-পুত্র হারাইয়া গৈরিকবস্ত্র ও করঙ্ক অবলম্বন করেন। আমি বলিতেছি তাঁহাদের কথা যাঁহারা সংসারে থাকিয়াও সন্ন্যাসী, স্ত্রীপুত্র পরিবেষ্টিত হইয়াও উদাসী। এমন দৃষ্টান্ত হিন্দু গৃহে বিরল নহে। আমরা দেখিয়াছি এবং দেখাইয়াছি কিরূপে এক গৃহী ব্যক্তি তাঁহার মুমূর্ষু পুত্রের ভার সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর ছাড়িয়া দিয়া পার্থিব সাহায্য না লইয়া নিশ্চিন্ত মনে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তিনি মহা যোগীদের ন্যায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন,—

তড়িন্মালালোলং প্রতিবিরতিদত্তান্ধতমসং
ভবে সৌখ্যং হিত্বা গমসুখমুপাদেয় মণঘং।

[চঞ্চলা চপলা হাসে ক্ষণেকের তরে
হেসে পুনঃ ডুবে যায় আঁধার গহ্বরে ;
তদ্‌বৎ ক্ষণেকের তরে মনুষ্য জীবনে
সুখের উদয়, দুখ তদ্‌ অবসানে।]

আমারাও ইহা বুঝি, কিন্তু জীবনে ইহা উপলব্ধি করি কই ? বিপদের সম্মুখে আমরা স্থির থাকিতে পারি কই ? বাবার নিকট শুনিয়াছি, কোন এক ভগবদ্ভক্ত বিপদে পড়িয়া যখন শ্রীহরিকে সকাতরে ডাকিতেছিল, তখন শ্রীহরি স্থির থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়াছিলেন ভক্তের রক্ষার্থে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি দেখিলেন, ভক্ত আত্মরক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করিয়াছে, তখন প্রভু ফিরিয়া গেলেন। আমাদেরও সেই দশা, আমরা সমস্ত ভার প্রভুর উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না,—কি জানি প্রভু যদি আমাদের আহ্বান শুনিতে না পাইয়া থাকেন, অথবা আমাদের সাহায্যাভিলাসে ছুটিয়া না আসেন ! প্রহ্লাদের ভক্তি ত আমাদের হৃদয়ে নাই, তবে আমরা কোন্ আশায় সংশয়-মিশ্র ভক্তি লইয়া তাঁহাকে বিপদে আপদে ডাকি ? কেন আমরা স্বার্থজড়িত অন্তরে অথবা নিঃস্বার্থভাবে সাধু সজ্জনের চরণধূলি লইতে ব্যগ্রভাবে ছুটিয়া থাকি ? ওই যে দলে দলে বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, রাজা প্রজা, নিঃসম্বল কৌপীনধারী সাধুবাবার উপদেশ শুনিতে সেবা করিতে ছুটিয়াছেন, তাঁহারা কোন্ আশায়, কোন্ বস্তুর লোভে নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন ? বাবার সামান্য তৃপ্তির জন্য নানা উপহার আনিয়া বাবার চরণতলে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার তৃপ্তির নিমিত্ত অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন ? তাঁহারা ত বাবার নিকট কোন দ্রব্যের প্রার্থী নহেন; দু'টা উপদেশ ছাড়া বাবারও ত কিছু দিবার সামর্থ্য নাই। তবে বাবার দুয়ারে তাঁহাদের এ ছুটাছুটি কেন ?

কেন, তাহা বুঝি তাঁহারাও জানেন না। মানুষ চায় ভগবান্‌কে ; তাঁহাকে পাইবার আশায় পথের আবর্জ্জনা দূর করিতে করিতে মানুষ অগ্রসর হইতে চায়। কোন লেখক বলিয়াছেন, মানুষ স্বভাবতঃ বন্যজন্তু অপেক্ষা হিংস্র। এ কথা অশ্রদ্ধেয়। আবার কোন মনস্বী বলিয়াছেন, প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরে দেবভাব বর্ত্তমান,—সে চায় প্রভুর সঙ্গ। ইহাই স্বাভাবিক। জল যেমন গড়াইয়া যাইতে চায় জলের দিকে, তেজঃ যেমন তেজকে আহ্বান করে, তেমনি জীবাত্মা চায় পরামাত্মাকে। তবে পথে বহু বাধা বিঘ্ন ; এই বাধা বিঘ্ন দূরীকরণার্থে আমরা আশ্রয় লই সাধু সজ্জনের ; পথের পরিচয় জানিবার জন্য সাহায্য বা উপদেশ লই তাঁহার নিকট হইতে যিনি সেই পথের বৃত্তান্ত অবগত আছেন। এই পথ প্রদর্শকই আমাদের গুরু। গুরু পথ দেখাইতে পারেন, কিন্তু ধামে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন না। বাবা বলেন, চিবাইতে হইবে তোমাকে, আমি চিবাইয়া দিতে পারিব না। মহাতপস্বী শ্রীশ্রীপূর্ণানন্দ স্বামীর নিকট হইতে কেহ দীক্ষাপ্রার্থী হইলে তিনি বলিতেন, "আমি নিজে যে বাবা, সে ধামে পৌঁছিতে পারি নাই, কি করিয়া তোমাকে পৌঁছাইয়া দিব ? তবে ইহা জানি যে, ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে কেহ ডাকিলে, তিনি তাহাকে হাত ধরিয়া বুকে টানিয়া লইয়া থাকেন। তুমি নিজের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলে তিনি টানিয়া লইতে ভুলিয়া যাইতে পারেন।" বুঝি অহঙ্কার শূন্য হইয়া শরণাগত না হইলে আমাদের আশা নাই। যাগযজ্ঞ, জপধ্যান, পূজা-হোম করিলেই সাধারণতঃ আমাদের অন্তরে একটা অহঙ্কার সঞ্জাত হয় ; এই অহঙ্কার আমাদিগকে টানিয়া রাখে, তাঁহার সাথে মিলিতে দেয় না—তাঁহাকে দেখিতে দেয় না।

আমি জপতপ যাগযজ্ঞ কিছু চাই না—চাই শুধু তাঁকে—আমার প্রাণের প্রাণকে, আমার সখাকে, আমার চির সাথীকে। এ খাঁচা

ভেঙ্গে আমাকে যেতে দেও তাঁর কাছে—আমি খুঁজে বেড়াই তাঁকে বিশ্বময় জগৎময়। আর যে বাঁধনের ভিতর আমি থাক্‌তে পারছি না। আমি যে চোখ বন্ধ করে অন্তর দিয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি অদূরে সেই প্রেম-ময় রূপময় অপূর্ব্ব রাজ্য অনন্ত স্পর্শ করে বিস্তৃত রয়েছে। বিচিত্র বর্ণের অসংখ্য ফল ফুল লতাপাতা পর্ব্বত উপত্যকা সমাচ্ছন্ন করে আমাকে ডেকে বল্‌ছে, আমি যে তোরই তরে এই রূপ ধরে যুগ যুগ প্রতীক্ষা কর্‌ছি। গগন-চুম্বি দিগন্তবিস্তারী পর্ব্বতমালা উঁকি মেরে আমাকে ডেকে বল্‌ছে, তুই আমার বুকে আস্‌বি বলে আমি যে বাহুপ্রসারি তোর অপেক্ষায় যুগযুগান্তর দাঁড়িয়ে আছি; রূপময় তেজোময় আকাশ কত মোহিনী মূর্ত্তি বুকে ধরে অনন্ত নীলের মধ্যে আমাকে ছুটাছুটি করতে আহ্বান কর্‌ছে। আমি যে তাদের আহ্বান উপেক্ষা করে আর থাক্‌তে পার্‌ছি না। আমি যাব তাঁর কোলে; তাঁতে আমাতে মিশে যাব—গাছপালা পাহাড় আকাশ সব মিশে যাবে আমাতে; আমি বিরাট রূপ ধরে মেঘমন্দ্র কণ্ঠে জগৎকে বল্‌ব—অহং ব্রহ্ম।

বিদায়

—০—

শ্রীমতী হেমলতা রায় প্রণীত

(১) মহাতাপস

শ্রীশ্রীবালানন্দ স্বামীজীর গল্প ও উপদেশাবলী

(২) কুম্ভমেলা ও সাধুসঙ্গ

১৩৩৬ সালের তীর্থরাজ প্রয়াগক্ষেত্রে পূর্ণ কুম্ভ হয়। এই বিশাল মেলাক্ষেত্রে সতর লক্ষ সাধু ও ধর্ম্মকামী ব্যক্তির সমাগম হয়। এই গ্রন্থে সিদ্ধ পুরুষ মহাত্মাদের উপদেশাবলী, ক্ষেত্রের বিশদ বর্ণনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের সরল ভাষা উচ্ছ্বাসময়ী নদীর ন্যায় দ্রুত বহিয়া চলিয়াছে। সময় সময় মনে হয় যেন উপন্যাস পড়িতেছি। মূল্য মাত্র এক টাকা।

বর্দ্ধিত নব সংস্করণে থাকিবে তীর্থরাজ হরিদ্বারের পূর্ণ কুম্ভের বর্ণনা; লিখিত হইতেছে। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে বিপুল আকারে।

প্রাপ্তিস্থান—

(১) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

(২) বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা